

IAS MAINS 2026

পরীক্ষার জন্য প্রত্যাশিত

CURRENT AFFAIRS



RICE IAS - এর সাথে শুরু হোক
আপনার UPSC CSE প্রস্তুতির যাত্রা।

মে-2026

Sealdah, Kolkata

Old Rajinder Nagar, New Delhi

At Adamas University

☎ 8100819447

☎ 9933118849

☎ 8100971442

Daily Deep Analysis

for IAS Mains

- **In-depth** coverage of **micro-topics** from the **UPSC GS Mains syllabus**
- One **GS Mains topic** covered **comprehensively** every day
- **Systematic** GS Mains syllabus **mapping**
- Focused coverage of **GS Mains Previous Years' Questions**
- **Expected Mains questions** with model answers



The Indian EXPRESS

Read full analysis
on our website

SCAN
this QR



For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata

 8100819447

Old Rajinder Nagar, New Delhi

 9933118849

At Adamas University

 8100971442

Daily Editorial Explained

— for IAS Mains

- **UPSC Mains-oriented editorial** decoding
- **Theme-based** conceptual clarity
- Clear linkage with **UPSC GS papers**
- Focused coverage of **UPSC Mains Previous Years' Questions**
- **Expected Mains questions** with model answers



**Read full analysis
on our website**

S  AN
this QR



For more details visit: ricejas.com

সূচক

1. সাধারণ অধ্যয়ন ১	1
1.1. ভারতীয় সমাজ	1
1.1.1. নারী শক্তি: আগামী দশকের জন্য ভারতের সংজ্ঞায়িত সংস্কার	1
1.2. ভূগোল	4
1.2.1. ভারতের খনি খাত	4
1.2.2. গুরু দিন সামনে: ভারতের বৃষ্টিপাত ঘাটতিজনিত মৌসুমি বায়ুর প্রস্তুতি	8
1.3. সংস্কৃতি	12
1.3.1. সুভাষচন্দ্র বসুর বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক দর্শন	12
1.3.2. সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার গুরুত্ব	15
2. সাধারণ অধ্যয়ন ২	18
2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা	18
2.1.1. বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা—ভারতে ভিড় ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা	18
2.1.2. ভারতের দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম	22
2.1.3. কেরালার উন্নয়নের দশক: ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির একটি মডেল	25
2.1.4. ভারতের উচ্চশিক্ষা: সংখ্যাগত বিস্তার এবং উৎকর্ষের মধ্যে ব্যবধান নিরসন	28
2.1.5. প্রধান নির্বাচন কমিশনার: সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং উদীয়মান উদ্বেগ	32
2.1.6. ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) বদলি সংক্রান্ত ক্ষমতা	36
2.1.7. জন বিশ্বাস ২.০	40
2.1.8. ভারতের উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বৃত্তির পুনর্কল্পনা	44
2.1.9. নির্বাচনী প্রাণবন্ততা: ভারতের গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে উচ্চ ভোটার উপস্থিতির বিশ্লেষণ	49
2.1.10. সীমাহীন নির্বাহী ক্ষমতা: প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ বিতর্ক	52
2.1.11. পরিচয়ের বিবর্তন: 'কেরল' থেকে 'কেরলম' নামকরণের ব্যবচ্ছেদ	56
2.1.12. ভারতে হেপাজতি সহিংসতা (CUSTODIAL VIOLENCE): এক পদ্ধতিগত বিচার	60
2.1.13. শবরীমালা মন্দির প্রবেশ মামলা এবং রিভিউ পিটিশন	63
2.1.14. মৃত্যুদণ্ড এবং "মধ্যপন্থা"	67
2.1.15. ভারতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ: নারী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফেডারেল স্যামের প্রকৃত পরীক্ষা	70
2.1.16. ভারতের সংবিধান সংশোধন: প্রক্রিয়া, ধারা ৩৬৮ এবং মৌলিক কার্যক্রম তত্ত্ব	74
2.1.17. ভারতের জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন: বিশ্ব গ্রামীণ উন্নয়ন কূটনীতির রূপকার	78
2.1.18. ভারতে ইউনিয়ন প্রথার দুর্বল হওয়া এবং শ্রমিক অধিকারের ওপর তার প্রভাব	83
2.1.19. ভারতের শিক্ষার সংকট: বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং শিক্ষার ফলাফলের মধ্যে ব্যবধান দূর করা	88
2.1.20. গণতন্ত্র এক সন্ধিক্ষণে: পতনের লক্ষণ এবং স্থিতিস্থাপকতার পথ	91
2.1.21. শহরকেন্দ্রিক নির্বাচনী ভোটাধিকার হরণ এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের সামনে চ্যালেঞ্জ	94
2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	98
2.2.1. প্রতিবেশী প্রথম: ভারত-নেপাল সম্পর্কের সুদৃঢ়করণ	98
2.2.2. ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে কৌশলগত বাস্তববাদ	102

2.3. স্বাস্থ্য	105
2.3.1. 'ওয়ান হেলথ' বা সমন্বিত স্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গি	105
3. সাধারণ অধ্যয়ন ৩	108
3.1. অর্থনীতি	108
3.1.1. সাপ্লাই চেইন রেজিলিয়েন্স (সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিস্থাপকতা)	108
3.1.2. ভারতের LPG সংকট: সরবরাহ নিরাপত্তা বিহীন এক জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা	111
3.1.3. ভারতের টেক্সটাইল খাতের অগ্রগতিতে তাপপ্রবাহের সংকট	116
3.1.4. ভারতের ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত শ্রেণি: প্রকৃত গতিশীলতা ছাড়াই প্রবৃদ্ধি	121
3.1.5. ভারতের শহরের অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তি	124
3.1.6. গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে উন্নয়নের ধারা: জনকল্যাণ বনাম কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি	127
3.1.7. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের খরচ: ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা	130
3.2. পরিবেশ	133
3.2.1. ভারতের জলবায়ু অঙ্গীকার	133
3.2.2. তাপপ্রবাহ এবং আরবান হিট আইল্যান্ড	136
3.3. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা	140
3.3.1. ভারতে নকশাবাদ	140
3.4. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	145
3.4.1. আর্টেমিস ২ মিশন (ARTEMIS II MISSION)	145
3.4.2. ভারতের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচি	148
3.4.3. কোয়ান্টাম টেকনোলজি	152
3.5. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	155
3.5.1. ভারতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	155
4. সাধারণ অধ্যয়ন ৪	160
4.1. নীতিশাস্ত্র	160
4.1.1. সম্মতির উপর: ক্ষমতা, আইনি অস্পষ্টতা এবং নির্যাতনের নৈতিক মাত্রা	160
4.1.2. আধুনিক রাজনীতিতে নৈতিক বৈধতার সংকট	163

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. ভারতীয় সমাজ

1.1.1. নারী শক্তি: আগামী দশকের জন্য ভারতের সংজ্ঞায়িত সংস্কার

প্রেক্ষাপট

"নারীদের জন্য উন্নয়ন" থেকে "নারীদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন"—এই চিন্তাধারার পরিবর্তনই হলো 'বিকশিত ভারত @২০৪৭' এর লক্ষ্যে ভারতের কৌশলের মূল ভিত্তি। নারী শক্তিকে এখন আর কেবল একটি কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা হয় না, বরং এটি জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।



ভারতে নারী ক্ষমতায়নের প্রধান স্তম্ভসমূহ

১. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (১০৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ২০২৩) হলো ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র পুনর্গঠনের প্রধান সংস্কার।

• প্রধান বিধানসমূহ:

- লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং দিল্লি বিধানসভায় নারীদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ করে।
- এই সংস্থাগুলোর মধ্যে SC এবং ST-দের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।
- এই আইনের বাস্তবায়ন নির্ভর করছে ২০২৬-পরবর্তী সীমানা নির্ধারণ (Delimitation) প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী আদমশুমারি (Census) সম্পন্ন হওয়ার ওপর।

• গুরুত্ব:

- "প্রক্সি" শাসনের অবসান: পঞ্চায়েত ও পুরসভার (৭৩তম/৭৪তম সংশোধনী) সাফল্যের পুনরাবৃত্তি জাতীয় ও রাজ্য স্তরে ঘটানো, যেখানে বর্তমানে ১৪ লক্ষের বেশি নারী স্থানীয় প্রশাসনে কাজ করছেন।
- নীতিগত অন্তর্ভুক্তিকরণ: অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং শ্রমের মতো ক্ষেত্রগুলোতে লিঙ্গ-সংবেদনশীল আইন প্রণয়ন নিশ্চিত করা।

২. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: চাকরিপ্রার্থী থেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী

মনোযোগ এখন নারীদের "প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব" এবং আর্থিক স্বাধীনতা তৈরির দিকে।

- লক্ষপতি দিদি উদ্যোগ: প্রায় ১০ কোটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) সদস্যদের কাজে লাগিয়ে ৩ কোটি লক্ষপতি দিদি (বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার বেশি উপার্জনকারী গ্রামীণ নারী) তৈরির লক্ষ্যমাত্রা।
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: * পিএম মুদ্রা যোজনার অধীনে প্রায় ৭০% ঋণ নারী উদ্যোক্তাদের দেওয়া হয়েছে।
- স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের ৮০% সুবিধাভোগী নারীদের জন্য সংরক্ষিত, যা মূলত নতুন বা গ্রিনফিল্ড এন্টারপ্রাইজের ওপর জোর দেয়।
- STEM-এ অংশগ্রহণ: বর্তমানে ভারতের উচ্চশিক্ষায় STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) কোর্সে নারী ভর্তির হার ৪৩%, যা বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ এবং কর্মক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তনের সংকেত।

৩. সামাজিক ও জীবন-চক্র ভিত্তিক হস্তক্ষেপ

প্রকৃত সংস্কারের জন্য নারীদের সময় ও সক্রিয়তাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কাঠামোগত সমস্যাগুলো দূর করা প্রয়োজন।

- **মর্যাদা ও নিরাপত্তা:**
 - স্বচ্ছ ভারত মিশন: ১১ কোটির বেশি শৌচাগার নির্মাণ নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নিরাপত্তার দুশ্চিন্তা কমিয়েছে।
 - জল জীবন মিশন: গ্রামীণ পরিবারে ট্যাপের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া নারীদের "সময়ের দারিদ্র্য" (Time Poverty) কমিয়েছে, কারণ আগে তাদের জল আনতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হতো।
- **সম্পত্তির মালিকানা:** পিএম আবাস যোজনা (PMAY) নারীদের ঘরের মালিক বা সহ-মালিক হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়, যা পরিবারের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়।
- **মিশন শক্তি ২.০:** এটি নারীদের নিরাপত্তা (সম্মল) এবং ক্ষমতায়নের (সামর্থ্য) জন্য একটি জীবন-চক্র পদ্ধতি অনুসরণকারী সমন্বিত ছাতা প্রকল্প।

নারী শক্তির জন্য উদীয়মান সুযোগসমূহ

১. ফ্রন্টিয়ার টেক এবং ডিজিটাল অর্থনীতি

- **"AI by HER" উদ্যোগ:** স্বাস্থ্যসেবা এবং কৃষিকে লক্ষ্য করে নারী-নেতৃত্বাধীন AI স্টার্টআপগুলোর জন্য সরকারি অর্থায়ন (২.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত)।
- **ড্রোন সখি (নমো ড্রোন দিদি):** নারীরা এখন কেবল পাইলট নন, বরং তারা এগ্রি-টেক পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে গড়ে উঠছেন, যারা চাষবাসে ড্রোন পরিচালনা করছেন।
- **সেমিকন্ডাক্টর মিশন:** হাই-এন্ড VLSI ডিজাইন এবং সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেমবলিংয়ের মতো উন্নত প্রযুক্তিগত কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. সবুজ শক্তি এবং পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি

- **বিকেন্দ্রীভূত নবায়নযোগ্য শক্তি (DRE):** গ্রামীণ নারীরা এখন সৌর মিনি-গ্রিড এবং সৌর-চালিত শিল্প ইউনিটের কেবল ব্যবহারকারী নন, বরং মালিক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন।
- **উর্জা সখি:** দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলোতে সৌর পরিকাঠামো এবং ইভি (EV) চার্জিং স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষিত নারী কারিগরি দল।
- **বর্জ্য থেকে সম্পদ (Waste-to-Wealth):** টেকসই ফ্যাশন এবং প্লাস্টিক রিসাইক্লিং স্টার্টআপে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব।

৩. আর্থিক ও কৌশলগত মোড়

- **WEP Next এবং মুদ্রা ২.০:** উত্তর-পূর্ব এবং পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য বিশেষায়িত প্রযুক্তি-উদ্যোক্তা ইনকিউবেশন এবং বর্ধিত ঋণের সীমা।
- **SHE-Mart ও GeM:** সরকারি ই-মার্কেটপ্লেসের (GeM) সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো এখন বড় সরকারি টেন্ডারে অংশ নিতে পারছে।
- **ব্লু ইকোনমি:** সামুদ্রিক লজিস্টিকস এবং টেকসই মৎস্য চাষে নতুন নেতৃত্বের ভূমিকা।

৪. মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা

- **গগনযান এবং পরবর্তী পদক্ষেপ:** চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের পর স্যাটেলাইট ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং ব্যক্তিগত মহাকাশ প্রযুক্তি স্টার্টআপে নারীদের পদচারণা বাড়ছে।
- **যুদ্ধ ও কমান্ড:** সশস্ত্র বাহিনীর সকল শাখায় নারীদের প্রবেশের সুযোগ তৈরি হওয়ায় সাইবার নিরাপত্তা এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের মতো কৌশলগত ক্ষেত্রে তারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

নারী শক্তি এবং নারীদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বাধা

- "প্রক্সি" প্রপঞ্চ (Proxy Phenomenon): স্থানীয় সংস্থাগুলোতে ৪৪% প্রতিনিধিত্ব থাকা সত্ত্বেও, প্রায়ই "সরপঞ্চ পতি"-রা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দখল করে নেয়, যা প্রকৃত ক্ষমতায়নকে কেবল একটি নামমাত্র বা টোকেনিজম-এ পরিণত করে।
- আইনগত বিলম্ব: নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (২০২৩)-এর বাস্তবায়ন ২০২৬-পরবর্তী আদমশুমারি এবং সীমানা নির্ধারণের ওপর নির্ভর করছে, যার ফলে জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব পেতে ২০২৯ বা ২০৩৪ সাল পর্যন্ত দেরি হতে পারে।
- বিচার বিভাগে "স্টেইনড গ্লাস সিলিং": কলিজিয়াম ব্যবস্থায় কাঠামোগত বাধা এবং কর্মজীবনের শেষ দিকে নিয়োগের কারণে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলোতে নারী প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম।

২. অর্থনৈতিক এবং শ্রমবাজারের বাধা

- "স্টিকি ফ্লোর" ইফেক্ট: প্রায় ৯৪% কর্মজীবী নারী অসংগঠিত ক্ষেত্রে (যেমন কৃষি/বস্ত্র শিল্প) যুক্ত, যেখানে তারা কম মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার জালে আটকা পড়ে আছেন।
- মাতৃত্বের দণ্ড (Motherhood Penalty): মধ্য-ব্যবস্থাপনা স্তরে একটি "লিঙ্কি পাইপলাইন" (প্রতিভা বারে পড়া) বিদ্যমান। নমনীয় পরিকাঠামোর অভাবে অনেক উচ্চ-সম্ভাবনাময় নারী কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।
- ঋণের সীমাবদ্ধতা (Credit Rationing): নারী-নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপগুলো মোট ভেঞ্চার ফান্ডিংয়ের মাত্র ৪% পায়। এর প্রধান কারণ হলো স্থাবর সম্পত্তির অভাব এবং বিনিয়োগকারীদের মজ্জাগত পক্ষপাত।

৩. আর্থ-সামাজিক এবং কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

- পদ্ধতিগত সময়ের দারিদ্র্য: ভারতে নারীরা ৮৪% অবৈতনিক সেবামূলক কাজ করেন। এই "দ্বৈত বোঝা" তাদের নতুন দক্ষতা অর্জন এবং নেতৃত্বে আসার সুযোগকে সীমিত করে।
- সম্পত্তির মালিকানার অভাব: ভূমি ও সম্পত্তিতে নারীদের মালিকানা অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে পরিবারের ভেতরে তাদের অর্থনৈতিক দর-কষাকষির ক্ষমতা কমে যায়।
- ডিজিটাল হয়রানি: ডিপফেক এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে অপব্যবহার সহিংসতার এক নতুন মাত্রা তৈরি করেছে, যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারীদের কণ্ঠস্বরকে রোধ করেছে।

৪. উদীয়মান চ্যালেঞ্জ

- AI এবং নকশাগত পক্ষপাত: এআই (AI) পেশাদারদের মধ্যে মাত্র ২২% নারী। এর ফলে অ্যালগরিদম তৈরির সময় প্রায়ই নারীদের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার দিকগুলো গুরুত্ব পায় না।
- জলবায়ু-প্ররোচিত "ট্রিপল বার্ডেন": জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পুরুষরা শহরে চলে যাওয়ায় গ্রামীণ নারীদের ওপর কৃষি কাজ, ঘরের কাজ এবং সম্পদ সংগ্রহের ত্রিমাত্রিক বোঝা চেপে বসছে, অথচ তাদের কোনো আইনি জমির মালিকানা নেই।

আগামী পথ

- রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের রূপান্তর: নারীদের জন্য প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল হাইসেল-ব্রোয়িং (অভিযোগ জানানোর) চ্যানেল তৈরি করে "সরপঞ্চ পতি" বা প্রক্সি শাসন দূর করতে হবে।
- বিচার বিভাগীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈচিত্র্য: কলিজিয়াম ব্যবস্থায় সংস্কার এনে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম সীমা নিশ্চিত করতে হবে।
- অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রসারণ: LokOS অ্যাপ এবং ডিজিটাল জীবিকা রেজিস্টার ব্যবহার করে আয়ের উন্নতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে ৩ কোটি গ্রামীণ নারী "লক্ষপতি দিদি" হতে পারেন।

- **বাজার ও কর্মজীবনে সমতা:** মাতৃকালীন বিরতির পর কাজে ফেরা নারীদের জন্য বিশেষ মূল্যায়ন নীতি (Performance Normalization) তৈরি করতে হবে এবং SHE-Mart ও GeM পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি বাজারের সাথে যুক্ত করতে হবে।
- **ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব:** এআই এবং স্টেম (STEM) ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ৫০%-এ উন্নীত করতে হবে। পাশাপাশি ডিপফেক এবং প্রযুক্তিগত হেনস্তা রুখতে ডিজিটাল ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-কে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
- **জলবায়ু ও সম্পত্তি সংক্রান্ত স্থিতিস্থাপকতা:** গ্রামীণ নারীদের "এগ্রি-ম্যানেজার" হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং ঋণের সুবিধার্থে জমি বা সম্পত্তির যৌথ মালিকানায় উৎসাহ দিতে হবে।

উপসংহার

নারী শক্তি হলো একটি উন্নয়নশীল ভারত এবং উন্নত ভারতের মধ্যবর্তী সেতু। আগামী দশকে নারী কেবল কতজন কর্মক্ষেত্রে আছেন তা দিয়ে বিচার হবে না, বরং কতজন নারী নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থানে আছেন তার মাধ্যমে সাফল্যের সংজ্ঞা নির্ধারিত হবে।

Q. Examine the role of the 'Life-Cycle' approach in government schemes like Nari Shakti Vandan Adhiniyam in ensuring the long-term dignity and agency of women in India. 15 Marks

1.2. ভূগোল

1.2.1. ভারতের খনি খাত

ভূমিকা

ভারতের শিল্প অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে খনি খাত বিদ্যুৎ, ইস্পাত এবং সিমেন্টের মতো মূল ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে। ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলা এবং ২০৭০ সালের মধ্যে 'নেট জিরো' লক্ষ্য অর্জনের জন্য, এই খাতটি এখন কয়লা বা লৌহ আকরিকের মতো ভারী খনিজ থেকে সরে এসে লিথিয়াম এবং কোবাল্টের মতো কৌশলগত এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে।



ভারতের খনি খাতের গুরুত্ব

১. অর্থনৈতিক গুরুত্ব: "উন্নয়নের প্রধান ইঞ্জিন"

- **জিডিপি এবং শিল্পের প্রভাব:** এটি দেশের মোট জিডিপিতে ২.২% থেকে ২.৫% অবদান রাখে এবং শিল্প উৎপাদন সূচকে (IIP) এর অবদান প্রায় ১০% থেকে ১১%।
- **গুণক প্রভাব (Multiplier Effect):** খনি খাতে ১% বৃদ্ধি উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রায় ১.২% থেকে ১.৫% বৃদ্ধি ঘটায়।
- **রাজস্ব আয়:** এটি রাজ্য সরকারগুলোর আয়ের একটি বড় উৎস, যা রয়্যালটি, নিলাম এবং ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন (DMF)-এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়।

২. কৌশলগত গুরুত্ব: জ্বালানি ও নিরাপত্তা

- **কাঁচামাল নিরাপত্তা:** এটি মূল শিল্পগুলোর জন্য প্রাথমিক কাঁচামাল সরবরাহ করে—যেমন ইস্পাতের জন্য লৌহ আকরিক, বিদ্যুতের জন্য তাপবিদ্যুৎ কয়লা (২০২৬ সালের চাহিদার ৭০%) এবং অবকাঠামোর জন্য চুনাপাথর।
- **পরিবেশবান্ধব রূপান্তর:** এটি ইভি (EV) ব্যাটারি, সোলার প্যানেল এবং সেমিকন্ডাক্টরের জন্য লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট (REEs) সরবরাহ করে ২০৭০ সালের মধ্যে নেট-জিরো লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করছে।

- **কৌশলগত স্বনির্ভরতা:** উচ্চ-প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করতে এটি আমদানির ওপর (বিশেষ করে চীনের ওপর) নির্ভরতা কমায়।

৩. সামাজিক ও আঞ্চলিক গুরুত্ব

- **কর্মসংস্থান:** এই খাতে সরাসরি ১০ লক্ষ মানুষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১ থেকে ১.৫ কোটি মানুষ কাজ করে, যা দুর্গম এলাকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়।
- **আঞ্চলিক উন্নয়ন:** ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ের মতো আদিবাসী ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলোতে এটি রাস্তাঘাট, রেল এবং স্কুলের মতো অবকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য করে।
- **সামাজিক কল্যাণ:** PMKKKY প্রকল্পের আওতায় খনি প্রভাবিত এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, পানীয় জল এবং শিক্ষার জন্য DMF তহবিল ব্যবহার করা হয়।

ভারতের খনি খাতের ভৌগোলিক বন্টন

ভারত বৈচিত্র্যময় ভূ-তাত্ত্বিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এর খনিজ সম্পদ মূলত নিচের অঞ্চলগুলোতে ঘনীভূত:

- **উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল:** ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা। এখানে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ এবং বক্সাইট পাওয়া যায়।
- **দক্ষিণ-পশ্চিম মালভূমি অঞ্চল:** কর্ণাটক, গোয়া এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশ। এখানে উচ্চমানের লৌহ আকরিক এবং ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।
- **উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল:** রাজস্থান এবং গুজরাট। এই অঞ্চলটি দস্তা, সিসা, রূপা এবং জিপসামের মতো অ-লৌহঘটিত খনিজের জন্য পরিচিত।
- **হিমালয় অঞ্চল:** এখানে তামা, সিসা, দস্তা এবং মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়, যদিও পরিবেশগত সংবেদনশীলতার কারণে এগুলো এখনো সেভাবে উত্তোলন করা হয়নি।

ভারতের খনি খাতের আইনগত এবং নীতিগত কাঠামো

১. সাংবিধানিক বিধান

- **রাজ্য তালিকা (Entry 23):** নিজ নিজ সীমানার মধ্যে খনিজ সম্পদের মালিকানা রাজ্য সরকারের।
- **কেন্দ্রীয় তালিকা (Entry 54):** জনস্বার্থে খনি ও খনিজ উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।
- **কেন্দ্রীয় তালিকা (Entry 57):** দেশের সমুদ্রসীমা বা EEZ এবং মহীসোপানের খনিজ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।

২. MMDR (সংশোধনী) আইন, ২০২৫: সাম্প্রতিক সংস্কার

- **NMET-এর সম্প্রসারণ:** এর নাম বদলে "ন্যাশনাল মিনারেল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট" করা হয়েছে, যা এখন দেশের বাইরে এবং সমুদ্রে খনিজ অনুসন্ধানে অর্থায়ন করতে পারবে।
- **সংলগ্ন এলাকা (Contiguous Areas):** খনিজ সম্পদ যাতে আটকে না থাকে, সেজন্য লিজ গ্রহীতার নিলাম ছাড়াই তাদের এলাকা বাড়াতে পারবেন (মাইনিং লিজের জন্য ১০% এবং কম্পোজিট লাইসেন্সের জন্য ৩০%)।
- **ক্যাপটিভ মাইনিং-এ নমনীয়তা:** নিজস্ব ব্যবহারের খনি (Captive Mines) থেকে খনিজ বিক্রির সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে; এখন অতিরিক্ত উৎপাদন খোলা বাজারে বিক্রি করা যাবে।

৩. MMDR (সংশোধনী) আইন, ২০২৩: কৌশলগত পরিবর্তন

- **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ:** লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং REEs-সহ ২৪টি খনিজকে "গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **বেসরকারি প্রবেশ:** লিথিয়াম এবং টাইটানিয়ামের মতো ছয়টি খনিজকে "পারমাণবিক" তালিকা থেকে সরিয়ে বেসরকারি খনির জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

- এক্সপ্লোরেশন লাইসেন্স (EL): সোনা ও তামার মতো গভীর স্তরের খনিজ (Deep-Seated Minerals) অনুসন্ধান ছোট আধুনিক সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে নতুন লাইসেন্স চালু করা হয়েছে।

৪. জাতীয় খনিজ নীতি (NMP), ২০১৯

- শিল্পের মর্যাদা: খনি খাতকে "শিল্পের মর্যাদা" দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সহজে বাণিজ্যিক ঋণ পেতে পারে।
- প্রজন্মগত সমতা (Inter-generational Equity): ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খনিজ সম্পদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- অগ্রাধিকারের অধিকার (Right of First Refusal): যারা অনুসন্ধান করবে, তাদের নিলামে অগ্রাধিকার বা প্রিমিয়ামের অংশ দিয়ে উৎসাহিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

৫. অফশোর এরিয়া মিনারেল আইন, ২০২৩

- নিলাম ব্যবস্থা: সমুদ্রের খনিজের জন্য পুরনো বরাদ্দের বদলে প্রতিযোগিতামূলক নিলাম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- কম্পোজিট লাইসেন্স: সমুদ্র এলাকায় অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের জন্য একটি একক পারমিট।
- স্থায়ী মেয়াদ: দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের নিশ্চয়তা দিতে উৎপাদনের লিজ ৫০ বছরের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

- DMF এবং PMKKKY: খনি অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে রয়্যালটির ১০-৩০% অর্থ ব্যয় করার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা।
- স্টার রেটিং: পরিবেশগত এবং সামাজিক নিয়ম মানার ওপর ভিত্তি করে খনিগুলোর মান যাচাই করার পদ্ধতি।
- সশক্ত (Sashakt) পোর্টাল: বেআইনি খনন রুখতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে স্যাটেলাইট নজরদারি (MSS) ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।

ভারতের খনি খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রশাসনিক বাধা

- অনুমোদনে বিলম্ব: পরিবেশগত (EC) এবং বনজ (FC) ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর "সিঙ্গেল উইন্ডো" বা এককালীন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এর ফলে খনিজ আবিষ্কার থেকে উত্তোলন পর্যন্ত প্রকল্পগুলো প্রায় ৫-৮ বছর পিছিয়ে যায়।
- নিয়ন্ত্রণমূলক ঝুঁকি ও সংঘাত: আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের পার্থক্য আইনি লড়াইয়ের ঝুঁকি তৈরি করে এবং নিলাম প্রক্রিয়া বা লিজ নবায়নে বিলম্ব ঘটায়।

২. পরিবেশগত এবং বাস্তুসংস্থানগত অবনতি

- জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি: ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের মতো ঘন বন অঞ্চলে খনির কাজের ফলে ব্যাপক বন উজাড়, বাসস্থানের বিভাজন এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিনাশ ঘটছে।
- দূষণ ও বর্জ্য: অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ (AMD) এবং অবৈজ্ঞানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাই জলাশয়গুলোকে দূষিত করে এবং জমির গুণমান নষ্ট করে। এছাড়া খনির ধুলো বাতাসের মানের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

৩. সামাজিক সংঘাত এবং আদিবাসী কল্যাণ

- সম্পদের অভিশাপ (Resource Curse): খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্যগুলো উচ্চ দারিদ্র্যের হারের শিকার। অপরিাপ্ত পুনর্বাসন এবং সনাতনী জীবিকা হারানোর স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ জন্মে, যা বামপন্থী চরমপন্থা (LWE) বা নকশালবাদকে উৎসাহিত করে।
- মানবাধিকার উদ্বেগ: উত্তর-পূর্ব ভারতে "র্যাট-হোল" (Rat-hole) মাইনিংয়ের মতো অবৈধ কাজ চলছে, যেখানে কোনো সুরক্ষা বিধি না মেনেই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় শিশুদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৪. প্রযুক্তিগত এবং অনুসন্ধানগত ঘাটতি

- **অনুসন্ধান ঘাটতি:** সোনা বা তামার মতো গভীর স্তরের খনিজ (Deep-Seated Mining) উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং উন্নত প্রযুক্তির অভাব ভারতে রয়েছে। ফলে খনন কাজ মূলত উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ।
- **উপাত্ত ও মানচিত্র সমস্যা:** পুরনো আমলের ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্তের কারণে নতুন অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলো খনিজ ব্লকের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না।

৫. অবৈধ খনন এবং অশুভ আঁতাত

- **ব্যাপক অবৈধতা:** স্থানীয় ঠিকাদারদের একটি অশুভ আঁতাত বালি এবং অন্যান্য গৌণ খনিজের ব্যাপক অবৈধ খনন চালাচ্ছে, যা বাস্তুসংস্থানের ক্ষতি করার পাশাপাশি সরকারের বিশাল রাজস্ব ক্ষতি ঘটাবে।
- **নজরদারিতে ঘাটতি:** মাইনিং সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম (MSS) থাকা সত্ত্বেও, প্রত্যন্ত এলাকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খনিগুলোতে নজরদারি চালানো রাজ্য প্রশাসনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

কেস স্টাডি: মেঘালয়ের র্যাট-হোল মাইনিং

সরু সুড়ঙ্গের মাধ্যমে অবৈধ এবং অবৈজ্ঞানিক খনন পদ্ধতি ঘন ঘন দুর্ঘটনা এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি ডেকে এনেছে। **ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (NGT)** এটি নিষিদ্ধ করেছে, যা স্থানীয় জীবিকা বনাম নিরাপত্তা ও পরিবেশ রক্ষার সংঘাতকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

সংস্কারে সরকারের উদ্যোগ

- **MMDR সংশোধনী (২০২৩ ও ২০২৫):** লিথিয়াম ও কোবাল্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ খাতকে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। গভীর স্তরের খনিজের জন্য এক্সপ্লোরেশন লাইসেন্স (EL) চালু এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহারে খনি এলাকা বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- **জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ মিশন (২০২৫):** দেশের ভেতরে অনুসন্ধান, KABIL-এর মাধ্যমে বিদেশে খনিজ সম্পদ অর্জন এবং স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ হাব তৈরির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- **PMKKKY:** প্রধানমন্ত্রী খনিজ ক্ষেত্র কল্যাণ যোজনা একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে খনির রয়্যালটি থেকে পাওয়া অর্থ খনি প্রভাবিত জেলার মানুষের স্বাস্থ্য, জল এবং শিক্ষার উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়।
- **স্টার রেটিং এবং S-3 কৌশল:** এটি একটি স্থায়িত্ব কাঠামো যা পরিবেশগত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে খনিগুলোকে রেটিং দেয়, যাতে টেকসই খনন পদ্ধতি উৎসাহিত হয়।
- **MSS এবং সশক্ত (Sashakt) পোর্টাল:** স্যাটেলাইট-ভিত্তিক নজরদারি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে খনি বরাদ্দ স্বচ্ছ করা এবং অবৈধ খনন বন্ধে রিয়্যাল-টাইম ব্যবস্থা গ্রহণ।

আগামীর পথ

- **গভীর স্তরের অনুসন্ধান:** উন্নত মানচিত্র এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সোনা ও তামার মতো খনিজ উত্তোলনে জোর দেওয়া এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা।
- **বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy):** ই-বর্জ্য থেকে লিথিয়াম/কোবাল্ট পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে "নগর খনির" (Urban Mining) প্রসার ঘটানো, যাতে পরিবেশের ওপর চাপ কমে এবং ২০৭০ সালের 'নেট-জিরো' লক্ষ্য পূরণ হয়।
- **সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও ESG:** স্বচ্ছ DMF তহবিল ব্যয় এবং কঠোর পরিবেশগত ও সামাজিক (ESG) নিয়ম পালনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলা।
- **মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াকরণ:** কাঁচা আকরিক রপ্তানির বদলে দেশে প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি করা, যা ভারতের কৌশলগত স্বনির্ভরতা এবং "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে।
- **প্রশাসনিক সহজীকরণ:** বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত সব ছাড়পত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য কার্যকর "সিঙ্গেল উইন্ডো" ব্যবস্থা চালু করা।

উপসংহার

ভারতের শিল্প উন্নয়ন এবং ২০৭০ সালের নেট-জিরো লক্ষ্যের জন্য খনি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনকল্যাণের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেই খনিজ নিরাপত্তা ও একটি শক্তিশালী আর্থনিক ভারত নিশ্চিত হবে।

Q. Despite India being one of the countries of the Gondwanaland, its mining industry contributes much less to Gross Domestic Product (GDP) in percentage. Discuss. 10 Marks

1.2.2. শুষ্ক দিন সামনে: ভারতের বৃষ্টিপাত ঘাটতিজনিত মৌসুমি বায়ুর প্রস্তুতি

ভূমিকা

- ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু (জুন-সেপ্টেম্বর) দেশের কৃষি, জল নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির জীবনরেখা (Lifeline)। এটি দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৭০ শতাংশ সরবরাহ করে এবং সরাসরি বৃষ্টি-নির্ভর কৃষির ওপর নির্ভরশীল অর্ধ-বিলিয়নেরও বেশি মানুষের জীবিকা নির্বাহ করে।
- টানা দুই বছর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের পর, ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর (IMD) ২০২৬ সালের মৌসুমি ঋতুর জন্য ৮ শতাংশ বৃষ্টিপাত ঘাটতি ($\pm 5\%$ অনিশ্চয়তার মার্জিনসহ) পূর্বাভাস দিয়েছে—যা একটি বিশেষ পরিস্থিতি এবং এর জন্য জরুরি নীতিগত মনোযোগ, বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি অত্যন্ত আবশ্যিক।



বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিন্যাস এবং তার ধারণা

ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাতকে লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ (LPA)-এর সাপেক্ষে শ্রেণিবদ্ধ করে। বর্তমানে ১৯৭১-২০২০ সালের গড় বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে জুন-সেপ্টেম্বর সময়কালের জন্য LPA নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৭ সেমি। প্রধান বিভাগগুলি হলো:

- স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (Normal Rainfall):** LPA-এর ৯৬ শতাংশ থেকে ১০৮ শতাংশ। এই বছরগুলোতে কৃষি উৎপাদন স্থিতিশীল থাকে এবং অর্থনীতি আবহাওয়াগত ধাক্কা থেকে সুরক্ষিত থাকে।
- স্বাভাবিকের বেশি / অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত (Above Normal / Excess):** LPA-এর ১০৮ শতাংশের বেশি। এটি ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের জন্য ভালো হলেও বন্যা এবং ফসলের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- স্বাভাবিকের নিচে বৃষ্টিপাত (Below Normal):** LPA-এর ৯০ শতাংশ থেকে ৯৬ শতাংশ। এটি আর্দ্রতার ঘাটতির সংকেত দেয়।
- ঘাটতি বৃষ্টিপাত (Deficient Rainfall):** জাতীয় স্তরে LPA-এর ৯০ শতাংশের কম। এটি সাধারণত খরা পরিস্থিতি এবং খরিফ চাষে বিঘ্ন ঘটানোর সাথে জড়িত।

খরার শ্রেণিবিন্যাস: ভারতীয় প্রেক্ষাপটে খরাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়:

- আবহাওয়াগত খরা: বৃষ্টিপাতের অভাব।
- জলতাত্ত্বিক খরা: জলাশয় ও ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর কমে যাওয়া।
- কৃষিগত খরা: মাটির আর্দ্রতা কমে ফসল বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।
- আর্থ-সামাজিক খরা: যখন জলসংকট খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২০১৫ সালে IMD-এর পূর্বাভাস ছিল ৯৩% (স্বাভাবিকের নিচে), কিন্তু বাস্তবে বৃষ্টি হয়েছিল ৮৬% (ঘাটতি)। এটি প্রমাণ করে যে "স্বাভাবিকের নিচে" পূর্বাভাসও দ্রুত খরা পরিস্থিতিতে মোড় নিতে পারে।

মৌসুমি বায়ুর কার্যপদ্ধতি: মহাসাগর-বায়ুমণ্ডলের সংযোগ

ভারতের গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু মূলত স্থলভাগ ও জলভাগের তাপমাত্রার পার্থক্যের (Differential Heating) কারণে ঘটে। তবে এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন বৈশ্বিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়:

ক. এল নিনো (El Niño)

প্রশান্ত মহাসাগরের কেন্দ্রীয় ও পূর্ব নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের অস্বাভাবিক উষ্ণায়ন।

- **প্রক্রিয়া:** এল নিনোর সময় ওয়াকার সার্কুলেশন (Walker Circulation) দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বায়ুর নিম্নগামী চলন ঘটে, যা মৌসুমি বায়ুকে দুর্বল করে দেয়।
- **প্রভাব:** এটি ভারতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ঘটায়। ১৯৫০ সাল থেকে ১৬টি এল নিনো বছরের মধ্যে ৯ বারই ভারতে খরা বা ঘাটতি দেখা গেছে।
- **২০২৬ প্রেক্ষাপট:** ২০২৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এল নিনো ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খ. লা নিনা (La Niña)

এটি এল নিনোর বিপরীত অবস্থা, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের জল অস্বাভাবিক শীতল থাকে।

- **প্রভাব:** লা নিনা বছরগুলোতে ভারতে সাধারণত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

গ. ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল (IOD) - পাল্টা ব্যবস্থা

একে 'ভারতীয় এল নিনো' বলা হয়। এটি ভারত মহাসাগরের পশ্চিম ও পূর্ব অংশের তাপমাত্রার পার্থক্য।

- **পজিটিভ IOD (Positive IOD):** যখন পশ্চিম ভারত মহাসাগর উষ্ণ থাকে। এটি এল নিনোর নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে বৃষ্টিপাত বাড়াতে সাহায্য করে।
- **নেগেটিভ IOD (Negative IOD):** এটি ভারতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি এবং খরার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

ঘ. মাদেন-জুলিয়ান অসিলেশন (MJO) — আন্তঃঋতু নিয়ন্ত্রক:

এটি নিরক্ষীয় ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসরমান একটি বায়ুমণ্ডলীয় ব্যবস্থা, যা ৩০-৬০ দিনের চক্রে মেঘের ঘনত্বের (convection) বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটায়।

- **ভারত মহাসাগরের ওপর সক্রিয় পর্যায় (Active Phase):** এটি ভারতে জলীয় বাষ্পের অভিসরণ এবং বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি করে।
- **ভারত মহাসাগরের ওপর অবদমিত পর্যায় (Suppressed Phase):** এর ফলে মৌসুমি বৃষ্টিপাতে সাময়িক বিরতি বা বৃষ্টিপাত হ্রাস পায়।
- **IMD-এর ব্যবহার:** আবহাওয়া দপ্তর কৃষি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য বর্ধিত-পরিসরের পূর্বাভাসের (২-৪ সপ্তাহ) ক্ষেত্রে MJO ব্যবহার করে।

ঙ. ইকুয়েটরিয়াল ইন্ডিয়ান ওশান অসিলেশন (EQUINOO):

নিরক্ষীয় ভারত মহাসাগরের ওপর পরিচলন বা মেঘ তৈরির প্রক্রিয়ার পরিবর্তনশীলতা, যা পুনে-র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি (IITM) দ্বারা চিহ্নিত। এটি মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর প্রভাব ফেলতে IOD-কে পরিপূরক হিসেবে সহায়তা করে।

- **ইউরেশীয় তুষারপাত (Eurasian Snow Cover):** এটি স্থল ও সমুদ্রের তাপীয় বৈসাদৃশ্যকে (thermal contrast) প্রভাবিত করে, যা মৌসুমি বায়ুর আগমন এবং শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- **আটলান্টিক মেরিডিওনাল ওভারটার্নিং সার্কুলেশন (AMOC):** এটি আটলান্টিক মহাসাগরের একটি বৃহৎ আকারের সংবহন ব্যবস্থা, যা টেলিকানেকশনের (teleconnections) মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু এবং ভারতীয় মৌসুমি বায়ুকে প্রভাবিত করে।

- **উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা (SSTs):** এই অঞ্চলের তাপমাত্রার পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনকে পরিবর্তন করে ভারতীয় মৌসুমি বায়ুর ওপর প্রভাব ফেলে।

মৌসুমি বায়ুর পূর্বাভাস কেন চ্যালেঞ্জিং?

এল নিনো, লা নিনা এবং IOD-এর মতো একাধিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রকের অ-রৈখিক মিথস্ক্রিয়ার (non-linear interaction) কারণে মৌসুমি বায়ুর নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজাতভাবেই কঠিন।

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- **সময়ের অনিশ্চয়তা (Timing uncertainty):** এল নিনোর প্রভাব নির্ভর করে এটি মৌসুমি ঋতুর মধ্যে নাকি বাইরে তার সর্বোচ্চ শিখরে (peaks) পৌঁছাচ্ছে তার ওপর।
- **তীব্রতার তারতম্য (Intensity variation):** দুর্বল এল নিনো পরিস্থিতি অনেক সময় বৃষ্টিপাতকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত নাও করতে পারে।
- **আঞ্চলিক বৈচিত্র্য (Regional diversity):** ভারতের বিভিন্ন অংশে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বৃষ্টিপাতের ধরণ (যেমন—একদিকে খরা, অন্যদিকে অতিবৃষ্টি) দেখা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ: ২০১৯ সালে এল নিনো সদৃশ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভারতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল, যা ডিটারমিনিস্টিক (নিশ্চায়ক) পূর্বাভাসের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে।

এই জটিলতাগুলি নির্দেশ করে যে মৌসুমি বায়ুর পূর্বাভাস মূলত **সম্ভাবনাময় (probabilistic)**, কোনো ধ্রুব সত্য নয়। তাই এটি সতর্ক ব্যাখ্যা এবং নমনীয় নীতিগত প্রতিক্রিয়ার দাবি রাখে।

ঘাটতি মৌসুমি বায়ুর বছরে উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **কৃষি সংকট (Agricultural Stress):** ধান, ডাল, তৈলবীজ এবং আখের মতো **খরিফ ফসল (Kharif crops)** সরাসরি মৌসুমি ঋতুতে বপন করা হয়। বৃষ্টির ঘাটতি চাষের এলাকা কমিয়ে দেয়, ফলন হ্রাস করে এবং খামারে সংকট তৈরি করে—বিশেষ করে সেই সব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের (small and marginal farmers) জন্য যাদের সেচের সুব্যবস্থা নেই।
- **মুদ্রাস্ফীতির চাপ (Inflationary Pressures):** অপরিাপ্ত মৌসুমি বায়ুর সরাসরি ফলাফল হলো **খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি (Food inflation)**। ডাল এবং তৈলবীজের ঘাটতি **উপভোক্তা মূল্য সূচক (CPI)**-কে বিঘ্নিত করতে পারে, যা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে (RBI) সুদের হার উচ্চ রাখতে বাধ্য করে, ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়।
- **সার ও কৃষি উপকরণের অনিশ্চয়তা (Fertilizer and Input Uncertainty):** পশ্চিম এশিয়ার চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা—যা ভারতের **ইউরিয়া (Urea)** উৎপাদনে ব্যবহৃত **প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)** সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ—কৃষি সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি সারের প্রাপ্যতা ব্যাহত করতে পারে এবং কৃষি উপকরণের খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে এমন এক সময়ে যখন কৃষকরা ইতিপূর্বেই কম বৃষ্টির কবলে পড়েছেন।
- **গ্রামীণ চাহিদা সংকোচন (Rural Demand Contraction):** গ্রামীণ অর্থনীতি সরাসরি কৃষি আয়ের সাথে জড়িত। একটি খারাপ মৌসুমি ঋতু গ্রামীণ মানুষের **ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing power)** কমিয়ে দেয়, যার ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যায় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ধীর হয়ে যেতে পারে।
- **জল-শক্তি সংকট (Water-Energy Stress):** ঘাটতি মৌসুমি বায়ু জলাধারের পুনর্ভরণ (Recharge) কমিয়ে দেয়। এর ফলে জলের স্তর অত্যন্ত নিচে নেমে যায় যা **রবি শস্যের (Rabi season)** সেচ এবং পানীয় জল সরবরাহকে প্রভাবিত করে। একইসাথে এটি **জলবিদ্যুৎ (Hydropower)** উৎপাদন কমিয়ে দেয়, যার ফলে ব্যয়বহুল তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক শক্তি সংকট তৈরি হয়।

সরকারি উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- **জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (NDMA):** এটি খরার সময়ে প্রাথমিক সতর্কতা প্রচার এবং আন্তঃরাজ্য সমন্বয়সহ নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

- **প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (PMFBY):** এই ফ্ল্যাগশিপ শস্য বিমা প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো খরাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ক্ষতির জন্য কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। তবে নথিকরণ এবং দাবি মেটাতে বিলম্ব এখনও একটি উদ্বেগের বিষয়।
- **প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চায়ী যোজনা (PMKSY):** এটি "হর খেত কো পানি" (প্রতিটি জমিতে জল) এবং ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে "পার ড্রপ মোর ক্রপ" (প্রতি বিন্দু জলে অধিক ফসল)-এর ওপর গুরুত্ব দেয়।
- **MNREGA ইন্টিগ্রেশন:** এই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিমটি খরা বছরে একটি স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলকারী (Economic stabiliser) হিসেবে কাজ করে। যখন কৃষি কাজ কমে যায়, তখন এটি গ্রামীণ পরিবারগুলোকে মজুরি আয় নিশ্চিত করে।
- **জাতীয় জল মিশন (National Water Mission):** এর উদ্দেশ্য হলো জল ব্যবহারের দক্ষতা এবং সংরক্ষণ বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে সেচের আধুনিকীকরণ এবং ভূ-গর্ভস্থ জল নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেওয়া।
- **IMD-এর কৃষি-আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ পরিষেবা (Agrometeorological Advisory Services):** এটি এসএমএস এবং কৃষি পোর্টালের মাধ্যমে কৃষকদের জেলা-ভিত্তিক শস্য ও আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে, যা সঠিক সময়ে বীজ বপন এবং শস্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- **PM-KUSUM এবং সৌর সেচ:** এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ডিজেল-চালিত সেচের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সৌর পাম্প (Solar pumps) ব্যবহারের প্রচার করা। এটি কৃষকদের পরিচালন ব্যয় কমায় এবং ভূ-গর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

ক. তাৎক্ষণিক প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা (Immediate Preparedness Measures)

- **আবহাওয়া-কৃষি পরামর্শ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ:**
 - ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে IMD পূর্বাভাস-এর সাথে সম্প্রসারণ পরিষেবা (Extension services)-এর আরও উন্নত সমন্বয় সাধন করা, যাতে কৃষকরা বীজ বপন, শস্য নির্বাচন এবং জল ব্যবস্থাপনার জন্য উপযোগী পরামর্শ (Tailored advisories) পায়।
 - যেসব অঞ্চলে বৃষ্টির ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে স্বল্প-মেয়াদী এবং খরা-সহনশীল জাতের (যেমন—স্বল্প-মেয়াদী ধান, মিলেট, ডাল) চাষকে উৎসাহিত করা।
- **কৃষি উপকরণের সমন্বয়োগ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা:**
 - সারের মজুদ (Fertilizer stocks) বৃদ্ধি করা এবং বন্টন ব্যবস্থার ওপর নজর রাখা যাতে স্থানীয় স্তরে কোনো সংকট তৈরি না হয়।
 - আমদানিকৃত গ্যাস-নির্ভর উপকরণের ওপর নির্ভরতা কমাতে নাইট্রোজেন-ভিত্তিক সার এবং জৈব-সার (Bio-fertilizers)-এর অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- **জল এবং জলাধারের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা:**
 - জলাধারগুলি থেকে বিশেষ করে আন্তঃরাজ্য নদী অববাহিকায় ন্যায্যসংগত জল বন্টন (Equitable water distribution)-কে অগ্রাধিকার দেওয়া।
 - গ্রীষ্মকালীন সেচ বিধিনিষেধ কার্যকর করা, ক্ষুদ্র সেচ (Micro-irrigation)-এর প্রসার ঘটানো এবং কমিউনিটি স্তরে জল সশ্রয়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।

খ. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কার (Medium- and Long-Term Structural Reforms)

- **জল সংগ্রহ এবং ভূ-গর্ভস্থ জল পুনর্ভরণে বিনিয়োগ:**
 - বর্ষার জলকে ধরে রাখতে এবং ভূ-গর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা কমাতে জলবিভাজিকা উন্নয়ন (Watershed development), পুকুর ও দীঘি সংস্কার এবং কৃত্রিম পুনর্ভরণ কাঠামো (Artificial-recharge structures) স্কেল-আপ করা।

- নিয়ন্ত্রিত কৃপ খনন, অ্যাকুইফার ম্যাপিং (Aquifer-mapping) এবং কমিউনিটি স্তরে ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনার প্রসার ঘটানো।
- **শস্য বৈচিত্র্যায়ন (Diversify Cropping Patterns):**
 - ধান-প্রধান কৃষিজমিগুলিকে পর্যায়ক্রমে মিলেট, ডাল এবং তৈলবীজ চাষের দিকে সরিয়ে নিয়ে আসা, যা কম জল-নিবিড় এবং অনেক বেশি জলবায়ু-সহনশীল (Climate-resilient)।
 - এই শস্যগুলির জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (MSP), বাজার সংযোগ এবং সংগ্রহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে কৃষকরা দামের ঝুঁকির কারণে নিরুৎসাহিত না হন।
- **জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামো উন্নত করা:**
 - বন্যা এবং খরা-সহনশীল গ্রামীণ পরিকাঠামো (যেমন—বাঁধ, ড্রেনেজ চ্যানেল, কমিউনিটি স্টোরেজ) উন্নত করা।
 - শহুরে পরিকল্পনায়, বিশেষ করে জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির জল নিকাশী (Stormwater drainage) ব্যবস্থায় জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন (Climate-risk assessments) অন্তর্ভুক্ত করা।
- **পূর্বাভাস এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ:**
 - মৌসুমি বায়ুর পূর্বাভাসের স্থানিক ও সাময়িক নির্ভুলতা (Spatial and temporal accuracy) উন্নত করতে উচ্চ-রেজোলিউশন মডেল, স্যাটেলাইট ডেটা এবং AI-ভিত্তিক টুল-এ বিনিয়োগ করা।
 - খরা এবং বন্যার আগাম সতর্কবার্তা দিতে মাটির আর্দ্রতা (Soil-moisture), নদীর প্রবাহ, জলাধারের স্তর এবং ভূ-গর্ভস্থ জলের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা।

উপসংহার

ভারতের মৌসুমি বায়ু, যা এল নিনো (El Niño), লা নিনা (La Niña) এবং ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল (IOD)-এর মতো জটিল মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়; যখন বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়, তখন তা কৃষি, জলসম্পদ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় প্রত্যাশিত শাসন ব্যবস্থা (Anticipatory governance)-র দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, যা বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস, প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু অনিশ্চয়তাকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য কমিউনিটি স্থিতিস্থাপকতা (Community resilience)-কে একীভূত করবে।

Q. India's monsoon is increasingly influenced by complex ocean-atmosphere interactions rather than simple land-sea thermal contrast. Discuss and suggest a suitable way forward to enhance India's resilience to monsoon variability. 15 Marks

1.3. সংস্কৃতি

1.3.1. সুভাষচন্দ্র বসুর বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক দর্শন

ভূমিকা

সুভাষচন্দ্র বসু কেবল একজন জাতীয়তাবাদী নেতাই ছিলেন না, বরং তিনি একজন অত্যন্ত গভীর রাজনৈতিক চিন্তাবিদও ছিলেন। তিনি প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের বস্তুবাদে মধ্য একটি সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা আদর্শবাদ → বাস্তববাদ → সংগ্রামী সক্রিয়তাবাদের একটি বিবর্তনকে তুলে ধরে।



১. দার্শনিক ভিত্তি: বেদান্ত থেকে দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁর গভীর দার্শনিক বিবর্তনের দ্বারা পরিচালিত ছিল, যা বিমূর্ত আধ্যাত্মিকতা থেকে “বিপ্লবী বাস্তববাদে” রূপান্তরিত হয়েছিল।

- **মায়াবাদ বর্জন:** শুরুতে শঙ্করাচার্যের বেদান্তের অনুসারী হলেও, বসু পরবর্তীকালে মায়াবাদ (জগত একটি বিভ্রম)—এই ধারণাকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, যদি জগতই মিথ্যা বা বিভ্রম হয়, তবে স্বাধীনতার সংগ্রামের নৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে যায়।
- **আত্মার বাস্তবতা:** তাঁর আত্মজীবনী “অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম” (১৯৩৭)-এ তিনি এই বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকেছিলেন যে, জগত হলো পরম আত্মার একটি প্রকাশ। তিনি এই বাস্তবতার মূল প্রকৃতিকে “ভালোবাসা” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।
- **হেগেলীয় প্রভাব:** বসু হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব (তত্ত্ব + প্রতিতত্ত্ব = সমন্বয়)-কে অগ্রগতির নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের লক্ষ্য হলো প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের বস্তুগত গতিশীলতার মধ্যে একটি “উচ্চতর সমন্বয়” খুঁজে বের করা।

২. সাম্যবাদ: সৌহার্দ্যপূর্ণ সমতার আদর্শ

বসু চাননি ভারত অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের কোনো মতাদর্শকে অনুকরণ করুক। পরিবর্তে, তিনি “সাম্যবাদ”—নামক একটি নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর প্রস্তাব করেছিলেন।

- **ব্যুৎপত্তি:** এটি সংস্কৃত শব্দ ‘সাম্য’ (সমতা/মিল) এবং ‘বাদ’ (মতবাদ) থেকে উদ্ভূত।
- **তৃতীয় পথ:** বসু ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিজমকে বিবর্তনের প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন পর্যায় হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি এমন একটি সমন্বয়ের প্রস্তাব করেছিলেন যা কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সামাজিক সমতাকে গ্রহণ করবে, কিন্তু একই সাথে জাতীয়তাবাদী শৃঙ্খলা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কেও বজায় রাখবে।
- **বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য:** তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ “দ্য অ্যান্টি-ইম্পেরিয়ালিস্ট স্ট্রাগল অ্যান্ড সাম্যবাদ” (১৯৩৩)-এ তিনি দাবি করেছিলেন যে, যেভাবে ফ্রান্স “স্বাধীনতা” এবং ইংল্যান্ড “সাংবিধানিকতা” দিয়েছে, বিশ্বের কাছে ভারতের অবদান হবে সাম্যবাদের বাস্তবায়ন।

৩. অর্থনৈতিক ভাবনা: বৈজ্ঞানিক আধুনিকীকরণ

বসু ছিলেন বৃহৎ শিল্পের একজন কটর সমর্থক, যা অনেক ক্ষেত্রে গান্ধীজির “গ্রামীণ অর্থনীতি” মডেলের বিপরীত ছিল।

- **জাতীয় পরিকল্পনা:** ১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তিনি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি (যার প্রধান ছিলেন নেহেরু) গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র “বৈজ্ঞানিক ব্লুপ্রিন্ট”—এর মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।
- **পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি:**
 1. উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ।
 2. জমিদারি প্রথা বিলোপ।
 3. কৃষি কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ।
 4. কুটির শিল্পের পাশাপাশি ভারী শিল্পের বিকাশ।

৪. রাজনৈতিক চর্চা: “শক্তিশালী রাষ্ট্র” তত্ত্ব

একটি পরাধীন দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে বসুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিতর্কিত কিন্তু বাস্তবসম্মত।

- **আদর্শ সংঘ:** তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতার পরপরই ভারতের মতো একটি খণ্ডিত এবং দরিদ্র দেশ ধীরগতির বিকেন্দ্রীভূত গণতন্ত্র সামলাতে পারবে না।

- **সাময়িক একনায়কত্ব:** তিনি “পুনর্গঠনের সময়ের” জন্য পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি **শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের** পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তিনি কামাল আতাতুর্কের তুরস্ক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত পরিবর্তনের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে আধুনিকীকরণে কেন্দ্রীয় শাসনের কার্যকারিতা কতটা বেশি।
- **স্বাধীনতার সংজ্ঞা:** বসুর কাছে স্বাধীনতা মানে কেবল রাজনৈতিক মুক্তি ছিল না; এটি ছিল **জাতীয়তাবাদ**, বর্ণভেদ প্রথা দূরীকরণ এবং সম্পদের বৈষম্য দূর করার একটি মাধ্যম।

৫. তুলনামূলক বিশ্লেষণ: বসু বনাম গান্ধী

বৈশিষ্ট্য	মহাত্মা গান্ধী	সুভাষচন্দ্র বসু
মতাদর্শ	আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিক আদর্শবাদ	বিপ্লবী বাস্তববাদ এবং সমন্বয়বাদ
পদ্ধতি	চরম অহিংসা (অহিংসা)	শক্তি প্রয়োগকে নৈতিক প্রয়োজন মনে করতেন
অর্থনীতি	বিকেন্দ্রীভূত, গ্রামীণ (চরকা)	কেন্দ্রীয়, শিল্পভিত্তিক (পরিকল্পনা)
রাষ্ট্র	রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহান ছিলেন	শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে বিশ্বাসী ছিলেন

সুভাষচন্দ্র বসুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক দর্শনের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

১. শক্তি বা সবল দিক: স্বপ্নদ্রষ্টা বাস্তববাদী

- **সমাজতন্ত্রের ভারতীয়করণ:** তিনি পাশ্চাত্যের মার্কসবাদকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে বরং ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করে সাম্যবাদকে “সৌহার্দ্যপূর্ণ সমতা” হিসেবে তুলে ধরেন। এটি সমাজতন্ত্রকে এদেশের মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলে।
- **পরিকল্পনার স্থপতি:** স্বাধীনতার অনেক আগেই তিনি বুঝেছিলেন যে অর্থনৈতিক শক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। ১৯৩৮ সালে **ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি** গঠন করে তিনি জাতীয় আন্দোলনকে নিছক প্রতিবাদ থেকে **দেশ গড়ার** দিকে চালিত করেন।
- **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি:** তাঁর স্বাধীনতার ধারণা ছিল অত্যন্ত আধুনিক। তিনি জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণ নির্মূল করার ডাক দেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের (যেমন: **ঝাঁসি রানী রেজিমেণ্ট**) অংশগ্রহণের পথপ্রদর্শক ছিলেন।
- **বাস্তবসম্মত ভূ-রাজনীতি:** তিনি “শত্রুর শত্রু বন্ধু হয়”—এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে তিনি ভারতের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁকে একজন দক্ষ **কূটনীতিবিদ** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

২. দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা: একনায়কতন্ত্রের ঝুঁকি

- **একনায়কত্বের ফাঁদ:** পুনর্গঠনের জন্য তাঁর “শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার” এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দাবি সমালোচনার মুখে পড়ে। ইতিহাস বলে যে “সাময়িক একনায়কত্ব” প্রায়ই স্থায়ী হয়ে যায়, যা নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে।
- **বৈচিত্র্যের অবমূল্যায়ন:** বসুর এই কেন্দ্রীয় শাসন মডেল ভারতের বিশাল ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে হয়তো উপেক্ষা করেছিল। ভারতের মতো বিচিত্র দেশে সংবিধান যে **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** দিয়েছে, তা হয়তো বসুর অতি-কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় সংকটে পড়ত।
- **সমন্বয়ের জটিলতা:** সমালোচকদের মতে, ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিজমের সমন্বয় ঘটানো আদর্শগতভাবে একটি স্ববিরোধী প্রচেষ্টা। কারণ এই দুটি ব্যবস্থারই ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ে একেবারে ভিন্ন ও বিপরীত ধারণা ছিল।
- **জনভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি:** গান্ধীজির অহিংসা এবং গ্রামীণ ক্ষমতায়নের বদলে সশস্ত্র সংগ্রাম ও শিল্পায়নকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তিনি হয়তো ভারতের বিশাল কৃষক সমাজ থেকে কিছুটা দূরে সরে যাওয়ার ঝুঁকিতে ছিলেন।

ভারতের জন্য বসুর মতাদর্শের সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

- **অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং "আত্মনির্ভর ভারত":** বসুর "বৈজ্ঞানিক বৃহৎ উৎপাদন"-এর দাবি বর্তমান যুগের **মেক ইন ইন্ডিয়া** এবং **পিএলআই (PLI)** স্কিমগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাঁর কৌশলগত দূরদর্শিতার উত্তরাধিকার আজ **নীতি আয়োগের (NITI Aayog)** মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে, যা মূলত তাঁর তৈরি ১৯৩৮ সালের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটিরই একটি বিবর্তিত রূপ।
- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং বহুমুখী জোট (Multi-Alignment):** তাঁর বাস্তববাদী "জাতীয় স্বার্থ আগে" কূটনৈতিক নীতি ভারতের বর্তমান **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের (Strategic Autonomy)** পথপ্রদর্শক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর তাঁর বিশেষ গুরুত্ব আজ ভারতের **অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি (Act East Policy)** এবং **কোয়াড (QUAD)**-এ অংশগ্রহণের একটি প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- **সামাজিক প্রকৌশল এবং অন্তর্ভুক্তি:** আজাদ হিন্দ ফৌজের (INA) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মডেল জাতীয় সংহতির জন্য একটি চিরন্তন রূপরেখা প্রদান করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত **ঝাঁসি রানী রেজিমেন্ট** মূলত 'নারী শক্তি'র যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা আজ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে নারীদের **পার্মানেন্ট কমিশন** প্রদানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- **শাসনব্যবস্থা এবং "শক্তিশালী রাষ্ট্র" বিতর্ক:** প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর তাঁর জোর দেওয়া বর্তমান সরকারের **"মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্স"** সংস্কার কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিকাঠামো এবং ভূমি সংস্কারের বাধাগুলো দূর করতে "নির্ণায়ক নির্বাহী ক্ষমতা" বা **শক্তিশালী নেতৃত্বের** প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আজও ভারতে আলোচনা হয়।
- **প্রযুক্তি এবং শাসন:** একজন আধুনিকমনা মানুষ হিসেবে বসু সামাজিক সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজ **ডিজিটাল ইন্ডিয়া**-র মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, যেখানে **UPI** এবং **ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)**-এর মতো মাধ্যমগুলো সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে একটি "বৈজ্ঞানিক রুপান্তর" হিসেবে কাজ করছে।
- **জাতীয় চরিত্র ও শৃঙ্খলা:** বসু দেশ পুনর্গঠনের জন্য একটি সুশৃঙ্খল **"আদর্শ সংঘ"**-এর ওপর জোর দিয়েছিলেন। কর্তব্যপরায়ণতা এবং সুশৃঙ্খল নাগরিকত্বের এই ধারণা আজকের **মৌলিক কর্তব্য** সচেতনতা এবং **NCC/NSS**-এর মাধ্যমে যুবশক্তিকে দেশ গড়ার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টার সাথে গভীরভাবে মিলে যায়।

উপসংহার

নেতাজীর **বেদান্তিক আদর্শবাদ** এবং **বৈজ্ঞানিক আধুনিকতাবাদের** সমন্বয় একটি স্বনির্ভর ভারতের মূল ভিত্তি। তাঁর কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শিল্প পরিকল্পনার উত্তরাধিকার ভারতকে একটি উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক **মহাশক্তি** হয়ে ওঠার পথে আজও প্রেরণা জোগাচ্ছে।

Q. Subhas Chandra Bose's concept of Samyavada was an attempt to synthesize Eastern spiritual philosophy with Western political ideologies. Critically examine its relevance and limitations in the context of modern democratic India. 15 Marks

1.3.2. সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার গুরুত্ব

ভূমিকা

ভারতের মতো একটি **আধুনিক গণতন্ত্রে**, প্রাক্তন রাজপরিবারগুলোর অবস্থান একটি জটিল বিষয় যা **সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং রাজনীতিকে** একসূত্রে গেঁথেছে। যদিও ১৯৪৭ সালে দেশীয় রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের **রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের** অবসান ঘটেছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে **২৬তম সংশোধনী** দ্বারা **'প্রিভি পার্স'** (রাজভাতা) বিলুপ্ত করা হয়েছিল, তবুও সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাদের উপস্থিতি আজও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি **'জীবন্ত ঐতিহ্য'** (Lived Heritage) রক্ষা এবং **সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের** গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে একটি "গভীর টানাপোড়েন" সৃষ্টি করে।



ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে ঐতিহ্য: মূল বিতর্ক

মূল বিতর্কটি হলো—প্রাক্তন রাজপরিবারগুলোর বর্তমান দৃশ্যমানতা কি কেবল সাংস্কৃতিক সংরক্ষণকে উৎসাহিত করে, নাকি এটি ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা সামাজিক বৈষম্যকে নান্দনিক রূপ দিয়ে তুলে ধরে?

সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি: উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুযোগ বনাম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

প্রাক্তন রাজপরিবারগুলোর বর্তমান অস্তিত্বকে প্রায়ই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়।

- **বৈষম্যের প্রতীক:** সমালোচকদের মতে, রাজকীয় অভিজাত্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতিনিধিত্ব করে, যা একটি শ্রেণীহীন ও সাম্যবাদী সমাজের সাংবিধানিক লক্ষ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
- **স্তরবিন্যাসের নান্দনিকতা:** পোশাক-আশাক, স্থাপত্য এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ক্ষমতার কাঠামোকে "সৌন্দর্যের বস্তু" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এটি সেই শোষণ এবং বৈষম্যের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে আড়াল করতে পারে যা একসময় এই অভিজাত্য টিকিয়ে রেখেছিল।
- **সাংস্কৃতিক বর্ণনার ওপর একাধিপত্য:** একটি বড় ঝুঁকি হলো যে, সাংস্কৃতিক বিবরণগুলো মূলত রাজপরিবার বা বৈশ্বিক মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। এতে প্রকৃত কারিগর—অর্থাৎ শিল্পী এবং আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- **ক্ষমতার ক্ষেত্র হিসেবে সংস্কৃতি:** এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, রাজকীয় ঐতিহ্য রক্ষা করা কোনো নিরপেক্ষ কাজ নয়; বরং এটি একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ যা প্রথাগত সামাজিক স্তরবিন্যাসকে আরও শক্তিশালী করে।

বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি: ঐতিহ্যের অভিভাবকত্ব

অন্য একটি মতানুসারে, এই পরিবারগুলো ভারতের অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে একটি অপরিহার্য সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

- **দৃশ্যমান ঐতিহ্যের রক্ষক:** প্রাসাদ এবং স্মৃতিস্তম্ভগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ একটি বিশাল এবং জটিল কাজ। রাজপরিবারগুলোর সক্রিয় তত্ত্বাবধান ছাড়া এই অমূল্য স্থাপত্যগুলো নগরায়ন বা অমৌজিক বাণিজ্যিক উন্নয়নের কারণে ধ্বংস হয়ে যেতে পারত।
- **কারুশিল্পের স্থায়িত্ব:** ঐতিহাসিকভাবে, ভারতীয় শিল্পকলা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে অনেক ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প টিকে থাকার লড়াই করছে; এক্ষেত্রে প্রাক্তন রাজপরিবারগুলো এই শিল্পী সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় প্ল্যাটফর্ম এবং সুযোগ প্রদান করে।
- **জীবন্ত ঐতিহ্য বনাম কৃত্রিম প্রদর্শনী:** জাদুঘরের নিষ্প্রাণ নিদর্শনের চেয়ে 'জীবন্ত ঐতিহ্য' (Lived Heritage) আলাদা। এর মধ্যে এমন কিছু আচার-অনুষ্ঠান এবং জ্ঞান ব্যবস্থা রয়েছে যা কেবল নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটেই জীবন্ত থাকে। প্রথাগত কাঠামোটি সরিয়ে দিলে সংস্কৃতিটি কেবল একটি "কৃত্রিম পারফরম্যান্স" বা প্রদর্শনীতে পরিণত হতে পারে।

"জীবন্ত ঐতিহ্য" এবং সম্প্রদায়ের ধারণা

এটি লক্ষ্যণীয় যে, রাজকীয় কাঠামো বা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সমালোচিত হলেও, অনেক সময় এটি সাংস্কৃতিক প্রবাহ বজায় রাখার একটি কাঠামো হিসেবে কাজ করে।

- **অংশগ্রহণের কাঠামো:** ইউরোপের ধর্মীয় শোভাযাত্রার মতোই, ভারতের অনেক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। এই অনুষ্ঠানগুলো আজও টিকে আছে কারণ স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো এগুলোকে তাদের পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করেছে।
- **প্রথার ধারাবাহিকতা:** এই প্রথাগত পরিবারগুলোর কাঠামো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নির্দিষ্ট অর্থ ও সংস্কৃতি বহন করতে সাহায্য করে, যা আধুনিকায়নের চাপে অন্যথায় হারিয়ে যেতে পারত।

মূল সমস্যা: ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জ

- **সাংবিধানিক বনাম ঐতিহাসিক বৈধতা:** আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর যৌথ চেতনায় প্রাক্তন রাজপরিবারগুলো এখনও যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক "গুরুত্ব" বহন করে, তাকে স্বীকার করার পাশাপাশি ধারা ১৪ (সাম্য) বজায় রাখার কঠিন সংগ্রাম।

- **সংরক্ষণ বনাম অগ্রগতি: সামাজিক সংস্কার** (সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা দূর করা) বাস্তবায়নের কঠিন চ্যালেঞ্জ, যাতে কোনোভাবেই "সাংস্কৃতিক দরিদ্রতা" না ঘটে—অর্থাৎ এই পরিবারগুলোর আশ্রয়ে থাকা বিশেষ জ্ঞান, আচার-অনুষ্ঠান এবং কারুশিল্পের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।
- **পৃষ্ঠপোষকতার রূপান্তর:** রাজকীয় বা অভিজাত-চালিত পৃষ্ঠপোষকতা থেকে রাষ্ট্র বা বাজার-চালিত মডেলে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ; যাতে ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শিল্পের "প্রাণ" বা মৌলিকত্ব হারিয়ে না যায়।
- **মৌলিকত্ব বনাম অনুকরণ:** "জীবন্ত ঐতিহ্য"-কে কেবল একটি "পর্যটন প্রদর্শনীতে" পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা। চ্যালেঞ্জটি হলো ঐতিহ্যগুলোকে কেবল বিশ্ববাজারের জন্য একটি ফাঁপা প্রদর্শনী না বানিয়ে সেগুলোকে সম্প্রদায়ের পরিচয়ের একটি অর্থবহ অংশ হিসেবে টিকিয়ে রাখা।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক বর্ণনা:** রাজা-রানীদের "উপরতলার" ইতিহাসের সাথে কারিগর ও কৃষকদের "নিচুতলার" ইতিহাসের ভারসাম্য রক্ষা করা; যাতে ঐতিহ্য সংরক্ষণ কোনো উঁচু-নিচু ভেদাভেদের প্রতীক না হয়ে একটি গণতান্ত্রিক চর্চায় পরিণত হয়।
- **অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব:** ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর অসংবেদনশীল বাণিজ্যিক উন্নয়ন (যেমন- একটি প্রাসাদকে আধুনিক কাঁচের হোটেলে রূপান্তর) এবং রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই বিশাল কাঠামোগুলো রক্ষণাবেক্ষণের আর্থিক অসাধ্যতার মধ্যে একটি মধ্যপন্থা খুঁজে বের করা।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **পৃষ্ঠপোষকতার গণতান্ত্রিকীকরণ:** ব্যক্তিগত "রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা" থেকে সম্প্রদায়-চালিত মডেলে রূপান্তর, যেখানে স্থানীয় কারিগর সংগঠনগুলো হবে ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রধান অংশীদার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।
- **সরকারি-বেসরকারি-সম্প্রদায় অংশীদারিত্ব (PPCP):** রাষ্ট্র (নিয়ন্ত্রণ), প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক (পরিচালনা) এবং স্থানীয় সম্প্রদায় (সক্রিয় অংশগ্রহণ)-এর সমন্বয়ে একটি সহযোগিতামূলক কাঠামো তৈরি করা যাতে রক্ষণাবেক্ষণের ভার সবাই মিলে ভাগ করে নিতে পারে।
- **ডিজিটাল সুরক্ষা:** প্রথাগত সামাজিক কাঠামোর ওপর নির্ভর না করে আচার-অনুষ্ঠান, মৌখিক ঐতিহ্য এবং কারুশিল্পের কৌশলগুলোকে ডিজিটাল নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখতে প্রযুক্তির ব্যবহার।
- **সংবেদনশীল বাণিজ্যিকীকরণ:** টেকসই ঐতিহ্য পর্যটনকে উৎসাহিত করা, যা উচ্চ-মাত্রার বাণিজ্যিক শোষণের চেয়ে স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতাকে বেশি গুরুত্ব দেবে এবং নিশ্চিত করবে যে "জীবন্ত ঐতিহ্য" যেন মৌলিক থাকে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাদান:** পাঠ্যপুস্তকের আলোচনাকে এমনভাবে সংস্কার করা যাতে একটি "বহুমাত্রিক ইতিহাস" ফুটে ওঠে—যেখানে রাজকীয় অবদানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভূমিকা এবং প্রতিরোধের ইতিহাসকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- **আইনগত সমন্বয়:** ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ASI) এবং রাজ্য-স্তরের সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা যাতে তারা ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধায়কদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে পারে এবং ঐতিহ্যকে কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে না দেখে একটি "জাতীয় ট্রাস্ট" হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়।

উপসংহার

ভারতকে অবশ্যই সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকার থেকে গণতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের দিকে অগ্রসর হতে হবে, যেখানে ঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সামাজিক সাম্য এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ভারত একটি প্রাণবন্ত, বহুমাত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে যা তার নিজস্ব মৌলিকত্বে প্রতিষ্ঠিত।

Q. "In a modern democracy, the legacy of former royal families raises questions about both cultural continuity and social equality." Critically analyse. 15 Marks

Scan to attempt more questions...



সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা—ভারতে ভিড় ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা

ভূমিকা

- ভারতে বারবার পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা (recurring stampedes) ঘটে চলেছে, যা অতীতের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক ভিড় ব্যবস্থাপনার (scientific crowd management) ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্থায়ী ঘাটতিগুলোকে (persistent gaps) স্পষ্ট করে দেয়। বিহারের ধর্মীয় সমাবেশ থেকে শুরু করে ২০২৫ সালে বেঙ্গালুরুর বৃহৎ জনসভা এবং তামিলনাড়ুর গণ-অনুষ্ঠানগুলোর সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, কীভাবে অপরিপূর্ণ পরিকল্পনা (inadequate planning) এবং আকস্মিক জনস্রোত (crowd surges) বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।
- এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রতিরোধযোগ্য ট্রাজেডির (preventable tragedies) একটি ধরনকে প্রতিফলিত করে, যার পর সাধারণত কেবল প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ (reactive responses) গ্রহণ করা হয়।



ভারতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার আইনি ও সাংবিধানিক অবস্থান

১. সাংবিধানিক কাঠামো

- অনুচ্ছেদ ২১ (জীবনের অধিকার): পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা মানুষের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তার লঙ্ঘন; রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এক্ষেত্রে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা (Constitutional Liability) আকর্ষণ করতে পারে।
- রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি - DPSP (অনুচ্ছেদ ৩৮): জনসমাগমে জনকল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যদিও এটি আদালত দ্বারা সরাসরি বলবৎযোগ্য নয়।

২. সংবিধিবদ্ধ ও আইনি বিধান

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ (Disaster Management Act): পদপিষ্ট হওয়াকে 'দুর্যোগ' হিসেবে গণ্য করে এবং প্রস্তুতি, প্রশমন ও দ্রুত সাড়া প্রদানের নির্দেশ দেয়।
- ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC) / বর্তমান ন্যায় সংহিতা:
 - ধারা ৩০৪এ: অবহেলার কারণে মৃত্যু।
 - ধারা ৩০৬-৩০৮: জীবন বিপন্নকারী কাজ বা আঘাত সৃষ্টি।
- পুলিশ আইন ও স্থানীয় আইন: জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং জনশৃঙ্খলা (Public Order) বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করে।

৩. বিচারবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি

- রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা: জননিরাপত্তায় গাফিলতির জন্য আদালত রাষ্ট্রকে দায়ী রাখে।
- প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা: ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ঝুঁকি পূর্বাভাস (Risk Anticipation) এবং প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনাকে আইনি কর্তব্য হিসেবে বাধ্যতামূলক করেছে।
- ক্ষতিপূরণ ও দায়বদ্ধতা: ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আয়োজকদের ওপর দায়ভার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভিড় গতিবিদ্যা এবং পদপিষ্ট হওয়ার কারণসমূহ বোঝা

কাঠামোগত ত্রুটি, মানুষের আচরণ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা—এই সবকিছু বিষয় একত্রে মিলে ভিড় গতিবিদ্যা এবং বাস্তব সময়ের ঝুঁকি তৈরি করে।

১. ভারতে জনসমাগমের প্রকৃতি

- **আবেগপ্রবণ জনতা (Emotionally Charged Crowds):** ধর্মীয় বা তারকা-কেন্দ্রিক জমায়েতে মানুষের মধ্যে ঝুঁকির বোধ কমে যায় এবং ভিড়ের মধ্যে দ্রুত **আতঙ্ক (Panic)** ছড়িয়ে পড়ে।
- **স্বতঃস্ফূর্ত/আংশিক পরিকল্পিত জমায়েত:** উপস্থিতির সঠিক **পূর্বানুমান (Anticipation)** না থাকায় অতিরিক্ত ভিড় এবং অনিরাপদ জনঘনত্ব তৈরি হয়।
- **ডিজিটাল সচলতা (Digital Mobilisation):** সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হঠাৎ বড় জমায়েত তৈরি হয়, যা প্রশাসনের জন্য **অপ্রত্যাশিত (Unpredictability)** চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

২. ভিড় আচরণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

- **ঘনত্বের সীমা (Density Threshold):** প্রতি বর্গমিটারে ৫ জনের বেশি মানুষ হলে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। **সংকীর্ণ পথ (Narrow paths)** এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রস্থান পথ এই ভিড়কে মারাত্মক চাপে রূপান্তরিত করে।
- **মানবিক উপাদান (Human Factors):** অতিরিক্ত ভিড়ে মানুষ নিজের সচেতনতা হারিয়ে ফেলে; **গুজব (Rumours)** এবং ভুল তথ্য আতঙ্কে দিশেহারা আচরণ তৈরি করে।
- **প্রশাসনিক ব্যর্থতা:** সঠিক নজরদারি ও **স্পষ্ট যোগাযোগের (Clear communication)** অভাবে ছোটখাটো ঘটনা দ্রুত বড় দুর্ঘটনায় রূপ নেয়।

৩. পদপিষ্ট হওয়ার সমন্বিত কারণসমূহ

- **কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা:** নকশা ও পরিকল্পনার ত্রুটির কারণে জনঘনত্ব **নিরাপদ সীমার (Safe limits)** বাইরে চলে যায়।
- **প্রশাসনিক গাফিলতি:** দুর্বল সমন্বয় এবং **অপর্যাপ্ত কর্মী (Inadequate personnel)** অনিয়ন্ত্রিত ভিড় জমার সুযোগ করে দেয়।
- **মানুষের আচরণ:** বিশেষ সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা এবং ভুল তথ্যের কারণে হঠাৎ **জনস্রোত (Sudden surges)** ও অস্থিরতা তৈরি হয়।
- **তথ্যের ঘাটতি:** বাস্তব সময়ে নজরদারি (**Real-time monitoring**) এবং ভিড়ের সঠিক অনুমানের অভাবে সময়মতো হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।

ভারতে ভিড় ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব:** শাসনব্যবস্থা বা পুলিশিং-এ ভিড় ব্যবস্থাপনাকে এখনও একটি প্রথাগত বিদ্যা বা ডিসিপ্লিন হিসেবে গণ্য করা হয় না। ফলে কোনও **নির্দিষ্ট প্রোটোকল** নেই এবং প্রশিক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদলে অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে চলে।
২. **পরিকাঠামোগত ত্রুটি:** অধিকাংশ ধর্মীয় ও জনাকীর্ণ স্থানে **ধারণক্ষমতা অনুযায়ী পরিকল্পনা (Capacity Planning)** নেই। আলাদা প্রবেশ-প্রস্থান পথ না থাকা এবং ত্রুটিপূর্ণ নকশার কারণে **জরুরি উচ্ছেদ (Emergency Evacuation)** কঠিন হয়ে পড়ে।
৩. **সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব:** পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আয়োজকরা আলাদাভাবে (Silos) কাজ করে। একটি **একীভূত কমান্ড সিস্টেম (Unified Command System)** না থাকায় জরুরি অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়।
৪. **ভিআইপি সংস্কৃতি:** ভিআইপি-দের নিরাপত্তার জন্য বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করায় সাধারণ মানুষের ভিড় সামলানোর জন্য **পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব** দেখা দেয়। এটি দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

৫. **অনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সচলতা:** সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনকে না জানিয়েই দ্রুত বিশাল জনসমাগম ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। এই অপ্রত্যাশিত ভিড়ের (Unpredictability) কারণে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
৬. **প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার:** সিসিটিভি অ্যানালিটিক্স, ড্রোন বা এআই-ভিত্তিক মনিটরিং (AI-based monitoring) সিস্টেমের ব্যবহার খুব কম। পূর্বাভাস প্রযুক্তির (Predictive Technology) অভাবে হঠাৎ জনস্রোত সামলানো সম্ভব হয় না।
৭. **আচরণগত ও সাংস্কৃতিক কারণ:** প্রবল ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসের কারণে মানুষ নিয়ম ভাঙতে দ্বিধা করে না। নিয়ন্ত্রণ মানার অনীহা এবং নির্দেশ অমান্য করার প্রবণতা ভিড় নিয়ন্ত্রণকে আরও জটিল করে তোলে।

সরকারি প্রকল্প এবং নীতি উদ্যোগ

১. সেফ সিটি প্রজেক্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক):

- **শাসনব্যবস্থা:** এটি নির্ভর্যা ফাল্ডের একটি অংশ।
- **প্রযুক্তিগত একীকরণ:** ৮টি মেগা-সিটিতে জনাকীর্ণ এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার (ICCC) ব্যবহার করা হয়।

২. আপদা মিত্র স্কিম (NDMA):

- **সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা:** স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের "ফাস্ট রেসপন্ডার" হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- **গোল্ডেন আওয়ার (Golden Hour):** ভিড়ে দুর্ঘটনার সময় দ্রুত চিকিৎসা পৌঁছানো কঠিন হয়। আপদা মিত্রের প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিপিআর (CPR) এবং ট্রমা কেয়ারের মতো প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে দক্ষ।

৩. প্রসাদ (PRASHAD) ও স্বদেশ দর্শন ২.০ (পর্যটন মন্ত্রক):

- **পরিকাঠামো:** বিশেষভাবে "ধর্মীয় ভিড়" ব্যবস্থাপনার ওপর নজর দেয়।
- **মানকীকরণ:** বারাণসী বা কেরানাতের মতো তীর্থস্থানগুলোতে ট্যুরিস্ট ফেসিলিটেশন সেন্টার এবং কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Queue Management System) তৈরিতে অর্থায়ন করে।

৪. অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (রেল মন্ত্রক):

- **বাধা দূরীকরণ:** ১৩০০-র বেশি স্টেশনের পুনর্বিবাসের (Redevelopment) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **সুনির্দিষ্ট সমাধান:** ফুট ওভার ব্রিজ (FOB) প্রশস্ত করা, আলাদা প্রবেশ-প্রস্থান পথ তৈরি এবং যাত্রীদের মসৃণ বিচ্ছুরণ (Smooth Dispersal) নিশ্চিত করা হয়।

ভিড় ব্যবস্থাপনায় বিশ্বজুড়ে সেবা অনুশীলন

উন্নত দেশগুলো জনসমাগমে ঝুঁকি কমাতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শাসনব্যবস্থার সমন্বয় ঘটায়।

১. যুক্তরাজ্য (UK) – বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং সিমুলেশন

- **ভিড় মডেলিং:** যুক্তরাজ্য উন্নত ক্রাউড মডেলিং টুলস (যেমন: গ্ল্যাস্টনবারি ফেস্টিভালের জন্য) ব্যবহার করে মানুষের চলাচল এবং ভিড়ের সম্ভাব্য জায়গাগুলো আগে থেকে অনুমান করে।
- **দৃশ্যকল্প-ভিত্তিক সিমুলেশন:** জরুরি অবস্থা বা হঠাৎ জনস্রোত মোকাবিলা করার জন্য তারা নিয়মিত সিমুলেশন বা কৃত্রিম মহড়া পরিচালনা করে।

২. জাপান – পরিকাঠামোগত নকশা

- **স্থানিক পরিকল্পনা:** জাপানের মেট্রো স্টেশন এবং অনুষ্ঠানস্থলগুলো এমনভাবে তৈরি যেখানে আলাদা প্রবেশ-প্রস্থান পথ এবং স্পষ্টভাবে চিহ্নিত রাস্তা থাকে।
- **সুশৃঙ্খল প্রবাহ:** ব্যারিকেড, কিউ সিস্টেম এবং সংকেত বা সাইনেজ (Signage) ব্যবহারের মাধ্যমে ভিড়ের সময়েও দ্রুত যাতায়াত এবং জরুরি উচ্ছেদ নিশ্চিত করা হয়।

৩. সিঙ্গাপুর – রিয়েল-টাইম মনিটরিং

- **প্রযুক্তিগত নজরদারি:** উৎসবের সময় ভিড়ের ঘনত্ব পর্যবেক্ষণের জন্য সিঙ্গাপুর এআই-সমৃদ্ধ সিসিটিভি (AI-enabled CCTV) ব্যবস্থা মোতায়েন করে।
- **ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড সেন্টার:** ড্রোনের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে যখনই ভিড় নির্ধারিত সীমা (Threshold) অতিক্রম করে, তখনই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৪. সৌদি আরব – আচরণগত হস্তক্ষেপ (হজ ব্যবস্থাপনা)

- **ভিজ্যুয়াল কিউস:** হজ যাত্রার সময় তীর্থযাত্রীদের পথ দেখানোর জন্য কালার-কোডেড রুট বা রঙ দ্বারা চিহ্নিত রাস্তার মতো কৌশল ব্যবহার করা হয়।
- **নির্ধারিত সময়সূচী:** কাঠামোগত শিডিউলিং এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয় এবং আতঙ্কিত আচরণ কমানো হয়।

৫. জার্মানি – আইনি এবং নিয়ামক কাঠামো

- **কঠোর নিয়মকানুন:** জার্মানি অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা বিধি মেনে চলে, যার মধ্যে বাধ্যতামূলক বুঁকি মূল্যায়ন এবং ভিড়ের ধারণক্ষমতার সীমা নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত।
- **আইনি দায়বদ্ধতা:** অনুষ্ঠানের আয়োজকদের আইনিভাবে দায়বদ্ধ রাখা হয়, যা নিরাপত্তা বিধি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাধ্য করে।

ভবিষ্যতের পথ: একটি শক্তিশালী ভিড় ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি

১. **ভিড় বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** পুলিশ এবং প্রশাসনিক প্রশিক্ষণে ভিড় ব্যবস্থাপনাকে একটি প্রথাগত বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তথ্য-চালিত সমাধানের জন্য ডেডিকেটেড গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।
২. **সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ:** পুলিশ, আয়োজক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ভিড় মনস্তত্ত্ব (Crowd Psychology), জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং যোগাযোগের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে আতঙ্ক মোকাবিলা এবং সুশৃঙ্খল চলাচল নিশ্চিত করা যায়।
৩. **পরিকাঠামো ও অনুষ্ঠানস্থলের নকশা:** অধিক জনসমাগম হয় এমন স্থানগুলোকে বৈজ্ঞানিক ধারণক্ষমতা (Capacity Norms) অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করতে হবে। এতে একাধিক প্রবেশ-প্রস্থান পথ, ব্যারিকেড এবং উদ্ধার পথ (Evacuation Routes) থাকা বাধ্যতামূলক।
৪. **প্রযুক্তির ব্যবহার:** রিয়েল-টাইম ভিড় মূল্যায়ন এবং প্রাথমিক বুঁকি শনাক্তকরণের জন্য এআই-ভিত্তিক মনিটরিং, সিসিটিভি এবং প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স (Predictive Analytics) মোতায়েন করতে হবে।
৫. **শাসনব্যবস্থা ও সমন্বয় জোরদার করা:** পুলিশ, প্রশাসন এবং আয়োজকদের নির্দিষ্ট ভূমিকা সহ একটি ইউনিফাইড কমান্ড সিস্টেম (Unified Command System) প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে দ্রুত এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
৬. **নিয়ামক কাঠামো ও জবাবদিহিতা:** ধারণক্ষমতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে কঠোরভাবে অনুমতি প্রদান করতে হবে। অতিরিক্ত ভিড়, নিরাপত্তা লঙ্ঘন এবং অননুমোদিত প্রবেশের জন্য জরিমানা ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৭. **জনসচেতনতা ও সম্পদ অপ্টিমাইজেশন:** সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে নিরাপদ ভিড় আচরণ উৎসাহিত করা, ভিড় পূর্বাভাসের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

ভারতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন কোনও ব্যর্থতা নয়, বরং এটি পদ্ধতিগত ঘাটতিকে (Systemic Gaps) প্রতিফলিত করে। এটি ভিড় শাসনব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়। একটি ভবিষ্যৎ-মুখী পদ্ধতির জন্য অবশ্যই ভিড় বিজ্ঞান (Crowd Science), স্মার্ট প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়কে একটি সক্রিয় কাঠামোর (Proactive Framework) মধ্যে একীভূত করতে হবে। তথ্য, আচরণগত অন্তর্দৃষ্টি এবং স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে জনসমাগমকে নিরাপদ ও সুপরিচালিত ইভেন্টে রূপান্তর করা সম্ভব। পরিশেষে, ভিড় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি মানুষের মর্যাদা ও জীবনের প্রতি রাষ্ট্রের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

Q. Recurring stampedes in India highlight gaps in governance, institutional capacity, and regulatory enforcement in managing large gatherings. Examine the constitutional and administrative challenges in crowd management, and suggest governance reforms to ensure accountability, coordination, and public safety. (150 Words)

2.1.2. ভারতের দুর্নীতি বিরোধী কাঠামো

প্রেক্ষিত

দুর্নীতিকে প্রায়ই একটি "বহু-মাথা বিশিষ্ট দানব" হিসেবে বর্ণনা করা হয় যা আইনের শাসনকে দুর্বল করে এবং জনগণের বিশ্বাস নষ্ট করে। জন বিশ্বাস (সংশোধন) বিল, ২০২৬ এবং ডিজিটাল সততার (Digital Integrity) ওপর গুরুত্বারোপের মতো সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের দুর্নীতি বিরোধী প্রেক্ষাপট এখন কেবল "পুলিশি নজরদারি" থেকে সরে এসে "পদ্ধতিগত প্রতিরোধ" (Systemic Prevention)-এর দিকে মোড় নিয়েছে।



ভারতের দুর্নীতি বিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ভারতের এই তিন-স্তরের কাঠামোটি তত্ত্বাবধান (Oversight), তদন্ত (Investigation) এবং অভিযোগ দায়ের (Prosecution)—এই তিনটি স্তরের সমন্বয়ে কাজ করে:

• স্তর ১: তত্ত্বাবধান (ওম্বুডসম্যান - লোকপাল)

- আইনি ভিত্তি: লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন, ২০১৩।
- ভূমিকা: উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি এবং গ্রুপ A-D অফিসারদের) বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা নেওয়ার জন্য এটি সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে কাজ করে।
- বর্তমান অবস্থা: ২০২৬ সালের মার্চের একটি সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, সিবিআই (CBI)-এর ওপর নির্ভরতা কমাতে লোকপাল এখন তার নিজস্ব তদন্ত ও প্রসিকিউশন উইং (Inquiry and Prosecution Wings) পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার পথে রয়েছে।

• স্তর ২: সতর্কতা (পরামর্শদাতা - CVC)

- আইনি ভিত্তি: সিভিসি (CVC) আইন, ২০০৩ (সংবিধিবদ্ধ)।
- ভূমিকা: সরকারের "বিবেকের রক্ষক" হিসেবে পরিচিত। এটি কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলোর (PSUs) সতর্কতা প্রশাসন তদারকি করে।
- CBI-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ: দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন (PCA), ১৯৮৮-এর অধীনে তদন্তের ক্ষেত্রে এটি সিবিআই-এর ওপর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

• স্তর ৩: তদন্ত (প্রয়োগকারী সংস্থা - CBI ও ED)

- CBI (DSPE আইন, ১৯৪৬): এটি দুর্নীতির অপরাধ তদন্তের প্রধান সংস্থা।
- এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED): এটি PMLA, ২০০২ আইনের অধীনে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের (Proceeds of Corruption) ওপর নজর দেয়।
- সম্পদ পুনরুদ্ধার (Asset Restitution): বর্তমানে বাজেয়াপ্ত করা সম্পদ বা টাকা ভুক্তভোগী বা রাষ্ট্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০২৬ সালের শুরুর দিকে ইডি (ED) প্রায় ৫.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ পুনরুদ্ধারের রিপোর্ট দিয়েছে।

ভারতের দুর্নীতি বিরোধী আইনি বিধানসমূহ

১. দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন (PCA), ১৯৮৮

- **মূল আদেশ:** এটি "অযাচিত সুবিধা" (Undue Advantage)-কে সংজ্ঞায়িত করে এবং ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া উভয়কেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।
- **ধারা ১৭এ (সুরক্ষা কবচ):** কোনো সরকারি কর্মচারীর দাপ্তরিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে তদন্ত শুরু করার আগে সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হয়।
- **ধারা ৭ (সরবরাহ পক্ষ):** ২০১৮ সাল থেকে ঘুষ দেওয়াকেও একটি স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা বেসরকারি ক্ষেত্রকেও দায়ী করে।
- **বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান:** যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ঘুষ দেয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠানকেও দায়ী করা হবে, যদি না তারা প্রমাণ করতে পারে যে এটি প্রতিরোধের জন্য তাদের "পর্যাপ্ত ব্যবস্থা" ছিল।

২. জন বিশ্বাস (সংশোধন) আইন, ২০২৬

- **অপরাধমুক্ত করার পদক্ষেপ:** ২০২৬ সালের এপ্রিলে এই আইনের মাধ্যমে ৭৯টি আইনের অধীনে থাকা ছোটখাটো পদ্ধতিগত ত্রুটিকে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
- **কৌশলগত উদ্দেশ্য:** এটি "প্রযুক্তিগত নিয়ম লঙ্ঘন" এবং "অপরাধমূলক মানসিকতা"-র মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। ছোট ভুলের জন্য জেল খাটার ভয় দূর করে এটি নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের চাঁদাবাজির সুযোগ বন্ধ করে দেয়।
- **সুবিধা:** এর ফলে সিবিআই এবং লোকপাল এখন ছোটখাটো বিষয়ের বদলে বড় ধরনের পদ্ধতিগত দুর্নীতির দিকে বেশি নজর দিতে পারবে।

৩. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA), ২০০২

- **সম্পদ বাজেয়াপ্ত:** দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা এটি ইডি-কে (ED) দেয়।
- **সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া:** ২০২৬ সালের একটি বড় নীতিগত পরিবর্তন হলো, বাজেয়াপ্ত অর্থ কেবল সরকারি হেফাজতে না রেখে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা প্রকৃত ভুক্তভোগীদের ফিরিয়ে দেওয়া।
- **প্রমাণের দায়ভার:** এই আইনের অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করতে হয় যে তার সম্পত্তি অপরাধলব্ধ নয়।

৪. বেনামি লেনদেন (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৮

- **লক্ষ্য:** অন্যের নামে সম্পত্তি কেনা (বেনামি লেনদেন) নিষিদ্ধ করে।
- **ডিজিটাল সংযোগ:** বর্তমানে এটি ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড এবং আধার-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে যাতে সন্দেহজনক সম্পত্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করা যায়।

৫. ইইসেলব্রোয়ার সুরক্ষা আইন, ২০১৪

- **পরিচয় গোপন রাখা:** দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের তথ্য ফাঁসকারীদের পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ জানানোর সুযোগ দেয়।
- **বর্তমান চ্যালেঞ্জ:** এটি কার্যকর হলেও তথ্য ফাঁসকারীদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো "শারীরিক সুরক্ষা" ইউনিটের অভাব রয়েছে।

ভারতের দুর্নীতি বিরোধী কাঠামোর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. আইনি ও পদ্ধতিগত বাধা

- **"অনুমোদনের ঢাল" (ধারা ১৭এ):** তদন্তের আগে সরকারি অনুমতির বাধ্যবাধকতা তদন্তে দেরি ঘটায় এবং প্রমাণ নষ্ট হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

- **নিম্ন দণ্ডদেশের হার:** গ্রেপ্তার হলেও বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতির। জটিল আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে "অপরাধমূলক উদ্দেশ্য" প্রমাণ করা বেশ কঠিন।
- **অপরাধমুক্তকরণের দ্বিধা:** ২০২৬-এর জন বিশ্বাস আইন ছোট ভুলকে অপরাধমুক্ত করলেও, ভয় রয়েছে যে বড় অপরাধীরাও এর সুযোগ নিয়ে পার পেয়ে যেতে পারে।

২. কাঠামোগত ও কেন্দ্রীয়-রাজ্য বিরোধ

- **সাধারণ সম্মতির (General Consent) সমস্যা:** অনেক রাজ্য সিবিআই-কে দেওয়া সাধারণ অনুমতি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে প্রতিবার তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হয়, যা তদন্তে বাধা দেয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক আধিক্য:** সিবিআই, ইডি, সিভিসি এবং লোকপাল—একই বিষয়ে একাধিক সংস্থার তদন্ত অনেক সময় "এক্সিয়ায়রগত সংঘাত" তৈরি করে।
- **খাঁচায় বন্দি তোতা:** তদন্তকারী সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা এবং স্বায়ত্তশাসন নিয়ে বিতর্ক এখনো রয়ে গেছে।

৩. কার্যকরী সীমাবদ্ধতা

- **জনবল সংকট:** সিভিসি এবং রাজ্যের লোকায়ুক্তগুলোতে অনেক পদ খালি থাকায় প্রচুর মামলা বুকে থাকে।
- **তথ্য ফাঁসকারীর ঝুঁকি:** ২০১৪-এর আইনে শক্তিশালী সাক্ষী সুরক্ষা প্রোগ্রাম না থাকায় প্রতিশোধের ভয়ে ভেতরকার কেউ মুখ খুলতে চায় না।

৪. নতুন উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ

- **সাইবার-দুর্নীতি: ডিপফেক (Deepfakes)** এবং উন্নত এনক্রিপশন প্রযুক্তির কারণে দুর্নীতির প্রমাণ জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ছে।
- **পরোক্ষ সুবিধা:** সরাসরি ঘুষের বদলে আত্মীয়দের চাকরি দেওয়া বা বিদেশে বিনিয়োগের মতো পরোক্ষ সুবিধা ট্র্যাকিং করা বর্তমান সংস্থাগুলোর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

১. প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার

- **লোকপালের শাখাগুলোর পূর্ণ কার্যকারিতা:** ২০২৬ সালের শুরুর দিকের রিপোর্ট অনুযায়ী, লোকপালকে জরুরি ভিত্তিতে সিবিআই (CBI)-এর ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। এর জন্য নিজস্ব তদন্ত ও প্রসিকিউশন উইং-এ পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।
- **সাংবিধানিক মর্যাদা:** বিশেষজ্ঞরা লোকপাল এবং সিভিসি (CVC)-কে নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এটি সংস্থাগুলোকে নির্বাহী হস্তক্ষেপ এবং রাজ্যগুলোর সাথে 'সাধারণ সম্মতি' (General Consent) সংক্রান্ত বিবাদ থেকে রক্ষা করবে।
- **বিশেষায়িত দুর্নীতি দমন আদালত:** প্রধান শহরগুলোতে (২০২৬-এর চাহিদা অনুযায়ী দিল্লি থেকে শুরু করে) ডেডিকেটেড বা উৎসর্গীকৃত আদালত স্থাপন করতে হবে। এতে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের (PCA) অধীনে থাকা মামলাগুলো এক বছরের আইনি সময়সীমার মধ্যে শেষ করা নিশ্চিত হবে।

২. প্রযুক্তির ব্যবহার

- **ঝুঁকি-ভিত্তিক এআই (AI) নজরদারি:** প্রথাগত নিয়মের বদলে ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সরকারি কেনাকাটায় জালিয়াতি হওয়ার আগেই মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে 'রেড ফ্ল্যাগ' বা সতর্কসংকেত (যেমন: দরপত্র কারচুপি বা কৃত্রিমভাবে চুক্তির মূল্য বাড়ানো) শনাক্ত করতে হবে।

- **সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থা:** ডিজিটাল এবং ক্রিপ্টো-সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে হওয়া দুর্নীতির 'মানি ট্রেইল' বা অর্থের উৎস খুঁজে বের করতে সিভিসি (CVC), ইডি (ED) এবং আরবিআই (RBI)-এর মধ্যে একটি নিরাপদ ও রিয়েল-টাইম তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

৩. আইন ও নীতিগত সংশোধন

- **ধারা ১৭এ (17A) পর্যালোচনা:** 'সুরক্ষা কবচ' বা অনুমোদনের নিয়মে 'ডিমড স্যানশন' (Deemed Sanction) বা 'ধরে নেওয়া অনুমোদন' ক্লজ যুক্ত করতে হবে। যদি সরকার ৬০ দিনের মধ্যে কোনো উত্তর না দেয়, তবে তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।
- **ব্যাপক সাক্ষী সুরক্ষা:** হাইসেলব্রোয়ার বা তথ্য ফাঁসকারী সুরক্ষা আইনকে আরও উন্নত করতে হবে। এর অধীনে একটি পৃথক সাক্ষী সুরক্ষা ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন, যা পদ্ধতিগত দুর্নীতি ফাঁস করা ব্যক্তিদের শারীরিক ও পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
- **সম্পদ পুনরুদ্ধার:** বাজেয়াপ্ত করা সম্পদ ভুক্তভোগী বা ব্যাংকগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইডি (ED)-এর মডেলটিকে মানসম্মত করা। এতে নিশ্চিত করা যাবে যে, 'অপরাধলব্ধ আয়' বা টাকা দিয়েই দুর্নীতির কারণে হওয়া অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণ করা হচ্ছে।

৪. বৈশ্বিক সহযোগিতা

- **Globe নেটওয়ার্কে সক্রিয় অংশগ্রহণ:** ২০২৬ সালে Globe নেটওয়ার্ক স্টিয়ারিং কমিটিতে ভারতের ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য আদান-প্রদান জোরদার করা। এতে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া অর্থনৈতিক অপরাধী এবং নামসর্বস্ব (Shell) কোম্পানিগুলোকে ট্র্যাক করা সহজ হবে।

উপসংহার

২০২৬ সালে কার্যকর দুর্নীতি দমন ব্যবস্থার জন্য কেবল শাস্তি নয়, বরং পদ্ধতিগত প্রতিরোধের দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। একটি স্থিতিস্থাপক এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এআই (AI)-চালিত স্বচ্ছতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন এবং জন বিশ্বাস আইনের মাধ্যমে করা সংস্কারগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।

Q. Discuss the structure and functioning of anti-corruption bodies in India. Highlight the key challenges affecting their effectiveness and suggest reforms. (150 Words)

2.1.3. কেরালার উন্নয়নের দশক: ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির একটি মডেল

ভূমিকা:

- গত দশ বছরে (২০১৬-২০২৬), কেরালা ভারতের অন্যতম গতিশীল এবং **অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive)** রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত কঠোর **আর্থিক সীমাবদ্ধতা (Financial restrictions)** সত্ত্বেও **মানব উন্নয়ন (Human development)**, **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic growth)** এবং **সামাজিক ন্যায়বিচারের (Social justice)** ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- কেরালার এই উন্নয়নযাত্রা বর্তমানে সমগ্র ভারতের জন্য **টেকসই (Sustainable)** এবং **জনকেন্দ্রিক উন্নয়নের (People-centred development)** একটি রূপরেখা বা **ব্লুপ্রিন্ট (Blueprint)** হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।



অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: পরিকল্পনা এবং আর্থিক উদ্ভাবন

ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যে **পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission)** বিলুপ্ত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় ভাটা পড়লেও, কেরালা তার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে বজায় রেখেছে এবং আরও শক্তিশালী করেছে।

- **বর্ধিত মূলধনী ব্যয় (Increased Capital Expenditure):** ২০১৭ সাল থেকে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের ওপর ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জাতীয় স্তরে মূলধনী ব্যয় হ্রাসের প্রবণতাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।
- **KIIFB মডেল:** কেরালা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ড (KIIFB)-এর মাধ্যমে ১২০০-এরও বেশি পরিকাঠামো প্রকল্পকে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই **উদ্ভাবনী আর্থিক মাধ্যমটি (Innovative financial vehicle)** রাজ্যকে প্রচলিত বাজেট সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে বড় মাপের প্রকল্পে অর্থায়নের সুযোগ করে দিয়েছে।
- **ক্ষমতায়িত স্থানীয় সরকার (Empowered Local Governments):** স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে আয় বৃদ্ধির অনুঘটক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলি কেবল প্রশাসনিক একক নয়, বরং **তৃণমূল স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের (Grassroots economic development)** কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
- **কেরালা ব্যাঙ্ক (Kerala Bank):** জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে একীভূত করে কেরালা ব্যাঙ্ক গঠনের মাধ্যমে আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং গ্রামীণ ঋণ (Rural credit) ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

শিক্ষা: সার্বজনীন, ডিজিটাল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক

স্কুল এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা হয়েছে:

ক. স্কুল শিক্ষা

- প্রারম্ভিক এবং মাধ্যমিক স্তরে **শূন্য শতাংশ স্কুলছুট (Zero per cent dropout)** হার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সার্বজনীন ও বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত হয়েছে।
- তফসিলি জাতি ও উপজাতি (SC/ST) শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুলছুটের হার ভারতের মধ্যে সর্বনিম্ন।
- কেরালা স্কুল শিক্ষায় ভারতের প্রথম **সম্পূর্ণ ডিজিটাল রাজ্যে (Fully digital state)** পরিণত হয়েছে।
- স্কুলের পরিকাঠামো, শিক্ষক উন্নয়ন, পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ এবং **আইটি-নির্ভর শিক্ষায় (IT-enabled learning)** বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

খ. উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা

- শাসন ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে **সংস্কার (Reforms)** আনা হয়েছে।
- **শক্তিশালী সরকারি বিনিয়োগ (Public investment)** স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির জাতীয় র‍্যাঙ্কিং বা অবস্থানের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে।

এখানে আপনার দেওয়া অনুচ্ছেদের বাকি অংশের যথাযথ এবং সাবলীল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো **বোল্ড (Bold)** করা হয়েছে:

স্বাস্থ্য: একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড স্থাপন

কেরালার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা তার পারফরম্যান্সের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত:

- **শিশু মৃত্যুহার (Infant mortality rate):** প্রতি ১,০০০ জন জীবিত জন্মে মাত্র ৫ জন—যা আমেরিকার তুলনায় উন্নত।
- **ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবিমা:** 'কারুণ্য আরোগ্য সুরক্ষা পদ্ধতি'-র মাধ্যমে ৪২ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা সুবিধা দেওয়া হয়েছে।
- **আর্দ্রম মিশন (Aardram Mission):** এর মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আমূল উন্নতি ঘটানো হয়েছে।
- **পরিষেবার বিস্তার:** মানসিক স্বাস্থ্য, অসংক্রামক ব্যাধি এবং **ই-হেলথ (e-health)** পরিষেবাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **মহামারি মোকাবিলা:** নিপা ভাইরাস এবং **কোভিড-১৯ (COVID-19)** মোকাবিলায় কেরালার সাফল্য তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার **স্থিতিস্থাপকতা (Resilience)** প্রমাণ করেছে।

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ

"কাউকে পিছিয়ে রাখা নয়"—এই লক্ষ্য নিয়ে কেরালা কাজ করেছে:

- **চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ:** নভেম্বর ২০২৫ সালে কেরালা আনুষ্ঠানিকভাবে **চরম দারিদ্র্যমুক্ত (Extreme poverty ended)** রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।
- **লাইফ মিশন (LIFE Mission):** ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ৫ লক্ষেরও বেশি আধুনিক বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।
- **লিঙ্গ বাজেট (Gender Budgeting):** বার্ষিক পরিকল্পনার এক-পঞ্চমাংশের বেশি নারী ক্ষমতায়নে বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ:** ২০২৬-২৭ বাজেটে ১৯% অর্থ **প্রবীণদের জন্য (Elderly Budget)** বরাদ্দ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ গত দশকে দ্বিগুণ করা হয়েছে।
- **সার্বজনীন নিরাপত্তা জাল:** জনসাধারণ বন্টন ব্যবস্থা (PDS) ৯৫ লক্ষ পরিবারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যা খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

শিল্প ও উদ্ভাবন: ভুল ধারণার অবসান

কেরালা শিল্প-বান্ধব নয়—এই পুরনো ধারণা এখন অতীত:

- **MSME এবং আধুনিক শিল্পের বিকাশে গতি এসেছে এবং** ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রগুলোকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।
- **গ্লোবাল স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম রিপোর্ট (২০২৫):** কেরালার স্টার্টআপ ভ্যালু বা ইকোসিস্টেমের মূল্য ১৪৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **ইন্টারনেট সংযোগ:** ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে K-FON প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

পরিকাঠামো: সংযোগ এবং পরিচ্ছন্ন শক্তি

- **পরিবহন:** 'হিল হাইওয়ে' এবং জাতীয় সড়কের উন্নয়নের ফলে যাতায়াতের সময় কমেছে। ভারতের প্রথম **কোচি ওয়াটার মেট্রো** এবং ২০২৪ সালে **ভিভিনজাম আন্তর্জাতিক গভীর সমুদ্র বন্দর** চালু হওয়া একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।
- **বিদ্যুৎ:** ২০১৭ সালে ১০০% বিদ্যুতায়ন অর্জিত হয়েছে। **সৌরবিদ্যুতের** ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যান্ত্রিক অপচয় (T&C losses) কমানো হয়েছে।

শ্রম অধিকার, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা

- **শ্রমিক অধিকার:** পরিযায়ী শ্রমিকসহ সব শ্রমিকের জন্য আইন আরও কঠোর ও শক্তিশালী করা হয়েছে।
- **সংস্কৃতি:** কোচি-মুজিরিস বিয়োনাল এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মতো আয়োজনগুলোর বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটেছে।
- **খেলাধুলা:** গত ১০ বছরে খেলাধুলায় বরাদ্দ ১৬০% বেড়েছে। ৩,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য ভারতের প্রথম স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে।

কেরালার উন্নয়ন মডেলের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **রাজস্ব চাপ এবং জনকল্যাণমূলক স্থিতিশীলতা (Fiscal Stress & Welfare Sustainability):** ঋণের ওপর উচ্চ নির্ভরতা এবং ব্যাপক জনকল্যাণমূলক ব্যয় দীর্ঘমেয়াদী **রাজস্ব স্থিতিশীলতা** নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় এবং ভবিষ্যতের মূলধনী বিনিয়োগকে সীমিত করে।
২. **কাঠামোগত অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা (Structural Constraints):** প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের (Remittances) ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল শিল্প ভিত্তি অর্থনীতিকে বাহ্যিক ধাক্কার মুখে সংবেদনশীল করে তোলে।
৩. **কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজারের সমস্যা:** উচ্চ শিক্ষিত বেকারত্ব, **দক্ষতার অমিল (Skill mismatch)** এবং তরুণ প্রজন্মের ভিনরাজ্যে বা বিদেশে পাড়ি দেওয়া টেকসই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।
৪. **জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও সামাজিক চাপ:** বয়স্ক জনসংখ্যার বৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, যা সরকারি কোষাগারের ওপর বোঝা বাড়ানো।

৫. **পরিবেশগত ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ:** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, দ্রুত নগরায়ন এবং কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক টানা পোড়েন পরিকাঠামো পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণের স্বায়ত্তশাসনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

ভবিষ্যতের পথ: ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল হিসেবে কেরালা

কেরালার এই উন্নয়নের দশক সমগ্র ভারতের জন্য একটি **অনুকরণযোগ্য কাঠামো (Replicable framework)** প্রদান করে। জাতীয় স্তরে প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- **মানব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার:** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আগে এবং সাথে সাথে মানব উন্নয়ন প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বিনিয়োগ একটি উৎপাদনশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করে।
- **বিকেন্দ্রীভূত শাসন (Decentralised Governance):** স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে আয় বৃদ্ধি ও পরিকল্পনার চালিকাশক্তি হিসেবে ক্ষমতায়ন করা প্রয়োজন।
- **সমবায় প্রতিষ্ঠান:** তৃণমূল স্তরে শিল্প ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সমবায় মডেল কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- **লিঙ্গ বাজেট (Gender Budgeting):** 'কুড়ুমশ্রী'-র মতো নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচিগুলোকে আদর্শ পরিকল্পনা সরঞ্জাম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।
- **ডিজিটাল পরিকাঠামো:** ইন্টারনেট সংযোগকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে একে ব্যক্তিগত পণ্যের বদলে **জনসাধারণের সম্পদ (Public good)** হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- **যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব সংস্কার:** রাজ্যগুলিকে আরও বেশি **অসংলগ্ন আর্থিক অনুদান (Untied fiscal transfers)** প্রদান, ঋণের উর্ধ্বসীমা শিথিল করা এবং সেস (Cess)-এর মাধ্যমে রাজ্যের করের অংশ হ্রাস করা বন্ধ করা জরুরি।
- **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা:** কেরালার বিকেন্দ্রীভূত ও কার্যকর সাড়াদান ব্যবস্থার আদলে জাতীয় স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

উপসংহার

গত এক দশকে কেরালা এটি প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, শক্তিশালী স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive growth)** অর্জন করা সম্ভব। কেরালার এই মডেল অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে **অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা (Participatory governance)** এবং **মানব উন্নয়নের** এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেরালার এই অভিজ্ঞতা একটি **মানদণ্ড (Benchmark)** হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

Q. Examine the challenges posed by India's fiscal federal structure in enabling states to pursue independent development strategies. Illustrate your answer with suitable examples. 15 Marks

2.1.4. ভারতের উচ্চশিক্ষা: সংখ্যাগত বিস্তার এবং উৎকর্ষের মধ্যে ব্যবধান নিরসন

ভূমিকা

- গত সাত দশকে ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি **অদ্বৈতপূর্ব বিস্তার (Unprecedented Expansion)** লক্ষ্য করা গেছে — ১৯৫০ সালে যেখানে মাত্র ১,৬০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, ২০২২ সালের মধ্যে তা বেড়ে ৬৯,০০০-এর বেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়েছে।
- যাইহোক, 'স্টেট অফ ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া ২০২৬' (State of Working India 2026) রিপোর্ট একটি **সংকটজনক বৈপরীত্য (Critical Paradox)** প্রকাশ করেছে: যদিও প্রাতিষ্ঠানিক বৃদ্ধি চিত্তাকর্ষক, তবে তা পর্যাপ্ত শিক্ষাদান ক্ষমতা (Teaching Capacity), ন্যায়সঙ্গত সুযোগ (Equitable Access) বা শিক্ষার গুণমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।



- এখন সময় এসেছে মনোযোগ কেবল সংখ্যাগত বিস্তার থেকে সরিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সাম্য (Equity) এবং গুণমান (Quality) নিশ্চিত করার দিকে জরুরিভাবে ঘুরিয়ে দেওয়ার।

স্টেট অফ ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া ২০২৬ রিপোর্টের প্রধান প্রবণতাগুলি

১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধি:

- ১৯৫০: ভারতে মাত্র ১,৬০০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যার অধিকাংশই ছিল সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত।
- ২০২২: সংখ্যাটি বেড়ে ৬৯,০০০ অতিক্রম করেছে — যা সাত দশকে ৪৩ গুণ বৃদ্ধি।
- সাম্প্রতিক এই বিস্তারের সিংহভাগ বেসরকারি সংস্থা দ্বারা চালিত, যা উচ্চশিক্ষার চরিত্রকে সরকারি থেকে বাণিজ্যিক দিকে রূপান্তরিত করেছে।

২. কলেজ ঘনত্ব (College Density):

- প্রতি লক্ষ যুবক পিছু কলেজের সংখ্যা ২০১০ সালের ২৯ থেকে বেড়ে ২০২১ সালে ৪৫ হয়েছে।
- আঞ্চলিক বৈষম্য: জাতীয় স্তরে বৃদ্ধি সত্ত্বেও, উত্তর ও পূর্ব ভারতের অনেক জেলায় এই সংখ্যা ১৮-এরও কম, যা জাতীয় গড়ের অর্ধেকেরও নিচে।
- এই অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে ভারতের বিশাল যুব জনসংখ্যা বাস করে, যা এই বৈষম্যকে আরও উদ্বেগজনক করে তোলে।

নথিকরণ এবং সামাজিক সাম্যের প্রবণতা

১. গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER):

- ১৮-২৩ বছর বয়সীদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (GER) ২০১১ সালের ১৬% থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ২৮% হয়েছে।
- ভারতের এই হার বর্তমানে সমপর্যায়ের আয়ের দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের হার প্রায় সমান হয়ে এসেছে, যা লিঙ্গ সাম্যের উন্নতি নির্দেশ করে।

২. সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ:

- তফসিলি জাতি (SC): নথিকরণের হার ১১% (২০১১) থেকে বেড়ে ২৬% (২০২২) হয়েছে।
- তফসিলি জনজাতি (ST): এই হার ৮% (২০১১) থেকে বেড়ে ২১% (২০২২) হয়েছে।

শিক্ষাদান ক্ষমতার সংকট

১. ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত:

- নিয়ামক সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী আদর্শ অনুপাত হওয়া উচিত ১৫-২৫:১।
- ২০১০: গড় অনুপাত ছিল ২৪:১, যা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে ছিল।
- ২০২১: এই অনুপাত এখনও ৩২:১ এর মতো আশঙ্কাজনক স্তরে রয়েছে।
- শিক্ষক নিয়োগের গতি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি বা ছাত্র নথিকরণের হারের সাথে তাল মেলাতে পারেনি।

ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমানে ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বেশ কিছু পদ্ধতিগত বাধার (Systemic Hurdles) সম্মুখীন হচ্ছে, যা সাম্য (Equity) এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বাধা দিচ্ছে:

- কলেজ বন্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য: ২০২১ সালে জাতীয় স্তরে কলেজ ঘনত্ব বেড়ে প্রতি লক্ষ যুবক পিছু ৪৫টি হলেও, উত্তর ও পূর্ব ভারতের জেলাগুলিতে এই সংখ্যা ১৮-এরও কম। এই অসম ভৌগোলিক বিস্তারের কারণে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী হয় পরিযান (Migration) করতে বাধ্য হচ্ছে অথবা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে।

- **যোগ্য শিক্ষকের তীব্র সংকট:** ২০২১ সালে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৩২:১, যা ইউজিসি (UGC) নির্ধারিত ১৫-২৫:১ সীমার চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া চুক্তিভিত্তিক ও অ্যাড-হক (Ad-hoc) শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা শিক্ষার গুণমান ও জবাবদিহিতাকে নষ্ট করছে।
- **পেশাদার শিক্ষায় আর্থিক বর্জন:** উচ্চ ব্যয় একটি অদৃশ্য বাধা হিসেবে কাজ করছে। চিকিৎসা (৯৭,৪০০ টাকা) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং (৭২,৬০০ টাকা) কোর্সের বার্ষিক ফি দরিদ্র পরিবারের বার্ষিক মাথাপিছু খরচের চেয়েও বেশি। ফলে পেশাদার শিক্ষা কেবল ধনীদেব দখলে থেকে যাচ্ছে।
- **অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারীকরণ:** সাম্প্রতিক বিস্তারের সিংহভাগই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই গুণমান নিশ্চিতকরণ (Quality Assurance) বা ফির স্বচ্ছতা নেই। অতিরিক্ত মুনাফার আকাঙ্ক্ষা গবেষণাগার ও লাইব্রেরির মতো পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ কমিয়ে দিচ্ছে।
- **আয়ের ভিত্তিতে বিভাগ নির্বাচন:** শিক্ষার্থীর মেধার বদলে পারিবারিক আয় এখন ঠিক করে দিচ্ছে সে কী পড়বে। সচ্ছল শিক্ষার্থীরা লাভজনক পেশাদার কোর্স বেছে নিচ্ছে, আর দরিদ্র শিক্ষার্থীরা কম খরচের মানবিক (Humanities) বিভাগে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে।
- **মানদণ্ডহীন বিস্তার:** দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে গুণমানের সাথে আপস করা হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান এখনও ন্যাক (NAAC) দ্বারা স্বীকৃত নয়। বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি (Mandatory Accreditation) না থাকায় পরিকাঠামো বা পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ যাচাই করার কোনও উপায় নেই।
- **ডিজিটাল ক্ষমতা ও কর্মসংস্থানের অভাব:** নথিকরণ বাড়লেও প্রকৃত শিক্ষা (Actual Learning) বাড়ছে না। কারিগরি দক্ষতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার (Critical Thinking) অভাবে ডিজিটাল থাকলেও স্নাতকধারীরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংযোগ্য (Employable) হয়ে উঠছে না।

বর্তমান বাধা কাটাতে সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020:** ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বা GER ৫০%-এ নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য বহুমুখী শিক্ষা (Multidisciplinary) এবং অ্যাকাডেমিক ব্যাক অফ ক্রেডিট (ABC) চালু করা হয়েছে। এটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপরও গুরুত্ব দেয়।
- **পিএম উষা (PM USHA):** অনুদান ও পরিকাঠামো সহায়তার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত সংস্কারের জন্য এটি চালু করা হয়েছে।
- **বৃত্তি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রকল্প:**
 - **সেন্ট্রাল সেক্টর স্কলারশিপ:** মেধাবী ও স্বল্প আয়ের শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে।
 - **ন্যাশনাল মিনস-কাম-মেরিট স্কলারশিপ:** অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের স্কুল থেকে কলেজে উত্তরণে সাহায্য করে।
 - **ডঃ আম্বেদকর পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ:** তফশিলি জাতি ও জনজাতির শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার খরচ বহন করে।
- **SWAYAM ও ডিজিটাল শিক্ষা:** এটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিনামূল্যে অনলাইন কোর্স প্রদান করে। এছাড়া DIKSHA ও NDEAR পরিকাঠামো ডিজিটাল ব্যবধান ঘোচাতে কাজ করছে।
- **HEFA (Higher Education Financing Agency):** উচ্চমানের পরিকাঠামো তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন: ভারতের জন্য শিক্ষা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সফল মডেলগুলো ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে সহায়ক হতে পারে:

- **ফিনল্যান্ড — সংখ্যার চেয়ে গুণমান:** ফিনল্যান্ডে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষিত এবং স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিশ্চিত করা হয়। সেখানে কঠোরভাবে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখা হয়।

- **দক্ষিণ কোরিয়া — লক্ষ্যভিত্তিক আর্থিক সহায়তা:** এখানে আয়-নির্ভর ঋণ ব্যবস্থা (Income-contingent loan) চালু রয়েছে, যেখানে ঋণের কিস্তি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের আয়ের ওপর নির্ভর করে। এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি-র ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে।
- **জার্মানি — অবৈতনিক উচ্চশিক্ষা:** জার্মানি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করে উচ্চশিক্ষাকে একটি সর্বজনীন অধিকারে পরিণত করেছে। ভারত তার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই মডেল আংশিকভাবে গ্রহণ করতে পারে।
- **ব্রাজিল — ProUni প্রকল্প:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ ও আংশিক বৃত্তি নিশ্চিত করা হয়, যা পেশাদার কোর্সে সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।
- **OECD দেশসমূহ — শিক্ষক উন্নয়ন কাঠামো:** এই দেশগুলোতে শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (CPD) কর্মসূচি থাকে। ভারতও তার বিদ্যমান শিক্ষকদের জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি (Upskilling) নীতি গ্রহণ করতে পারে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা: সংখ্যাগত বিস্তার থেকে সাম্যের দিকে

উচ্চশিক্ষার প্রবৃদ্ধিকে **অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উচ্চমানের** করতে নিচের পদক্ষেপগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে:

১. আঞ্চলিক বৈষম্য ও ভৌগোলিক ব্যবধান দূর করা

- উত্তর ও পূর্ব ভারতের অনুন্নত জেলাগুলোতে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা বিদ্যমানগুলোর উন্নতির জন্য **লক্ষ্যভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ (Targeted public investment)** প্রয়োজন।
- তথ্য-নির্ভর নীতি নির্ধারণের জন্য প্রতি বছর শিক্ষাগত পরিকাঠামোর **জেলা-ভিত্তিক ম্যাপিং (District-level mapping)** করা উচিত।

২. শিক্ষক সক্ষমতা ও শিক্ষাদান মান পুনরুজ্জীবিত করা

- শিক্ষক সংকট মেটাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের (Permanent faculty recruitment) জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহিত করতে একটি **জাতীয় শিক্ষক উন্নয়ন মিশন (National Faculty Development Mission)** গঠন করা প্রয়োজন।
- একাডেমিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে **চুক্তিভিত্তিক ও অ্যাড-হক শিক্ষক নির্ভরতা** কমিয়ে নিয়মিতকরণের নীতি নিতে হবে।

৩. আর্থিক ও ব্যয় সংক্রান্ত বাধা দূর করা

- পেশাদার ও কারিগরি কোর্সে SC, ST, OBC এবং EWS শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির আওতা বৃদ্ধি করা সামাজিক উত্তরণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
- পরিবারের ওপর আর্থিক চাপ কমাতে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো **আয়-নির্ভর ঋণ ব্যবস্থা** ভারতে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে শুরু করা যেতে পারে।
- সাশ্রয়ী শিক্ষা নিশ্চিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের **ফি কাঠামো নিয়ন্ত্রণ (Regulation of fee structures)** কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৪. নিয়ন্ত্রণমূলক ও স্বীকৃতি কাঠামো শক্তিশালী করা

- গুণমান এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কার্যকরভাবে তদারকি করতে **হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (HECI)** কাঠামোটি দ্রুত চালু করা উচিত।
- পরিকাঠামো ও শিক্ষার মান যাচাই করতে বেসরকারি কলেজসহ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য **বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি (Mandatory accreditation)** একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

৫. ন্যায়সঙ্গত সুযোগের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

- শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করতে SWAYAM, NPTEL এবং e-PG Pathshala-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে মূল ডিগ্রি প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে।
- ডিজিটাল ব্যবধান কমাতে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় গণ-ডিজিটাল পরিকাঠামো (Public digital infrastructure) সম্প্রসারণ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সংখ্যাগতভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে, তবে গুণমান, সাম্য এবং শিক্ষাদান ক্ষমতার অভাব এখনও বড় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে, যা 'স্টেট অফ ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া ২০২৬' রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' (Viksit Bharat) গড়ার লক্ষ্য পূরণে ভারতকে অবশ্যই শিক্ষক শক্তি, সাশ্রয়ী শিক্ষা এবং আঞ্চলিক সাম্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবেই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অর্থবহ শিক্ষাগত ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

Q. India's higher education sector has expanded rapidly, but quality and equity have not kept pace. Critically examine in the light of recent trends. 15 Marks

2.1.5. প্রধান নির্বাচন কমিশনার: সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং উদীয়মান উদ্বেগ

ভূমিকা

ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রায় বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রক্রিয়া (Impeachment proceedings) শুরু করার সাম্প্রতিক পদক্ষেপটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। যদিও এই প্রস্তাবটি সংসদে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তবুও এটি ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) স্বাধীনতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংশয়কে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।



প্রধান নির্বাচন কমিশনার — সাংবিধানিক ভিত্তি এবং ক্ষমতা

A. সাংবিধানিক পদমর্যাদা ও জনদেশ (Mandate)

ভারতের সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) একটি স্বতন্ত্র সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ, যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য গঠিত।

- এটি সংসদ, রাজ্য আইনসভা, রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নির্বাচন পরিচালনা করে।
- এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একমাত্র অভিভাবক হিসেবে কাজ করে এবং নির্বাহী বিভাগের (Executive) হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত।
- ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ইসিআই (ECI) প্রায় ৯৬.৮ কোটি নিবন্ধিত ভোটারের তদারকি করে — যা বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ভোটার তালিকা।

B. নির্বাচন কমিশনের গঠন

- নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) এবং এক বা একাধিক নির্বাচন কমিশনারদের (ECs) নিয়ে গঠিত। সকলের ক্ষমতা সমান, তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- তারা ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি একটি বাছাই কমিটির (Selection Committee) পরামর্শ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। ২০২৩ সালের নতুন আইন অনুযায়ী এই কমিটিতে থাকেন:

- প্রধানমন্ত্রী (চেয়ারম্যান)।

2. লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা (বা বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতা)।
3. প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী।

C. কার্যকাল, নিরাপত্তা এবং অপসারণ সুরক্ষা

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যকাল ৬ বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত (যেটি আগে হবে)। এই সুরক্ষাগুলো নির্বাহী বিভাগের চাপ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করে:

- **অপসারণ পদ্ধতি:** প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কেবল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির অনুরূপ পদ্ধতিতে অপসারণ করা যায় — যার জন্য প্রমাণিত অসদাচরণ বা অক্ষমতা প্রয়োজন।
- **অন্যান্য কমিশনার:** অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের কেবল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (CEC) সুপারিশক্রমে অপসারণ করা যেতে পারে।
- **আর্থিক স্বাধীনতা:** প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বেতন ও চাকরির শর্তাবলী ভারতের **সংযুক্ত তহবিলের (Consolidated Fund of India)** ওপর ধার্য করা হয়, যা সংসদের ভোটের ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ — সাংবিধানিক প্রক্রিয়া

সংবিধানে একে 'অভিশংসন' না বলে "অপসারণ" (Removal) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি অনুচ্ছেদ ১২৪(৪) অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতির অনুরূপ।

ধাপ	বিস্তারিত বিবরণ
১. প্রস্তাবের নোটিশ	লোকসভার অন্তত ১০০ জন সদস্য অথবা রাজ্যসভার অন্তত ৫০ জন সদস্য স্বাক্ষরিত একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব জমা দিতে হয়।
২. গ্রহণ বা অনুমোদন	লোকসভার অধ্যক্ষ (Speaker) বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করেন এবং সেটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।
৩. তদন্ত কমিটি	প্রস্তাব গৃহীত হলে, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় (সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি, হাইকোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি এবং একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ)।
৪. উভয় কক্ষে ভোটদান	তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, প্রতিটি কক্ষে আলাদাভাবে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (Special Majority) প্রস্তাবটি পাস হতে হয়। অর্থাৎ: (ক) কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি ভোট এবং (খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) ভোট।
৫. রাষ্ট্রপতির আদেশ	উভয় কক্ষে পাস হওয়ার পর, ভারতের রাষ্ট্রপতি অপসারণের চূড়ান্ত আদেশ জারি করেন।

বর্তমান অভিশংসন (অপসারণ) প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট

A. বিরোধী দলের উত্থাপিত প্রধান অভিযোগসমূহ

- **পক্ষপাতমূলক আচরণ:** নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনায় পক্ষপাতিত্ব এবং বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ — যেখানে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে অন্যদের তুলনায় সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
- **নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন:** নির্বাচনী জালিয়াতি এবং অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়া, যার ফলে কমিশনের নিরপেক্ষতা (Neutrality) ক্ষুণ্ণ হয়েছে।
- **ভোটাধিকার হরণ:** বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক যোগ্য ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া — বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলিতে।

B. এই মুহূর্তটি কেন ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ

- ভারতের ৭৫ বছরের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এই প্রথম কোনো প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (CEC) অভিশংসন করার চেষ্টা করা হচ্ছে — যা প্রাতিষ্ঠানিক আত্মবিশ্বাসের (Institutional confidence) চরম অভাবকে প্রতিফলিত করে।

- এটি প্রধান বিরোধী দলগুলো এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একটি গভীর কাঠামোগত অবিশ্বাসের (Structural mistrust) সংকেত দেয় — যা গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য উদ্বেগের বিষয়।
- যদিও সংসদে এটি সফল হওয়ার মতো সংখ্যা নেই, তবুও একটি প্রতীকী প্রতিবাদ (Symbolic act) হিসেবে এই প্রস্তাবটি নির্বাচনী জবাবদিহিতার বিষয়টিকে জাতীয় জনবক্তব্যে নিয়ে এসেছে।

C. রাজনৈতিক বাস্তবতা — কেন এই প্রস্তাব সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম

- ক্ষমতাসীন জোটের সংসদে উভয় কক্ষে সুবিধাজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে — তাই প্রয়োজনীয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Special majority) অর্জন করা কার্যত অসম্ভব।
- ফলস্বরূপ, এই প্রস্তাবটি মূলত একটি রাজনৈতিক বিবৃতি এবং জন-জবাবদিহিতার চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে — এটি অপসারণের বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া হওয়ার চেয়ে প্রতিবাদের মাধ্যম বেশি।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) এবং সংশ্লিষ্ট উদ্বেগ

A. SIR সম্পর্কে বিস্তারিত

বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) হলো নির্বাচন কমিশন (ECI) পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভোটার তালিকা পরীক্ষার ও হালনাগাদ করা হয়। এর লক্ষ্য হলো দ্বৈত এন্ট্রি, মৃত ভোটার এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে সরিয়ে সঠিক ভোটার তালিকা নিশ্চিত করা।

- ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধন ও রক্ষণাবেক্ষণের আইনি ম্যান্ডেট রয়েছে।
- SIR প্রক্রিয়ায় AI-ভিত্তিক অসঙ্গতি শনাক্তকরণ সরঞ্জাম, মাইক্রো-অবজারভার এবং কিছু ক্ষেত্রে ভোটারদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ব্যবহার করা হয়।

B. উত্থাপিত উদ্বেগ — ভোটার বাদ পড়ার মাত্রা ও ভয়াবহতা

- বিপুল সংখ্যক ভোটার বর্জন: রিপোর্টে দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশসহ একাধিক রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।
- "Under Adjudication" (বিচারাধীন) ভোটার: নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তেও বিপুল সংখ্যক ভোটারের আবেদন এবং আপিল অমীমাংসিত থেকে গেছে — যার ফলে নাগরিকরা এক অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছেন যেখানে তারা ভোট দিতে পারছেন না, আবার কোনো সিদ্ধান্তও পাচ্ছেন না।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব: বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বর্জন প্রক্রিয়া তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি উপজাতি (ST), পরিযায়ী শ্রমিক এবং সংখ্যালঘুদের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলেছে।
- স্বচ্ছতার অভাব: ভোটার নাম কাটার পদ্ধতি, মানদণ্ড বা অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট প্রকাশ্য তথ্য দেওয়া হয়নি।
- অপরিপাক্য অভিযোগ প্রতিকার: যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, নির্বাচনের আগে সঠিক সময়ে নাম সংশোধনের জন্য তাদের কাছে পর্যাপ্ত বা সহজ কোনো উপায় ছিল না।

ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব

A. পক্ষে যুক্তি

- সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা: এই প্রস্তাবটি এই নীতিকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করে যে, নির্বাচন কমিশনের (ECI) মতো শক্তিশালী স্বাধীন সংস্থাকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায় যখন তাদের আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
- একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বার্তা প্রদান: এটি সংকেত দেয় যে, অভিযুক্ত অসদাচরণ (Misconduct), পক্ষপাতিত্ব বা ক্ষমতার অপব্যবহার বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেওয়া হবে না, এমনকি সেই পদটি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত হলেও।

- গণতান্ত্রিক ভারসাম্য (Checks and Balances) বজায় রাখা: অপসারণ প্রক্রিয়াটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার দিকে জনসাধারণ এবং সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা বিতর্ক, নিবিড় পরীক্ষা এবং সম্ভাব্য সংস্কারের পথ প্রশস্ত করে।
- ইসিআই-কে (ECI) সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করা: এই প্রস্তাবের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমিশনের কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, স্পষ্টীকরণ এবং উন্নত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

B. বিপক্ষে যুক্তি

- সংখ্যাগতভাবে বাস্তবসম্মত নয়: প্রয়োজনীয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Special majority) ছাড়া এই প্রস্তাব পাস হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে এটি একটি প্রকৃত সাংবিধানিক প্রতিকারের চেয়ে কেবল একটি প্রতীকী বা অন্তঃসারশূন্য প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য হতে পারে।
- অভিশংসনকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করার ঝুঁকি: যদি এই ধরনের পদক্ষেপ বারবার নেওয়া হয়, তবে এটি একটি রুটিন রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। এটি কেবল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) নয়, অন্যান্য স্বাধীন সংস্থার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে।
- সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিকীকরণ করা: প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (CEC) রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করা হলে, নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ অভিভাবকের বদলে দলীয় সংঘাতের কেন্দ্রে (Site of partisan conflict) পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- সাংবিধানিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়া: অভিশংসনের অপব্যবহার বা একে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা 'চাপের মুখে অপসারণ'-এর একটি নজির তৈরি করতে পারে, যা বিভিন্ন সাংবিধানিক পদের প্রতি স্থিতিশীলতা এবং আস্থা কমিয়ে দেয়।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: আস্থা পুনরুদ্ধার এবং প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা

A. ভোটার তালিকা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা

- ভোটার তালিকার সমস্ত সংশোধনের জন্য স্পষ্ট, সহজ এবং বিস্তারিত নির্দেশিকা (Guidelines) প্রকাশ করতে হবে, যার মধ্যে AI টুলের ব্যবহারের মানদণ্ড উল্লেখ থাকবে।
- প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই শক্তিশালী মানবিক তদারকি (Human oversight) এবং জনসাধারণের অডিট (Public-audit) ব্যবস্থার মাধ্যমে হতে হবে যাতে কোনো স্বৈচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত রোধ করা যায়।

B. জবাবদিহিতা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

- কেবল সংকটের সময় নয়, বরং নিয়মিত বিরতিতে নির্বাচন কমিশনের (ECI) কার্যক্রমের ওপর সংসদীয় পর্যালোচনা (Parliamentary review) পরিচালনা করতে হবে।
- বড় ধরনের নির্বাচনী কর্মসূচিগুলোর (যেমন SIR) ক্ষেত্রে আইন বিশেষজ্ঞ, পরিসংখ্যানবিদ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র অডিট (Independent audit) পরিচালনা করতে হবে।

C. নিয়োগ প্রক্রিয়া সংস্কার

- প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) এবং নির্বাচন কমিশনারদের (EC) নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটিকে (Selection Committee) আরও বিস্তৃত করতে হবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
 - একজন বিচার বিভাগীয় সদস্য।
 - বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধি।
 - শাসনব্যবস্থা ও নির্বাচন বিষয়ক বেসরকারি বিশেষজ্ঞগণ।
- দলীয় পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ কমাতে মনোনয়নের মানদণ্ড এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা (Shortlist) স্বচ্ছ ও প্রকাশ্য করতে হবে।

D. যোগাযোগ এবং অংশীদারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

- রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের সাথে নিয়মিত পরামর্শমূলক আলোচনা (Consultations) করতে হবে।
- নির্বাচন কমিশনের বড় সিদ্ধান্তগুলো, বিশেষ করে যা ভোটের তালিকার ওপর প্রভাব ফেলে, সেগুলোর দ্রুত এবং জনসমক্ষে স্পষ্টীকরণ (Public clarification) নিশ্চিত করতে হবে।

E. ভোটের অধিকার রক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ

- কোনো প্রকৃত ভোটের যাতে ভুলবশত তালিকা থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে:
 - একাধিক এবং সময়াবদ্ধ অভিযোগ প্রতিকার (Grievance redressal) ব্যবস্থা প্রদান করে।
 - ভোটের তালিকা চূড়ান্ত করার আগে সংশোধনের সময়সীমা বৃদ্ধি করে।
- প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর (Marginalised groups) জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সচেতনতা অভিযান চালাতে হবে যাতে তারা সংশোধন প্রক্রিয়া ও তাদের অধিকার বুঝতে পারে।

F. নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিকীকরণ সীমিত করা

- রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই ইসিআই-এর সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন (Constitutional autonomy) সম্মান করতে হবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা বন্ধ করতে হবে।
- জনআস্থা বজায় রাখতে সমালোচনাকে পুরো প্রতিষ্ঠানের বদলে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের ওপর সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

G. বিচার বিভাগের ভূমিকা নির্ধারণ

- পাইকারি হারে ভোটের তালিকা যাচাইয়ের মতো রুটিন নির্বাচনী-প্রশাসনিক কাজ থেকে আদালতকে সাধারণত দূরে থাকতে হবে।
- বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ কেবল গুরুতর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, যা ক্ষমতার পৃথকীকরণ (Separation of powers) নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

উপসংহার

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই অভিশংসন বা অপসারণের প্রচেষ্টা কেবল একটি রাজনৈতিক নাটক নয়, বরং এটি ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক চাপের (Institutional stress) একটি গভীর লক্ষণ। গণতন্ত্র রক্ষায় ফোকাস এখন সংঘাত থেকে সরিয়ে সাংবিধানিক সংস্কারের (Constitutional reform) দিকে নিতে হবে, যাতে প্রতিটি ভোটারের ভোটাধিকার সম্মান ও সুরক্ষা পায়।

Q. The attempt to impeach the Chief Election Commissioner reflects deeper concerns about institutional trust rather than merely a political confrontation. Discuss in the context of recent developments. 15 Marks

2.1.6. ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) বদলি সংক্রান্ত ক্ষমতা

ভূমিকা

সম্প্রতি নির্বাচনী রাজ্যগুলোতে (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে) রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নির্বাচন কমিশনের (ECI) পক্ষ থেকে সরাসরি বদলি করার বিষয়টি একটি সাংবিধানিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এটি সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিধি এবং বিধিবদ্ধ সার্ভিস আইনের কার্যকারিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। এই বিষয়টি মূলত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রাখার মধ্যকার এক টানাপোড়েনকে তুলে ধরে।



আইনি ও সাংবিধানিক কাঠামো

১. ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ: ক্ষমতার পরিধি ও প্রকৃতি

- ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনা, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়। এটি নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কর্তৃপক্ষে পরিণত করে।
- এই বিধানটি ইচ্ছাকৃতভাবেই অত্যন্ত ব্যাপক রাখা হয়েছে, যাতে যেখানে আইন অস্পষ্ট বা অপরিপূর্ণ, সেখানেও কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।
- এই নমনীয়তা নিশ্চিত করে যে, যে কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেও নির্বাচন যেন দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

২. ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা

মোহিন্দর সিং গিল বনাম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই ক্ষমতার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল:

- ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হলো ক্ষমতার এক "ভাণ্ডার" (Reservoir of powers), যা সুনির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতিতেও নির্বাচন কমিশনকে কাজ করার অনুমতি দেয়।
- যাইহোক, এই ক্ষমতা পরম বা নিরঙ্কুশ (Absolute) নয়; এটি বিদ্যমান আইনের পরিপূরক হতে পারে, কিন্তু আইনের বিকল্প হতে পারে না।
- আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে, কমিশনের সমস্ত পদক্ষেপের একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা।

৩. সিভিল সার্ভিস বা সরকারি সেবা নিয়ন্ত্রণকারী আইনি কাঠামো

- IAS এবং IPS কর্মকর্তাদের পরিচালনা করা হয় সর্বভারতীয় সেবা আইন, ১৯৫১ (All India Services Act, 1951) এবং সংশ্লিষ্ট বিধি দ্বারা।
- রাজ্যের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ (যার মধ্যে বদলি এবং নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত) সাধারণত রাজ্য সরকারের হাতে থাকে।
- সংবিধানের সপ্তম তফসিল অনুযায়ী, "রাজ্য জনসেবা" (State Public Services) রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত, যা প্রশাসনিক বিষয়ে রাজ্যের কর্তৃত্বকে জোরালো করে।

৪. নির্বাচনী আইন

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ এবং ১৯৫১:

- নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি বিস্তারিত কাঠামো প্রদান করে।
- নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে।
- তবে, এই আইনগুলোতে সরাসরি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বদলি করার স্পষ্ট ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হয়নি।

বদলি সংক্রান্ত ক্ষমতার গুরুত্ব

১. অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা

নির্বাচন কমিশনের এই বদলির উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক যন্ত্রের অপব্যবহার বা কোনও প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধ করে নির্বাচনী নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

২. প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

এই পদক্ষেপটি নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব সাংবিধানিক ক্ষমতার সক্রিয় প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে। এটি একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী নির্বাচনী প্রহরী হিসেবে কমিশনের ভাবমূর্তিকে আরও দৃঢ় করে।

৩. নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার ওপর প্রভাব

এটি রাজ্য প্রশাসনের ওপর নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের মাত্রাকে সামনে নিয়ে আসে। এর ফলে সাধারণ শাসনব্যবস্থা এবং নির্বাচনী তদারকির মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা টানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য

এই বিষয়টি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর (Cooperative Federalism) শক্তি পরীক্ষা করে। প্রশাসনিক বিষয়ে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে কমিশনের এই হস্তক্ষেপ রাজ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়।

বদলি সংক্রান্ত ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ এবং উদ্বেগ

১. আইনি ভিত্তির অভাব

- ভারতের নির্বাচন কমিশনকে (ECI) মুখ্য সচিব বা ডিজিপি-র (DGP) মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বদলি করার জন্য কোনও সুস্পষ্ট আইনি ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, যা এই ধরনের পদক্ষেপকে সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।
- শুধুমাত্র ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ওপর নির্ভরতা আইনি অস্পষ্টতা তৈরি করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাংবিধানিক সংঘাতের পথ খুলে দেয়।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সংক্রান্ত উদ্বেগ

- নির্বাচন কমিশনের একতরফা সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বকে খর্ব করে এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষমতার ভারসাম্যকে নষ্ট করে।
- আগে থেকে আলোচনা না করার ফলে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয় এবং সাংবিধানিক ও রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস হ্রাস পায়।

৩. প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা

- উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হঠাৎ অপসারণের ফলে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয় এবং প্রশাসনিক স্তরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।
- নির্বাচনের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্থিতিশীল ও সমন্বিত প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন, যা এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

৪. পক্ষপাতিত্বের ধারণা

- এই ধরনের বদলি একটি পরোক্ষ ধারণা তৈরি করে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পক্ষপাতদুষ্ট বা নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে অক্ষম।
- তবে, স্বচ্ছ কোনও মানদণ্ড বা তদন্তের অভাব থাকায় এই সিদ্ধান্তগুলো খামখেয়ালি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়।

৫. প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের (Natural Justice) লঙ্ঘন

- আক্রান্ত কর্মকর্তাদের অনেক সময় বদলির আগে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করার বা অভিযোগের জবাব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না।
- এই যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাব প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

৬. সিভিল সার্ভিসের মনোবলের ওপর প্রভাব

- খামখেয়ালি বা আকস্মিক বদলি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে এবং তাদের স্বাধীন ও পেশাদার সিদ্ধান্ত নিতে নিরুৎসাহিত করে।
- দীর্ঘমেয়াদে এটি প্রশাসনের দক্ষতা কমিয়ে দিতে পারে এবং আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা দুর্বল করতে পারে।

৭. প্রাতিষ্ঠানিক অতি-সক্রিয়তার ঝুঁকি (Institutional Overreach)

- ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যাপক ব্যাখ্যা নির্বাচন কমিশনের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে পারে।
- সুপ্রিম কোর্ট যেমনটি সতর্ক করেছে, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা সাংবিধানিক শাসনের পরিপন্থী এবং এটি প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: নির্বাচন পরিচালনা সংস্থাগুলোর (EMBs) ক্ষমতা

১. নির্বাচন কমিশন (যুক্তরাজ্য/UK)

- যুক্তরাজ্যের নির্বাচন কমিশন মূলত নিয়ন্ত্রক এবং পরামর্শদায়ক ভূমিকা পালন করে, যা প্রচারণার অর্থায়ন এবং নির্বাচনী আচরণের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।
- তাদের কাছে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলি করার ক্ষমতা নেই, কারণ সেখানে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা মূলত বিকেন্দ্রীভূত এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়।

২. ফেডারেল ইলেকশন কমিশন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/USA)

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের FEC মূলত নির্বাচনী প্রচারণার অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দেয়, যেখানে নির্বাচন পরিচালনা করে প্রতিটি রাজ্য।
- রাজ্য কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ বা বদলি করার কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সেখানে নেই, যা শক্তিশালী রাজ্য স্বায়ত্তশাসনকে প্রতিফলিত করে।

৩. ইলেকশনস কানাডা এবং অস্ট্রেলীয় নির্বাচন কমিশন

- কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া উভয় দেশের নির্বাচন কমিশনই নিবেদিত পেশাদার নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করে, যা রাজ্য বা প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেয়।
- এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা স্থানীয় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংঘাত এড়িয়ে সুশৃঙ্খল নির্বাচনী শাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

আগামী পথ

১. আইনি স্পষ্টীকরণ

- অস্পষ্টতা দূর করতে সংসদকে নির্বাচনের সময় কর্মকর্তাদের বদলি এবং নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার পরিধি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
- এটি বিদ্যমান সার্ভিস আইনের সঙ্গে সংঘাত রোধ করবে এবং কমিশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিবাদ কমিয়ে আনবে।

২. সুস্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি

- বদলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছ মানদণ্ড এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের একটি স্বচ্ছ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) তৈরি করা উচিত।
- এই ধরনের নির্দেশিকা ধারাবাহিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খামখেয়ালিপনা কমাতে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা

- বড় ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের আগে রাজ্য সরকারগুলোর সঙ্গে বাধ্যতামূলক আলোচনার একটি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া উচিত।
- এটি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সময় আরও ভালো সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

৪. বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ

- সুপ্রিম কোর্ট সার্ভিস আইন এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট সীমা স্পষ্ট করতে পারে।
- এটি একটি প্রামাণ্য ব্যাখ্যা প্রদান করবে, যা নির্বাচনী স্বায়ত্তশাসন এবং সাংবিধানিক সীমার মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করবে।

৫. সিভিল সার্ভিসের জন্য সুরক্ষা

- কর্মকর্তাদের বদলি করার আগে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া, যেমন আগাম নোটিশ এবং জবাব দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত।
- এটি সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মনোবল, মর্যাদা এবং স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক পরিবেশ গড়ে তুলবে।

৬. প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা শক্তিশালী করা

- দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ এবং পেশাদারভাবে স্বাধীন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া উচিত।
- এটি প্রশাসনের সহজাত নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে, ফলে ঘনঘন বা প্রতিরোধমূলক বদলির প্রয়োজন কমে আসবে।

উপসংহার

ভারতের নির্বাচন কমিশন ভারতের গণতান্ত্রিক বৈধতা রক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু, তবে এর ক্ষমতা অবশ্যই সাংবিধানিক সীমা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্প্রীতির মধ্যে বিকশিত হওয়া উচিত। আগামী দিনে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘাত এড়াতে আইনি স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য। নির্বাচনী স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক বিশ্বাস—উভয়কেই শক্তিশালী করা একটি স্থিতিস্থাপক ও পরিপক্ব গণতন্ত্র বজায় রাখার চাবিকাঠি হবে।

Q. The Election Commission of India's powers under Article 324 are wide but not unfettered. Examine in the context of recent controversies over transfer of senior State officials. 15 Marks

2.1.7. জন বিশ্বাস ২.০

প্রেক্ষাপট

জন বিশ্বাস ২.০ বিল হলো ভারতকে "অপরাধমুক্ত" (Decriminalizing India) করার লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী আইনি প্রচেষ্টা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসা করার সহজতার মধ্যে একটি নতুন ভারসাম্য তৈরি করা। এটি মূলত ২০২৩ সালে পাশ হওয়া মূল আইনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে।



জন বিশ্বাস কাঠামোর বিবর্তন

১. **সংস্কার-পূর্ব যুগ: পরিপালন বিড়ম্বনা (Compliance Paradox)** ২০২৩ সালের আগে ভারতের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ "অতিরিক্ত অপরাধীকরণ" দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

- **বোঝা:** হাজার হাজার ছোটখাটো, প্রযুক্তিগত এবং পদ্ধতিগত ভুল (যেমন রিপোর্ট জমা দিতে দেরি হওয়া বা খাতায় সামান্য করণিক ভুল) করলে কারাদণ্ডের ভয় থাকত।
- **প্রভাব:** এর ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) উদ্যোক্তাদের মধ্যে "আইনি আতঙ্ক" তৈরি হতো এবং আদালতগুলিতে লক্ষ লক্ষ এমন মামলা জমে যেত যেখানে কোনো প্রকৃত অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল না।

- **সম্পদের অপচয়:** প্রশাসনিক এবং বিচারবিভাগীয় শক্তি গুরুতর অপরাধের পরিবর্তে ছোটখাটো কাগজের ভুল তদারকি করতেই ব্যয় হয়ে যেত।
- ২. **জন বিশ্বাস ১.০ (২০২৩):** ধারণার সফল প্রয়োগ জন বিশ্বাস (বিধান সংশোধন) আইন, ২০২৩ ছিল আইনি বইগুলোকে পরিকল্পিতভাবে "পরিষ্কার" করার প্রথম বড় পদক্ষেপ।
 - **ব্যাপ্তি:** এটি ১৯টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪২টি কেন্দ্রীয় আইনের ওপর কাজ করেছে।
 - **ফলাফল:** এটি ১৮৩টি ধারাকে অপরাধমুক্ত করেছে।
 - **মূল সাফল্য:** এটি প্রযুক্তিগত ভুলের জন্য জেল খাটানোর পরিবর্তে **আর্থিক জরিমানা** চালু করেছে। এর মাধ্যমে এই নজির তৈরি হয়েছে যে, রাষ্ট্র চাইলে ব্যবসায়ীদের জেলের ভয় না দেখিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিতে পারে।
- ৩. **জন বিশ্বাস ২.০ (২০২৬):** ব্যাপকতা ও আধুনিকায়ন ২০২৬ সালের এই বিলটি আগের ধারণাকে অনেক বড় পরিসরে নিয়ে গেছে এবং এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কারে রূপান্তরিত করেছে।
 - ২৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে **৭৯টি কেন্দ্রীয় আইনের ৭৮৪টি ধারাকে** এর আওতায় আনা হয়েছে।
 - লক্ষ্য হলো "ভয়-ভিত্তিক" মডেল (ফৌজদারি শাস্তি) থেকে সরে এসে **"বিশ্বাস-ভিত্তিক" মডেল (দেওয়ানি জরিমানা)** গ্রহণ করা।

জন বিশ্বাস ২.০-এর মূল উদ্দেশ্য

- **বিশ্বাস-ভিত্তিক শাসন:** রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ককে সন্দেহ থেকে সরিয়ে বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং ব্যবসায়িক কাজে "সততা" আছে বলে ধরে নেওয়া।
- **ছোটখাটো ভুল অপরাধমুক্ত করা:** ৭৯টি আইনের ৭১৭টি ধারা থেকে কারাদণ্ডের বিধান সরিয়ে দেওয়া, যাতে ছোটখাটো প্রযুক্তিগত ভুলের জন্য কাউকে "অপরাধী" তকমা না সইতে হয়।
- **ব্যবসা করার সহজতা (EoDB):** আইনি ভয় দূর করে নতুন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং বিনিয়োগের খরচ কমিয়ে আনা।
- **জীবনযাত্রার সহজতা (Ease of Living):** নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন হারানি কমানো (যেমন মিউনিসিপ্যাল জল ব্যবহার বা লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত ভুল)।
- **বিচারবিভাগের বোঝা কমানো:** ছোটখাটো মামলাগুলোকে আদালতের বাইরে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে বিচারবিভাগের ওপর চাপ কমানো (বর্তমানে ৫ কোটির বেশি মামলা ঝুলে আছে)।

জন বিশ্বাস ২.০-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **বিশাল ব্যাপ্তি:** এটি ৭৯টি কেন্দ্রীয় আইনের ৭৮৪টি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব দেয়—যা ২০২৩ সালের আইনের প্রায় দ্বিগুণ।
- **ব্যাপক অপরাধমুক্তকরণ:** ৭৮৪টি ধারার মধ্যে ৭১৭টি ধারাকে **অপরাধমুক্ত** করা হচ্ছে। সাধারণ পদ্ধতিগত ভুলের জন্য জেলের বিধান সরিয়ে আর্থিক জরিমানা রাখা হয়েছে।
- **পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগ (সংশোধনী নোটিশ ও সতর্কতা):**
 - **প্রথমবার অপরাধ:** ১০টি আইনের আওতায় ৭৬টি অপরাধের জন্য বিলটি **"পরামর্শ"** বা **"সতর্কতা"** দেওয়ার নিয়ম চালু করেছে।
 - **সুধরে নেওয়ার সুযোগ:** সরাসরি জরিমানা না করে ব্যবসায়ীদের ভুল সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে **"ইমপ্রভমেন্ট নোটিশ"** দেওয়া হবে।
- **নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া:** আদালত নির্ধারিত 'জরিমানা' (Fine)-এর বদলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নির্ধারিত **'পেনাল্টি' (Penalty)** ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এতে দীর্ঘস্থায়ী বিচারিক প্রক্রিয়া এড়ানো যাবে।
- **আপিল কাঠামো:** স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এতে অভ্যন্তরীণ আপিল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেখানে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করা যাবে।

- **মূল্যস্ফীতি অনুযায়ী সমন্বয়:** জরিমানার কার্যকারিতা বজায় রাখতে প্রতি তিন বছর অন্তর জরিমানার পরিমাণ ১০% বৃদ্ধি পাবে।
- **পুরানো মামলা থেকে মুক্তি:** যারা বর্তমানে ফৌজদারি আদালতে এখনকার অপরাধমুক্ত ধারার অধীনে বিচারার্থীন, তাদের মামলা বন্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে।
- **নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক সংস্কার:**
 - **মোটর যান আইন:** ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৩০ দিনের অতিরিক্ত সময় (Grace Period) দেওয়া হবে।
 - **স্বাস্থ্য খাত:** ওষুধের রেকর্ডে সামান্য ভুলের জন্য এখন আর জেল হবে না, কেবল দেওয়ানি জরিমানা হবে।
 - **NDMC আইন:** সম্পত্তির কর নির্ধারণে আধুনিক পদ্ধতি চালু এবং অবৈধ জল সংযোগকে দেওয়ানি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা।

জন বিশ্বাস ২.০-এর গুরুত্ব

১. অর্থনৈতিক: "ব্যবসায়িক উদ্দীপনা" বৃদ্ধি করা

- **MSME-দের ক্ষমতায়ন:** এটি "কমপ্লায়েন্স ট্যাক্স" বা নিয়ম পালনের অতিরিক্ত বোঝা এবং করণিক ভুলের জন্য জেলের ভয় দূর করে। এর ফলে ছোট ব্যবসাগুলো আইনি ভয় ছাড়াই বড় হওয়ার সুযোগ পায়।
- **বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ:** একটি স্থিতিশীল এবং সাজা-মুক্ত নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করে এটি বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। এটি "ট্যাক্স বা রেগুলেটরি টেররিজম" (আইনি হয়রানি) বন্ধ করতে সাহায্য করে।
- **ঝুঁকি নেওয়ার সংস্কৃতি:** পদ্ধতিগত ভুলের জন্য উদ্যোক্তাদের নামে যাতে অপরাধের রেকর্ড না হয়, এটি তা নিশ্চিত করে। এর ফলে নতুন উদ্ভাবন এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়।

২. বিচারবিভাগীয়: মামলার জট কমানো

- **মামলা নিষ্পত্তি:** ৫ কোটির বেশি ঝুলে থাকা মামলার বোঝা কমাতে এটি সরাসরি সাহায্য করে। ছোটখাটো প্রযুক্তিগত ভুলগুলোকে ফৌজদারি আদালত থেকে সরিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।
- **সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** পুলিশ, আইনজীবী এবং বিচারকদের সময় বাঁচে, যা তারা ছোটখাটো কাগজের ভুলের বদলে গুরুতর অপরাধ এবং জাতীয় নিরাপত্তার মতো বিষয়ে ব্যয় করতে পারেন।

৩. শাসন ব্যবস্থা: "বিশ্বাস-ভিত্তিক" আদর্শ

- **দার্শনিক পরিবর্তন:** এটি শাসন ব্যবস্থাকে "প্রাথমিক সন্দেহ" থেকে সরিয়ে "প্রাথমিক বিশ্বাস"-এর দিকে নিয়ে যায়। এখানে নাগরিকদের অপরাধী হিসেবে নয়, বরং অংশীদার হিসেবে দেখা হয়।
- **ভারসাম্যপূর্ণ শাস্তির নীতি (Proportionality):** "অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি" নিশ্চিত করা হয়। সামান্য ভুলের জন্য সরাসরি জেল না দিয়ে সংশোধনী নোটিশ (Improvement Notices) এবং দেওয়ানি জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **আইনের আধুনিকায়ন:** ঔপনিবেশিক যুগের অপ্রয়োজনীয় আইনগুলো সরিয়ে বর্তমানের ডিজিটাল অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনগুলোকে আধুনিক করা হয়েছে।

৪. সামাজিক: জীবনযাত্রার সহজতা

- **দৈনন্দিন জীবনকে অপরাধমুক্ত করা:** সাধারণ নাগরিকদের লাইসেন্স নবায়ন বা পৌর পরিষেবা সংক্রান্ত ছোট ভুলের জন্য অপরাধী হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- **সরকারি কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস:** কর বা জরিমানার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং "ইউনিট এরিয়া মেথড" চালু করার ফলে নিচুতলার কর্মকর্তাদের ক্ষমতা কমেছে, যা পরোক্ষভাবে দুর্নীতি রোধ করে।

জন বিশ্বাস ২.০-এর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অপরাধ দমনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া

- **ভয় কমে যাওয়া:** সমালোচকদের মতে, জেলের বদলে কেবল জরিমানা রাখলে আইনের প্রতি মানুষের ভয় কমে যেতে পারে, বিশেষ করে **পরিবেশ রক্ষা** এবং জননিরাপত্তার মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে।
- **জরিমানাকে ব্যয়ের অংশ মনে করা:** অনেক ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ খুবই কম (যেমন জেলের অপচয়ের জন্য ১,০০০ টাকা)। বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলো একে সংশোধন হওয়ার উপায় না ভেবে ব্যবসার একটি **সামান্য খরচ** হিসেবে গণ্য করতে পারে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা

- **প্রশাসনিক বিচার:** স্বাধীন বিচারকদের বদলে **প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের** হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ফলে "ক্ষমতার পৃথকীকরণ" নীতি লঙ্ঘিত হতে পারে এবং সরকারের প্রতি কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্বের ঝুঁকি থাকে।
- **প্রশিক্ষণের অভাব:** আমলারা সাধারণত বিচার বিভাগীয় তদন্তে দক্ষ নন। তারা কতটা নিরপেক্ষ এবং সময়মতো বিচার করতে পারবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।

৩. প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি

- **মন্ত্রণালয়গুলোর নিজস্ব সিদ্ধান্ত:** ২৩টি আলাদা মন্ত্রণালয় জড়িত থাকায়, "বিশ্বাস-ভিত্তিক" নিয়মগুলো সব ক্ষেত্রে **একইভাবে** প্রয়োগ না হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- **আইনি অস্পষ্টতা:** কিছু অপরাধ নির্দিষ্ট আইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও সাধারণ আইনের (যেমন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩) অধীনে তা অপরাধ হিসেবেই থেকে যেতে পারে।

৪. অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ

- **নিয়ম তৈরির ক্ষমতা:** অনেক ক্ষেত্রে মূল আইনের বদলে আমলাদের হাতে "বিধি" বা রুলস তৈরির মাধ্যমে জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংসদীয় তদারকি ছাড়া এটি **অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ** হিসেবে দেখা হয়।

৫. প্রশাসনিক বাধা

- **ডিজিটাল পরিকাঠামো:** প্রথমবার ভুল এবং বারবার ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য একটি শক্তিশালী **রিয়েল-টাইম ডিজিটাল ডেটাবেস** প্রয়োজন, যা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি।
- **রূপান্তরের চাপ:** ফৌজদারি আদালত থেকে লক্ষ লক্ষ মামলা সরিয়ে নতুন ব্যবস্থায় নিয়ে আসা একটি বিশাল প্রশাসনিক কাজ।

আগামী পথ

১. প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধি

- **সক্ষমতা বৃদ্ধি:** বিচার বিভাগীয় কাজগুলো নিরপেক্ষভাবে করার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের **বিশেষ প্রশিক্ষণ** দেওয়া প্রয়োজন।
- **ভূমিকা পৃথকীকরণ:** তদন্তকারী (যিনি ভুল ধরবেন) এবং বিচারক (যিনি শাস্তি দেবেন)—এই দুই ভূমিকা আলাদা রাখা জরুরি যাতে পক্ষপাতিত্ব না হয়।

২. ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত সংহতি

- **একীভূত পোর্টাল:** সব মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি সাধারণ ডেটাবেস তৈরি করা, যাতে একজন অপরাধী বারবার একই ভুল করছে কি না তা সহজেই বোঝা যায়।

- স্বয়ংক্রিয় নোটিশ: মানুষের হস্তক্ষেপ কমাতে AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিশ এবং সতর্কতা পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

৩. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

- প্রভাব বিশ্লেষণ: প্রতি ২ বছর অন্তর পর্যালোচনা করা যে, এই পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ বা নিরাপত্তার ক্ষতি না করে সতিই ব্যবসা করার সহজতা বাড়ছে কি না।
- আদর্শ জরিমানা স্কেল: সারা দেশে এবং সব সেক্টরে যাতে জরিমানার পরিমাণ যৌক্তিক ও সমান হয়, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করা।

৪. আইনের সমন্বয়

- BNS-এর সাথে সামঞ্জস্য: নিশ্চিত করা যে একটি বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধমুক্ত হওয়া বিষয়কে যেন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর মাধ্যমে পুনরায় শাস্তি না দেওয়া হয়।
- রাজ্য স্তরে গ্রহণ: রাজ্য সরকারগুলোকে উৎসাহিত করা যাতে তারাও শ্রম, ভূমি এবং স্থানীয় কর সংক্রান্ত আইনগুলোতে একই ধরনের সংস্কার আনে।

৫. সম্মিলিত শাসন

- অংশীজনের সাথে আলোচনা: শিল্পমহল (CII/FICCI) এবং নাগরিক সমাজের সাথে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যাতে ভবিষ্যতে আইনি বাধাগুলো দ্রুত চিহ্নিত করা যায়।

উপসংহার

জন বিশ্বাস ২.০ একটি বিশ্বাস-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা তৈরি করে, যা সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক গতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রযুক্তি এবং শাস্তির যৌক্তিকতাকে কাজে লাগিয়ে এটি ভারতকে একটি পূর্বাভাসযোগ্য এবং বিনিয়োগ-বান্ধব ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে উন্নয়নের সাথে দায়িত্বশীল শাসনের মেলবন্ধন ঘটবে।

Q. "The Jan Vishwas 2.0 Bill represents a fundamental shift from 'command and control' to 'trust-based' governance." Discuss how this legislative reform seeks to balance regulatory enforcement with the ease of living for citizens. 15 Marks

2.1.8. ভারতের উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বৃত্তির পুনর্কল্পনা

ভূমিকা

- জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০-এর লক্ষ্য অনুযায়ী ভারত ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় ৫০% গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তবে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো নয়, বরং ছাত্রছাত্রীরা যাতে মর্যাদার সাথে শিক্ষা গ্রহণ (Access), ব্যয়ভার বহন (Afford) এবং শিক্ষা সম্পন্ন (Complete) করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- এই প্রেক্ষাপটে, বৃত্তি (Scholarships) একটি পরিবর্তনকারী হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে—যা সাম্য (Equity), গুণমান (Quality) এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে (Growth) সংযুক্ত করে। এটি কেবল নির্ধারণ করে না কে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করবে, বরং এটিও নিশ্চিত করে যে কে তার মধ্যে সাফল্য (Thrive) অর্জন করবে।



ভারতের উচ্চশিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি

ভারত তার উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

- **প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি:** ইকোনমিক সার্ভে অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০১৪-১৫ সালের ৫১,৫৩৪ থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ৭০,০০০-এর বেশি হয়েছে।
- **ছাত্র নথিভুক্তি:** বর্তমানে ছাত্র নথিভুক্তির সংখ্যা ৪.৩৩ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।
- **GER-এর ব্যবধান:** এত বিস্তার সত্ত্বেও, ২০২২-২৩ সালে GER দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৯.৫%—যা NEP ২০২০-এর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম এবং উন্নত দেশগুলোর বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় অনেক নিচে।

এই ব্যবধান একটি কাঠামোগত সত্যকে উন্মোচিত করে: কেবল ক্যাম্পাস তৈরি করলেই ভবিষ্যৎ তৈরি হয় না। ওড়িশার গ্রামীণ অঞ্চলের কোনো প্রান্তিক পরিবার বা পাটনার বস্তিবাসী কোনো শিক্ষার্থীর জন্য তিনটি বাধা একসাথে কাজ করে:

1. **সুযোগ (Access):** মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ভৌগোলিক এবং সামাজিক দূরত্ব।
2. **সাধ্য (Affordability):** টিউশন ফি, আবাসন এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের চরম বোঝা।
3. **আকাঙ্ক্ষা (Aspiration):** প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা পদ্ধতিগত বর্জনের (Systemic Exclusion) কারণে আত্মবিশ্বাসের অভাব।

AISHE রিপোর্ট অনুযায়ী, তথ্য একটি গভীর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে:

- **তফসিলি জাতি (SC):** মোট নথিভুক্তিতে এদের হার মাত্র ১৪.৯% (জনসংখ্যার অনুপাত ~১৭%-এর বিপরীতে)।
- **তফসিলি জনজাতি (ST):** নথিভুক্তির হার মাত্র ৫.৮% (জনসংখ্যার অনুপাত ~৮.৬%-এর বিপরীতে)।
- **লিঙ্গ বৈষম্য:** অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মহিলারা এখনও STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) এবং পেশাদার ক্ষেত্রগুলোতে অত্যন্ত কম প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই তথ্যগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয়—এগুলি আসলে সাংবিধানিক ব্যর্থতা যা দ্রুত সমাধানের দাবি রাখে।

নিচে আপনার দেওয়া বিষয়বস্তুর একটি যথাযথ এবং সাবলীল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোকে (Key Words) হাইলাইট করা হয়েছে এবং তথ্যের প্রবাহ বজায় রাখা হয়েছে:

সাংবিধানিক কাঠামো: মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা (Constitutional Framework: Education as a Fundamental Right)

ভারতের সংবিধান একটি শক্তিশালী আদর্শগত কাঠামো প্রদান করে যা শিক্ষায় প্রবেশাধিকারকে—উচ্চশিক্ষাসহ—কেবল একটি নীতিগত পছন্দ নয়, বরং একটি নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতায় (Moral and Legal Obligation) উন্নীত করে:

- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১এ (৮৬তম সংশোধনী, ২০০২):** ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার (Right to Free and Compulsory Education), যা একটি বুনিয়াদি ভিত্তি তৈরি করে এবং যৌক্তিকভাবে একে উচ্চশিক্ষার স্তরেও সম্প্রসারিত করা উচিত।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার):** মোহিনী জৈন বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং উল্লিকৃষ্ণন বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, শিক্ষার অধিকার জীবন ও মানবিক মর্যাদার (Right to Life and Human Dignity) অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪১ (রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি - DPSP):** রাষ্ট্রকে তার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের মধ্যে শিক্ষার অধিকার (Right to Education) নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়—এই নির্দেশিকা বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি সক্রিয় পদক্ষেপের দাবি রাখে।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬:** রাষ্ট্র তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি জনজাতি (ST) এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নয়ন করবে এবং তাদের সামাজিক অবিচার (Social Injustice) থেকে রক্ষা করবে।
- **ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(৫):** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সামাজিকভাবে এবং শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ এবং বিশেষ বিধান (Reservation and Special Provisions) কার্যকর করতে সক্ষম করে।

- ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ ও ৩৯: রাষ্ট্রকে আয়, মর্যাদা এবং সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস (Minimising Inequalities) করার চেষ্টা করতে হবে—যা বৃত্তির নীতিকে নিছক কোনো দয়া নয়, বরং একটি সাংবিধানিক হাতিয়ার (Constitutional Instrument) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

যখন বৃত্তিগুলো সঠিকভাবে পরিকল্পিত এবং বাস্তবায়িত হয়, তখন সেগুলিই হয় সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা (Constitutional Aspirations) বাস্তব জীবনে রূপ পায়। একজন সক্ষম কিন্তু দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানে অস্বীকার করা কেবল একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়—এটি একটি সাংবিধানিক লঙ্ঘন (Constitutional Transgression)।

অশোক কুমার ঠাকুর বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, শিক্ষায় প্রকৃত সাম্য (Substantive Equality) প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা রাষ্ট্রের একটি ইতিবাচক কর্তব্য। বৃত্তি হলো এই কর্তব্যেরই বাস্তবায়ন (Operationalisation)।

কেন বৃত্তি শিক্ষাগত রূপান্তরের মূল ভিত্তি

১. বৃত্তি সুযোগের সমস্যার সমাধান করে

- বৃত্তি দূরবর্তী, গ্রামীণ এবং অনুন্নত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের দূরত্ব, সুযোগের অভাব এবং সামাজিক প্রতিকূলতার (Social Disadvantage) বাধা কমিয়ে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে সাহায্য করে।
- এগুলি নিশ্চিত করে যে ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা যেন মেধাবী শিক্ষার্থীদের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে ক্যাম্পাসে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিনিধিত্ব (Inclusivity and Representation) বৃদ্ধি পায়।

২. বৃত্তি আর্থিক সাধের সংকট দূর করে

- উচ্চশিক্ষা প্রায়শই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।
- বৃত্তি টিউশন ফি, থাকার খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করে এই বোঝা কমায়, যা শিক্ষার্থীদের আর্থিক উদ্বেগহীনভাবে (Without Financial Stress) পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে সাহায্য করে।

৩. বৃত্তি গুণমান এবং ফলাফলের উন্নতি ঘটায়

- বৃত্তি কেবল নথিভুক্তি বাড়ায় না, বরং শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কর্মদক্ষতা এবং স্থায়িত্ব (Retention) বৃদ্ধি করে।
- সহায়তা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সময়মতো ডিগ্রি সম্পন্ন করতে এবং স্থিতিশীল ক্যারিয়ার গড়তে সক্ষম হয়, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটি বৈচিত্র্যময় এবং উচ্চ-মানসম্পন্ন (Diverse and High-Quality) পরিবেশ থেকে উপকৃত হয়।

৪. বৃত্তি সুপ্ত প্রতিভা উন্মোচন করে

- ভারতের প্রতিভা বিভিন্ন অঞ্চল, জাতি এবং লিঙ্গের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু কাঠামোগত বাধার কারণে অনেকেই সুযোগ পায় না।
- বৃত্তি প্রতিভা এবং সুযোগের মধ্যে একটি সেতু (Bridge between Talent and Opportunity) হিসেবে কাজ করে, যা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৫. বৃত্তি সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে

- আধুনিক বৃত্তি কেবল আর্থিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এতে পরামর্শ (Mentorship), নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এবং ক্যারিয়ার নির্দেশিকা (Career Guidance) অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান এবং সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করে।

৬. বৃত্তি সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে (Scholarships Strengthen Social Mobility)

- বৃত্তি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চক্র (Cycle of Poverty and Inequality) ভাঙতে সাহায্য করে।

- এটি শিক্ষার্থীদের উচ্চতর সামাজিক অবস্থানের (Upward Social Mobility) দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠন করে।

৭. বৃত্তি সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার ত্বরান্বিত করে

- বৃত্তি একটি সমতা আনয়নকারী (Equaliser) হিসেবে কাজ করে, যা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিক্ষার্থীদের একই স্তরে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেয়।
- এটি নিশ্চিত করে যে শিক্ষার্থীর জন্মস্থান বা অর্থনৈতিক অবস্থার উর্ধ্বে উঠে কেবল মেধার আবিষ্কার ও পরিচর্যা (Merit Discovery and Nurturance) করা হয়, যা শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার সুদৃঢ় করে।

ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধিক ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি কোনো আধুনিক উদ্ভাবন নয়—এটি একটি সভ্যতাগত মূল্যবোধ (Civilisational Value)। তক্ষশীলা এবং নালন্দার মতো বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো শিক্ষার্থীকেই সম্পদের অভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হতো না। প্রাচীন এই ব্যবস্থায় অর্থ প্রদানের একাধিক নমনীয় পথ (Flexible Pathways) ছিল:

- সক্ষমদের জন্য: সরাসরি অগ্রিম অর্থ প্রদান।
- শ্রমদান: টিউশন ফি হিসেবে শিক্ষকের সাথে কাজ করা এবং শেখা।
- শিক্ষা-পরবর্তী অবদান: জীবিকা নিশ্চিত করার পর শিক্ষালয়কে অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া।
- সামাজিক ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা: দূরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রদায় বা রাজাদের পক্ষ থেকে সহায়তা।

এর মূল নীতি ছিল "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম" (বিদ্যা বিনয় দান করে)—অর্থাৎ কোনো সক্ষম শিক্ষার্থী যেন বস্তগত দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। একে রাষ্ট্র এবং শিক্ষিত সমাজের একটি "ধার্মিক বাধ্যবাধকতা" (Dharmic Obligation) হিসেবে গণ্য করা হতো।

বর্তমান বৃত্তি কাঠামোর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বেশ কিছু কাঠামোগত ঘাটতি (Structural Gaps) এই ব্যবস্থার রূপান্তরকারী সম্ভাবনাকে ব্যাহত করছে:

- বার্ষিক নবায়নের বাধ্যবাধকতা (Transactional, Annual Renewals): বেশিরভাগ ক্ষিমেই প্রতি বছর পুনরায় আবেদন করতে হয়, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক উদ্বেগ এবং প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করে।
- সংকীর্ণ পরিধি (Narrow Scope): অধিকাংশ বৃত্তি কেবল টিউশন ফি কভার করে। কিন্তু আবাসন, খাদ্য, ডিজিটাল ডিভাইস এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো "লুকানো খরচ" (Hidden Costs) গুলো উপেক্ষা করা হয়, যা অনেক সময় ড্রপআউটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- তথ্যের অসামঞ্জস্য (Information Asymmetry): এনএসপি (NSP) থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী সচেতনতার অভাব এবং ডিজিটাল নিরক্ষরতার কারণে এই সুযোগগুলো সম্পর্কে জানতে পারে না।
- পরামর্শদাতার অভাব (Absence of Mentorship): প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য কেবল আর্থিক সাহায্য যথেষ্ট নয়; অপরিচিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের সামাজিক ও একাডেমিক নির্দেশনার (Mentorship) প্রয়োজন।
- বেসরকারি খাতের কম অংশগ্রহণ (Private Sector Underengagement): বিশ্ববাজারের তুলনায় ভারতীয় কর্পোরেটগুলো সিএসআর (CSR) তহবিলের মাধ্যমে শিক্ষা খাতে অনেক কম বিনিয়োগ করে। দাতা-নির্ভর বৃত্তির কাঠামোটি এখনও বেশ দুর্বল।
- তথ্যের অভাব (Data Deficits): বৃত্তির ফলাফল—যেমন গ্র্যাজুয়েশন হার বা কর্মসংস্থানের হার—ট্র্যাকিং করার সঠিক ব্যবস্থা নেই, যা তথ্য-ভিত্তিক নীতি (Evidence-based Policy) প্রণয়নে বাধা দেয়।

সরকারি উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবন

- **ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল (NSP):** এটি একটি একক-উইন্ডো ইন্টারফেস (Single-window Interface) হিসেবে কাজ করে, যা আবেদন এবং অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।
- **পিএম-ইউএসপি (PM-USP) যোজনা:** বার্ষিক ৪.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কারী পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি শিক্ষা ঋণের ওপর সম্পূর্ণ সুদ ভর্তুকি (Full Interest Subsidy) প্রদান করে।
- **প্রগতি ও সক্ষম (PRAGATI & SAKSHAM):** এআইসিটিই (AICTE) পরিচালিত এই স্কিমগুলোর মধ্যে প্রগতি কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে এবং সক্ষম বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেয়।
- **ন্যাশনাল মিনস-কাম-মেরিট স্কলারশিপ (NMMSS):** এটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ১২,০০০ টাকা প্রদান করে ড্রপআউট রোধে এবং উচ্চশিক্ষার ফিডার (Feeder) হিসেবে কাজ করে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেষ্ঠত্ব**
 - **অশোকা ইউনিভার্সিটি (Ashoka University):** তারা একটি আর্থিক অবস্থা-সংবেদনশীল (Need-sensitive) ভর্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। বর্তমানে তাদের প্রায় ২০% শিক্ষার্থী ১০০% বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করছে।
 - **ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (ISB) মডেল:** আইএসবি একটি শক্তিশালী দাতা-সমর্থিত ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে। তাদের নতুন পিজিপি-ইয়ং লিডারস (PGP-Young Leaders) প্রোগ্রামের ৪০% শিক্ষার্থী বৃত্তির মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত।

নিচে আপনার প্রদান করা তথ্যের একটি নির্ভুল, সংক্ষিপ্ত এবং সাবলীল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

বৈশ্বিক শ্রেষ্ঠ অনুশীলন

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বহু-বর্ষীয় সহায়তা প্যাকেজ (Multi-year Aid Packages) প্রদান করে। হার্ভার্ড বা ইয়েলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো "নিড-ব্লাইন্ড" (Need-Blind) ভর্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, যেখানে মেধা থাকলে অর্থের অভাব পড়ার পথে বাধা হয় না।
- **চীন:** স্থানীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রাদেশিক ও শহর-ভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করে। যেমন- কোনো শহরে প্রকৌশলীর অভাব থাকলে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়।
- **ব্রাজিল:** তাদের PROUNI প্রোগ্রাম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিম্ন আয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়, যা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের একটি বড় উদাহরণ।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

- **বহু-বর্ষীয় আর্থিক নিরাপত্তা ও আইনি অধিকার:** বার্ষিক নবায়নের বদলে ৩-৫ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত বৃত্তি দিতে হবে। একটি "জাতীয় বৃত্তি অধিকার আইন" (National Scholarship Rights Act) প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে বৃত্তি কেবল দয়া নয়, বরং আইনি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **অঞ্চল ও আকাজক্ষা-ভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ:** বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে, যাতে মেধা স্থানীয় স্তরেই বিকশিত হতে পারে।
- **দানশীলতার জন্য আর্থিক কাঠামো:** শিক্ষা খাতে কর্পোরেট বিনিয়োগ বাড়াতে বিশেষ কর ছাড় (Tax Incentives) দিতে হবে। একটি "জাতীয় শিক্ষা এনডাউমেন্ট ফান্ড" গঠন করা জরুরি যা বার্ষিক বাজেটের ওপর নির্ভরশীল হবে না।
- **সামগ্রিক সহায়তা ব্যবস্থা:** বৃত্তির সাথে পরামর্শ (Mentorship), ক্যারিয়ার গাইডেন্স এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তাক অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও উদীয়মান প্রযুক্তি:** যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সফলভাবে শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েশন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে, তাদের NIRF/NAAC র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) বা গ্রিন এনার্জির মতো নতুন ক্ষেত্রে বিশেষ বৃত্তি চালু করতে হবে।

- **রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড:** একটি ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে হবে যা শিক্ষার্থীদের ভর্তি থেকে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত গতিবিধি ট্র্যাক করবে এবং তথ্যের ভিত্তিতে নীতি পরিবর্তন করবে।

উপসংহার

বৃত্তি হলো সাম্য (Equity), গুণমান (Quality) এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধির (Growth) সংযোগস্থল। বৃত্তিকে সরকারি নীতির প্রান্তিক পর্যায় থেকে মূল কেন্দ্রে নিয়ে আসা কেবল অর্থ বরাদ্দের বিষয় নয়—এটি ভারত আগামী দিনে কেমন রাষ্ট্র হতে চায়, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়। তক্ষশীলা ও নালন্দার উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, মেধা যেন কখনও অর্থের অভাবে হারিয়ে না যায়।

Q. Scholarships are not merely financial aid but instruments of social transformation. Elaborate with suitable examples. 15 Marks

2.1.9. নির্বাচনী প্রাণবন্ততা: ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় উচ্চ ভোটার উপস্থিতির বিশ্লেষণ

ভূমিকা

- সম্প্রতি ভারত তার গণতান্ত্রিক চেতনার এক শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে — আসাম, পুদুচেরি এবং কেরালা তাদের নির্বাচনী ইতিহাসে সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতির অন্যতম নজির গড়েছে। এটি পুনরায় নিশ্চিত করে যে, নাগরিকরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে জড়িত।
- তবে, এই একই নির্বাচনী চক্রে ভোটার তালিকার সততা, সম্ভাব্য ভোটাধিকার বঞ্চিত হওয়া, এবং ভোটার তালিকা পরিমার্জন ও প্রতিটি নাগরিকের ভোটার অধিকার রক্ষার মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে — যা একটি গণতন্ত্র উপেক্ষা করতে পারে না।



প্রেক্ষাপট: আসলে কী ঘটেছিল?

- **উপস্থিতির পরিসংখ্যান (Turnout Figures):** পুদুচেরি ৯১.২৩% ভোটার উপস্থিতি নিয়ে শীর্ষে ছিল (একটি ঐতিহাসিক উচ্চতা); এর পরেই ছিল আসাম ৮৫.৯১% (সর্বকালের রেকর্ড) এবং কেরালা ৭৮.২৭% (প্রায় সর্বোচ্চ)।
- **ভোটার তালিকা সংশোধন (Electoral Roll Revision):** নির্বাচনের আগে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর ফলে পুদুচেরিতে ভোটার সংখ্যা ৭.৫% হ্রাস পায়, কেরালায় ৩.২% এবং আসামে (NRC প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত বিশেষ সংশোধনের অধীনে) ভোটার সংখ্যা ১%-এরও কম হ্রাস পায়।
- **নির্বাচন কমিশনের প্রতিক্রিয়া (ECI's Response):** মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এই উচ্চ ভোটার উপস্থিতিকে কেবল ভারতের জন্য নয়, সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য একটি 'ঐতিহাসিক সাক্ষ্য' (Historic Testimony) হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই বক্তব্য যেমন প্রাতিষ্ঠানিক গর্ব প্রতিফলিত করে, তেমনি এই সংখ্যার নেপথ্যে প্রকৃত কারণগুলো খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তাও তৈরি করে।

ভোটারের গুরুত্ব — কেন প্রতিটি ভোট মূল্যবান

১. **ভোটদান শাসনব্যবস্থাকে বৈধতা দেয় (Legitimises Governance):** জনগণের সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) নীতি—অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা শাসিতের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল—কেবল ভোটদানের মাধ্যমেই কার্যকর হয়।
 - 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স' (IDEA)-এর মতে, যেসব দেশে ভোটার উপস্থিতির হার বেশি, সেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস (Public Trust) বেশি থাকে। যখন আসামে ৮৫.৯১% ভোট পড়েছিল, তখন এটি কেবল কোনো একটি দলের প্রতি নয়, বরং সামগ্রিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি গণসমর্থন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

২. **ভোটদান অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে (Inclusive Representation):** গণতন্ত্রে যদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন—নারী, অভিবাসী বা আদিবাসী জনগণের ভোটের হার কম হয়, তবে তা নীতি নির্ধারণে **অন্ধবিন্দু বা ক্রটি (Policy Blind Spots)** তৈরি করে।
- আসামে বিপুল সংখ্যক **পরিযায়ী শ্রমিক (Migrant Workers)** ভোট দেওয়ার জন্য তাদের নিজ নির্বাচনী এলাকায় ফিরে গিয়েছিলেন; এটি একটি বড় প্রমাণ যে **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ** অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাকেও ছাপিয়ে যায়। এটি বেলজিয়াম বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে **বাধ্যতামূলক ভোটদান (Compulsory Voting)** সকল সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে।
 - উচ্চ ভোটার উপস্থিতি ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ (Check on Incumbency):** ভোটার অংশগ্রহণ একটি **গণতান্ত্রিক অডিট ব্যবস্থা** হিসেবে কাজ করে। কেরালা, আসাম ও পুদুচেরি—এই তিন রাজ্যেই ক্ষমতাসীন দল উচ্চ উপস্থিতিতে **আস্থার ভোট (Vote of Confidence)** হিসেবে দাবি করেছে, অন্যদিকে বিরোধীরা একে **পরিবর্তনের ঢেউ (Surge for Change)** হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।
 - এই ব্যাখ্যামূলক প্রতিযোগিতা ইতিবাচক—এর অর্থ হলো ক্ষমতার চাবিকাঠি অভিজাতদের হাতে নয়, বরং **ভোটারদের হাতে**। ভারতের সংবিধানের ধারা ৩২৬ (Article 326) 'সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার' নিশ্চিত করে এবং প্রতিটি উচ্চ-উপস্থিতির নির্বাচন এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করে।
৪. **উপস্থিতি নাগরিক সচেতনতার প্রতিফলন (Civic Consciousness):** কেরালার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, পশ্চিম এশিয়ায় বসবাসরত **প্রবাসী ভোটাররা (Diaspora)** যুদ্ধের কারণে আসতে না পারলেও ভোটদানের হার ঐতিহাসিকভাবে বেশি ছিল। এটি প্রমাণ করে যে অভ্যন্তরীণ ভোটাররা অভূতপূর্ব সংখ্যায় এগিয়ে এসেছেন, যা গভীর **নাগরিক সচেতনতা** প্রকাশ করে।
৫. **ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে ভোটদান:** আশ্চর্যজনকভাবে, ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR process) থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কাই হয়তো অনেক নাগরিককে সক্রিয়ভাবে তাদের নাম নিশ্চিত করতে এবং ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।
- এটি একটি শক্তিশালী দিক—বাদ পড়ার **হুমকি** নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি **মালিকানা বোধ (Sense of Ownership)** বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৫২ সালে ভারতের ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪৫.৭%, যা বর্তমানে নিয়মিত ৬৫-৭০%-এর উপরে থাকে, যা দেশের গণতান্ত্রিক পরিপক্বতার (Democratic Maturity) পরিচায়ক।

চ্যালেঞ্জসমূহ — উচ্চ ভোটার উপস্থিতি সত্ত্বেও যখন গণতন্ত্র বিদ্রোহিত হয়

- ভোটার তালিকার সংকোচন এবং ভোটাধিকার হরণের ভয়:** ভুয়া ভোটার বা দ্বৈত নাম বাদ দেওয়া বৈধ কাজ হলেও, পুদুচেরিতে ৭.৫% এবং কেরালায় ৩.২% ভোটারের নাম **আগ্রাসীভাবে ছাঁটাই (Aggressive Purging)** করা প্রকৃত ভোটারদের বাদ পড়ার ঝুঁকি বাড়ায়। ভোটার সংখ্যা কমে গেলে গাণিতিকভাবে উপস্থিতির হার **কৃত্রিমভাবে বেড়ে (Artificially Inflates)** যায়, যা প্রকৃত জনঅংশগ্রহণের প্রতিফলন নাও হতে পারে।
- আসামে এনআরসি (NRC) সংক্রান্ত উদ্বেগ:** আসামে **এনআরসি (National Register of Citizens)** প্রক্রিয়ার কারণে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ নাগরিকত্ব থেকে বাদ পড়েছেন। সেখানে ভোটদান কেবল নাগরিক অধিকার নয়, বরং নিজেদের **অস্তিত্ব বা পরিচয়ের এক মরিয়া লড়াই (Desperate Assertion of Belonging)**। এখানে অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক উৎসাহের চেয়ে **ভীতি (Fear)** দ্বারা বেশি চালিত হতে পারে।
- নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা:** নির্বাচন কমিশন (ECI) বর্তমানে বিভিন্ন সমালোচনার মুখে পড়ছে—যেমন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় দেরি, ভোটার তালিকা ব্যবস্থাপনায় ক্রটি এবং SIR বাস্তবায়ন। উচ্চ ভোটার উপস্থিতিতে এই **প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলোর (Institutional Concerns)** আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- পরিযায়ী ভোটারদের বঞ্চনা:** আসামের পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে আসতে পারলেও, কেরালার প্রবাসীরা ভূ-রাজনৈতিক কারণে ভোট দিতে পারেননি। ফ্রান্স বা এস্টোনিয়ার মতো ভারতে এখনও কোনো শক্তিশালী **অনলাইন ভোটিং (E-voting)** বা **প্রক্সি ভোটিং (Proxy Voting)** ব্যবস্থা নেই। **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ (RPA 1950)** প্রবাসীদের নিবন্ধনের অনুমতি দিলেও ভোট দেওয়ার জন্য **শারীরিক উপস্থিতি (Physical Presence)** এখনও বাধ্যতামূলক, যা একটি বড় কাঠামোগত অভাব।

৫. **অর্থের প্রভাব এবং নির্বাচনী কারচুপি:** উচ্চ ভোটার উপস্থিতি মানেই যে নির্বাচন **অবাধ ও সুষ্ঠু (Free and Fair)** তা নয়। ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এখনও ভোটারদের **প্রলোভন (Inducement)** দেখানো, নগদ টাকা ও উপহার বিতরণ এবং ভীতি প্রদর্শনের মতো ঘটনা ঘটে। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন প্রায় **১০,০০০ কোটি টাকার** নগদ ও উপহার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে, যা **নির্বাচনী সততার (Electoral Integrity)** সংকটের দিকে আঙুল তোলে।
৬. **সীমানা নির্ধারণ (Delimitation) ও নারী সংরক্ষণ:** আসন্ন সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া এবং লোকসভা ও বিধানসভায় **৩৩% নারী সংরক্ষণ (১০৬তম সংবিধান সংশোধন আইন, ২০২৩)** বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারচুপির ঝুঁকি থাকে। যদি ভোটার গোষ্ঠীগুলোকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ভাগ করা হয়, তবে উচ্চ ভোটার উপস্থিতি সত্ত্বেও গণতন্ত্রের প্রকৃত ফলাফল **বৈষম্যমূলক (Representational Distortion)** হতে পারে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন — ভারতের জন্য শিক্ষণীয়

- **স্বয়ংক্রিয় ভোটার নিবন্ধন (Automatic Voter Registration - কানাডা, আমেরিকা):** কানাডার মতো দেশগুলোতে নাগরিকরা যখন সরকারি পরিষেবা (যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স) গ্রহণ করেন, তখন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হন। এটি ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় ভুলবশত বাদ পড়ার ঝুঁকি কমায়। ভারত **আধার-লিঙ্কড স্বয়ংক্রিয় ভোটার নিবন্ধন** ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে।
- **স্বাধীন নির্বাচন কমিশন (Independent Election Commissions - দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন):** দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচন কমিশন বহুদলীয় সংসদীয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কার্ঠামোগত স্বাধীনতা বজায় রাখে। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন হলেও, কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। **নির্বাচন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৩**-এর পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- **প্রবাসীদের জন্য রিমোট এবং ই-ভোটিং (Remote & e-Voting - এস্তোনিয়া, ফ্রান্স):** এস্তোনিয়া ২০০৫ সাল থেকে **ইন্টারনেট-ভিত্তিক ভোটিং (i-voting)** চালু করেছে। ভারতের ১৩ মিলিয়নেরও বেশি অনাবাসী ভারতীয়দের (NRIs) জন্য নিরাপদ ই-ভোটিং **প্ল্যাটফর্ম** পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা যেতে পারে।
- **নাগরিক শিক্ষা কার্যক্রম (Civic Education - ফিনল্যান্ড, জাপান):** ফিনল্যান্ড স্কুল পাঠ্যক্রমেই নির্বাচনী সাক্ষরতা অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতের **SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation)** কর্মসূচিটি প্রশংসনীয়, তবে গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকায় এর প্রসার আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ — এই গতিশীলতাকে কাজে লাগানো

১. **ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার সংস্কার:** নির্বাচন কমিশনকে **'অন্তর্ভুক্তি' (Inclusion)** অগ্রাধিকার দিতে হবে। যথাযথ নোটিশ এবং আপিল করার সুযোগ ছাড়া কোনো ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।
২. **সীমানা নির্ধারণে সাংবিধানিক সুরক্ষা:** আসন্ন সীমানা নির্ধারণ (Delimitation) প্রক্রিয়াটি একটি স্বাধীন কমিশনের নেতৃত্বে হতে হবে, যেখানে স্বচ্ছ পদ্ধতি এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) থাকবে।
৩. **নারী সংরক্ষণ কার্যকর করা:** ৩৩% নারী সংরক্ষণ যেন কেবল সংখ্যার পরিবর্তন না হয়। নির্বাচিত নারীরা যাতে কারও 'প্রত্নি' হিসেবে কাজ না করে প্রকৃত **রাজনৈতিক কর্তৃত্ব (Political Agency)** চর্চা করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।
৪. **রিমোট ভোটিং-এর পাইলট প্রকল্প:** পরিয়ায়ী শ্রমিক এবং প্রবাসীদের (NRIs) জন্য **সাইবার নিরাপত্তা** নিশ্চিত করে ই-ভোটিং ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা উচিত।
৫. **কার্ঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে আস্থা পুনরুদ্ধার:** **অনুপ বার্নওয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০২৩)** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করতে হবে।
৬. **নির্বাচনী সাক্ষরতা বৃদ্ধি:** উচ্চ ভোটার উপস্থিতিতে আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই। শহুরে ভোটারদের উদাসীনতা কাটাতে এবং সচেতনতা বাড়াতে **SVEEP** উদ্যোগকে জাতীয় পর্যায়ে আরও বড় মাপে ছড়িয়ে দিতে হবে।

উপসংহার

২০২৬-এর নির্বাচনে রেকর্ড ভোটের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, ভারতীয় নাগরিকরা **ব্যালট বক্সকে** পরিবর্তন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত হাতিয়ার হিসেবে দেখেন। দেশ যখন সীমানা নির্ধারণ এবং লিঙ্গ সমতার নতুন যুগে পদার্পণ করছে, তখন লক্ষ্য হতে হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রতিটি নাগরিকের জন্য আরও **অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং সহজলভ্য** করে তোলা।

Q. High voter turnout is a necessary but not sufficient condition for a healthy democracy. Critically examine in the context of electoral integrity and governance in India. 15 Marks

2.1.10. সীমাহীন নির্বাহী ক্ষমতা: প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ বিতর্ক

ভূমিকা

- সম্প্রতি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জিত হয়েছে—রাষ্ট্রীয় ও কেন্দ্রীয় স্তরে টানা **৮,৯৩১** দিন নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে কাজ করার দীর্ঘতম মেয়াদের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।
- এই ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিতর্ককে পুনরুজ্জীবিত করেছে: যেখানে আলঙ্কারিক প্রধান হিসেবে **রাষ্ট্রপতির** ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিকভাবে **দুই মেয়াদের সীমাবদ্ধতা** রয়েছে, সেখানে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী **প্রধানমন্ত্রীর** ক্ষেত্রে এমন কোনও বিধিনিষেধ নেই।
- এই বৈষম্য বা **অসামঞ্জস্য (Asymmetry)** গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সুস্থতা এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী প্রাণশক্তি নিয়ে জরুরি প্রশ্ন উত্থাপন করে।



মূল ভারসাম্যহীনতা: রাষ্ট্রপতি বনাম প্রধানমন্ত্রী

ভারতের সংবিধান তার সর্বোচ্চ দুটি নির্বাহী পদের মধ্যে একটি লক্ষণীয় ভারসাম্যহীনতা প্রতিফলিত করে। **ধারা ৫২ থেকে ৬২-এর** অধীনে রাষ্ট্রপতি মূলত একজন আলঙ্কারিক প্রধান। তিনি কেবল সাংবিধানিক বিধান নয়, বরং একটি অনানুষ্ঠানিক কিন্তু ব্যাপকভাবে স্বীকৃত **'দুই মেয়াদের প্রথা'** দ্বারা পরিচালিত হন।

- এর বিপরীতে, প্রধানমন্ত্রী—যাঁর পদের ক্ষমতা মূলত **ধারা ৭৪ এবং ৭৫** থেকে উদ্ভূত (যেখানে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রী পরিষদের বিধান রয়েছে)—তিনিই **প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা** প্রয়োগ করেন।
- লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচ বছর (পুনর্নির্বাচনের যোগ্যতা সহ), কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের ওপর কোনও **সুস্পষ্ট সাংবিধানিক সীমা** আরোপ করা হয়নি।
- ফলস্বরূপ, যতদিন লোকসভায় সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে, প্রধানমন্ত্রী অনিদিষ্টকাল পদে বহাল থাকতে পারেন, যা সাংবিধানিক কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যকে আরও শক্তিশালী করে।

ক. রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে অনুসৃত প্রথা

- আইভর জেনিংস টেস্ট (Ivor Jennings Test):** রাষ্ট্রপতির তৃতীয় মেয়াদের বিরুদ্ধে এই প্রথাটি তিনটি শর্ত পূরণ করে—একটি নজির থাকতে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তা পালনে বাধ্য অনুভব করতে হবে এবং এর পেছনে একটি স্পষ্ট সাংবিধানিক কারণ থাকতে হবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্তই রক্ষিত হয়েছে।
- আইনি বাধা ছাড়াই শক্তিশালী নৈতিক শক্তি:** সংবিধানের **ধারা ৫৭** রাষ্ট্রপতি হিসেবে আনলিমিটেড বা সীমাহীন পুনর্নির্বাচনের অনুমতি দিলেও ১৯৫০ সালের পর থেকে কোনও রাষ্ট্রপতিই তৃতীয় মেয়াদের চেষ্টা করেননি। এখানে **সাংবিধানিক নৈতিকতা (Constitutional Morality)** একটি কার্যত 'টার্ম লিমিট' বা মেয়াদের সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করেছে।

- ঐতিহাসিক রেকর্ড: ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ দুই পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর থেকে কোনও ব্যক্তিই এই অনানুষ্ঠানিক সীমা অতিক্রম করেননি।

খ. প্রধানমন্ত্রীর পদের বাস্তবতা

- পরিকল্পিত সীমাহীন মেয়াদ: ধারা ৭৪ এবং ৭৫ প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রতিষ্ঠা করলেও মেয়াদের কোনো উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করেনি। একমাত্র শর্ত হলো লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন।
- ক্ষমতার প্যারাডক্স (The Power Paradox): যে পদের হাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা—মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ, উচ্চপদস্থ নিয়োগ এবং নীতি নির্ধারণ—সেই পদের ওপরই বিধিনিষেধ সবচেয়ে কম। এটি খসড়া তৈরির কোনো ত্রুটি নয়, বরং একটি সুচিন্তিত সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত ছিল।

মূল তথ্য (KEY FACT): ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতে ১৫ জন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘতম সময় দায়িত্ব পালনকারী প্রধানমন্ত্রীরা দুই বা ততোধিক পূর্ণ লোকসভা মেয়াদ অতিক্রম করেছেন—তবুও একবারও এই বিষয় নিয়ে সংবিধানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। এই সাংবিধানিক নীরবতাই হলো বর্তমান বিতর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য বনাম বর্তমান বাস্তবতা

সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সীমাবদ্ধতা না রাখার সিদ্ধান্তটি ছিল সুচিন্তিত। গণপরিষদ বিতর্কের (১৯৪৬-১৯৪৯) সময় যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রীকে নির্দিষ্ট মেয়াদের চেয়েও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়—আর তা হলো প্রতিদিনের সংসদীয় জবাবদিহিতা। তবে কয়েক দশকে এই যুক্তির ভিত্তি কাঠামোগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ক. মূল যুক্তি: দৈনিক বনাম সাময়িক জবাবদিহিতা

- ওয়েস্টমিনিস্টার মডেল: ভারত ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করেছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকেন যতক্ষণ আইনসভার আস্থা বজায় থাকে। তাত্ত্বিকভাবে এটি নির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি 'দৈনিক নিয়ন্ত্রণ' হিসেবে কাজ করে।
- বি.আর. আম্বেদকরের পার্থক্য: তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর কেবল নির্বাচনের মাধ্যমে সাময়িক মূল্যায়ন নয়, বরং সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- জবাবদিহিতার তিনটি হাতিয়ার: প্রণেতারা তিনটি উপায়ের কথা ভেবেছিলেন: (ক) সংসদে প্রশ্ন ও সম্পূরক প্রশ্ন, (খ) মূলতর্কিত প্রস্তাব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ, এবং (গ) লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব।
- অভ্যন্তরীণ দলীয় নিয়ন্ত্রণ: ব্রিটেন বা ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যবস্থায় শাসক দলের সদস্যরা তাদের নেতাকে পদচ্যুত করতে পারেন (যেমন: মার্গারেট থ্যাচার বা বরিস জনসনের ক্ষেত্রে হয়েছে)। ভারতেও এমন স্ব-সংশোধনকারী ব্যবস্থার প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

খ. কেন এই যুক্তি সময়ের সাথে দুর্বল হয়েছে?

- আইনসভার ওপর নির্বাহীর আধিপত্য: বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাই এখন সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদীয় অধিবেশন আগের চেয়ে ছোট হয়ে আসছে এবং যথাযথ পর্যালোচনার (Scrutiny) সুযোগ কমছে।
- জোটগত জবাবদিহিতার পতন: আগে কোয়ালিশন সরকার সমঝোতায় বাধ্য করত, কিন্তু বর্তমানে একক দলের আধিপত্য আইনসভার দরকষাকষির ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে।
- দলীয় গণতন্ত্রের অভাব: ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত, যেখানে ক্ষমতা কেবল শীর্ষ নেতৃত্বের হাতেই কুক্ষিগত থাকে।

দলত্যাগ বিরোধী আইন — যেভাবে জবাবদিহিতা ভেঙে পড়েছে

১৯৮৫ সালের ৫২তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত দশম তফশিল (দলত্যাগ বিরোধী আইন) সংসদীয় জবাবদিহিতার চিত্র বদলে দিয়েছে। রাজনৈতিক কেনাবেচা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হলেও, এর একটি অনিচ্ছাকৃত নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে: এটি আইনপ্রণেতাদের পক্ষে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করানো আইনত অসম্ভব করে তুলেছে।

ক. দলত্যাগ বিরোধী আইন কীভাবে কাজ করে

- **মূল নিয়ম:** কোনো আইনপ্রণেতা যদি দলের নির্দেশ বা 'হুইপ' (Whip) অমান্য করে ভোট দেন বা অনুপস্থিত থাকেন, তবে তার সদস্যপদ খারিজ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্পিকার বিচারকের ভূমিকা পালন করেন।
- **আয়া রাম গয়া রাম রাজনীতি:** ১৯৬৭-৮৫ সালের মধ্যে দলবদলের কারণে ঘনঘন সরকার পতনের সংস্কৃতি বন্ধ করতে এই আইন আনা হয়।
- **সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ:** 'কিহোটো হোল্লোহান বনাম জাচিলু' (১৯৯২) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই আইনকে বৈধ ঘোষণা করলেও জবাবদিহিতার ওপর এর প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে।
- **অনিচ্ছাকৃত ফল:** শাসক দলের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে **অনাস্থা প্রস্তাব** এখন কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে।

খ. আনুগত্যের 'ডাবল লক' (Double Lock)

এই ব্যবস্থার ফলে নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে:

- **লক ১ — দলের প্রতি বাধ্যবাধকতা:** দলত্যাগ বিরোধী আইনের ভয়ে সংসদ সদস্যরা কোনও আস্থার ভোটে নিজের বিবেক অনুযায়ী ভোট দিতে পারেন না।
- **লক ২ — নেতার প্রতি দলের বাধ্যবাধকতা:** দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র না থাকায় সদস্যরা তাদের নেতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। ফলে নেতা দলের ভেতরে ও বাইরে—উভয় দিক থেকেই **অপরায়ে** হয়ে ওঠেন।
- **ব্রিটেনের সাথে বৈপরীত্য:** ব্রিটেনে দলত্যাগ বিরোধী আইন নেই, তাই সেখানে দলের সদস্যরাই প্রধানমন্ত্রীকে সরাতে পারেন। ভারতের ব্যবস্থায় এই **অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার অভাব** রয়েছে।

তথ্যচিত্র (Data Point): ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ভারতে ৩২টি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৫ সালের পর, লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা কোনও সরকারই অনাস্থা ভোটে হারেনি। সর্বশেষ সফল অনাস্থা ভোট ছিল ১৯৭৯ সালে (জনতা পার্টি সরকার)।

গণতান্ত্রিক জনাদেশ বিপ্লব: নির্বাচনী বৈধতার সীমাবদ্ধতা

মেয়াদের সীমাবদ্ধতা (Term Limits) আরোপের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তিটি হলো: যদি ভোটাররা বারবার একই নেতাকে বেছে নেন, তবে সংবিধান কেন তাঁদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করবে? এই বিতর্কের গভীরে গেলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়:

- **ভোটারদের সার্বভৌমত্ব (Voter Sovereignty):** বারবার নির্বাচনী জয় সংখ্যাগরিষ্ঠের **গণতান্ত্রিক ইচ্ছারই** প্রতিফলন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, মেয়াদের সীমা নির্ধারণ করা একটি অভিভাবকসুলভ (Paternalistic) বা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত।
- **নির্বাচনের ওপর অতিরিক্ত চাপ:** যখন দৈনন্দিন সংসদীয় জবাবদিহিতা ভেঙে পড়ে, তখন **নির্বাচনই** হয়ে ওঠে একমাত্র নিয়ন্ত্রক। পাঁচ বছরে মাত্র একবার ঘটা একটি প্রক্রিয়ার পক্ষে শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা এক অবাস্তব প্রত্যাশা।
- **অসম নির্বাচনী ক্ষেত্র (Unequal Playing Field):** দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সংবাদমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে **ক্ষমতাসীন দল (Incumbency)** অতিরিক্ত সুবিধা পায়। একটি অসম বা পক্ষপাতদুষ্ট ক্ষেত্রে নেওয়া 'মুক্ত পছন্দ' প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারে না।
- **সাংবিধানিক সুরক্ষা বনাম গণতন্ত্র:** ফরীদ জাকারিয়া যুক্তি দিয়েছেন যে, "সাংবিধানিক উদারনীতি ছাড়া গণতন্ত্র অনুদার ফলাফল (Illiberal Outcomes) তৈরি করতে পারে।" মেয়াদের সীমাবদ্ধতা গণতন্ত্রের ওপর কোনো বাধা নয়—বরং এটি গণতন্ত্রের **সুরক্ষাকবচ বা স্থাপত্য (Architecture)**।

দীর্ঘস্থায়ী শাসনকাল থেকে উদ্ভূত প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

যখন নির্বাহী ক্ষমতা কোনও আনুষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট পদে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা চারটি প্রধান **প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকির (Institutional Risks)** কথা উল্লেখ করেন:

- **গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ওপর নিয়ন্ত্রণ:** দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা সরকার নির্বাচন কমিশন, উচ্চতর বিচার বিভাগ, সিএজি (CAG), এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোর নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতাকে নষ্ট করে।
- **তথ্য পরিবেশের ওপর আধিপত্য:** দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলে সরকার মিডিয়া লাইসেন্সিং এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তথ্য প্রবাহকে (Information Environment) নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে।
- **ক্রমপুঞ্জিত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষয়:** আইন বিশেষজ্ঞ টম গিন্সবার্গ এবং আজিজ হুক-এর মতে, গণতন্ত্রের পতন হঠাৎ কোনও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হয় না; এটি হয় প্রতিষ্ঠানের ধীর গতির ক্ষয় বা ক্ষয়ক্ষতির (Incremental Erosion) মাধ্যমে।
- **আমলাতান্ত্রিক পরিবর্তন:** সময়ের সাথে সাথে সিভিল সার্ভিস বা আমলারা একটি নির্দিষ্ট নেতৃত্বশৈলীর প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে। তারা প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতার চেয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে।
- **ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের স্বাভাবিকীকরণ:** দীর্ঘ শাসনের ফলে নাগরিকরা ক্ষমতার এই অসীম কেন্দ্রীকরণকেই 'স্বাভাবিক' বলে ধরে নেয়। একে 'বলিং ফ্রগ' (Boiling Frog) প্রভাব বলা হয়, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি এতটাই ধীরগতিতে হয় যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের আগে তা ধরা পড়ে না।

বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন — অন্যান্য গণতন্ত্র যেভাবে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে

বড় গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে ভারত একটি ব্যতিক্রমী (Outlier) উদাহরণ, কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের ওপর কোনও আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত সীমাবদ্ধতা নেই। বৈশ্বিক ঐকমত্য এটাই যে: অসীম নির্বাহী ক্ষমতা কাঠামোগত ঝুঁকি বহন করে।

ক. আনুষ্ঠানিক মেয়াদের সীমা থাকা রাষ্ট্রপতি শাসিত প্রজাতন্ত্র

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — দুই মেয়াদ (১৯৫১ সালের ২২তম সংশোধনী):** ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের টানা চারবার মেয়াদের পর, মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ সর্বোচ্চ দুইটি চার বছরের মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা হয়।
- **দক্ষিণ কোরিয়া — একটি মাত্র ৫ বছরের মেয়াদ:** এটি বিশ্বের অন্যতম কঠোর ব্যবস্থা, যা বিশেষভাবে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির পদের অপব্যবহার রোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- **ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়া:** এই তিনটি বড় গণতান্ত্রিক দেশই নির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত ক্ষমতা চর্চার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুই মেয়াদ বা এক মেয়াদের সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে।

খ. সংসদীয় ব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা

- **যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা — দলীয় নিয়ন্ত্রণ:** এই ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যবস্থাগুলোতে আনুষ্ঠানিক মেয়াদের সীমা না থাকলেও, নেতাদের সরানোর জন্য শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্রের ওপর নির্ভর করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন দলীয় সংস্কৃতিতে এই ব্যবস্থাটি অনুপস্থিত।

ভারত কেন আলাদা: ভারতে মেয়াদের কোনও সীমা নেই, দলের ভেতরে গণতন্ত্র নেই এবং দলত্যাগ বিরোধী আইন সংসদীয় জবাবদিহিতাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই তিনটির অভাব ভারতের পরিস্থিতিতে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

আগামীর পথ — সাংবিধানিক ক্ষমতার ভারসাম্য পুনরুদ্ধার

- **দলত্যাগ বিরোধী আইনের (দশম তফশিল) সংস্কার:** অনাস্থা প্রস্তাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভোটাভুটিতে সাংসদদের ওপর থেকে 'অযোগ্যতা'র ভয় সরিয়ে নিতে হবে। এতে সাংসদরা দলের চাপের বদলে নিজস্ব বিবেক ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সরকারকে জবাবদিহি করতে পারবেন।
- **নির্বাহী পদের মেয়াদের সীমাবদ্ধতা:** প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের জন্য টানা দুই মেয়াদের সীমাবদ্ধতা এবং নির্দিষ্ট সময়ের বিরতি (Cooling-off period) প্রবর্তন করা উচিত। এটি ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ রোধ করবে এবং নতুন নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি করবে।
- **অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ:** 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১' সংশোধন করে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে নির্বাচন কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নির্বাচন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

- **রাজনৈতিক দলে স্বচ্ছতা:** দলগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। এটি জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।
- **সংসদীয় কার্যক্রমের পুনরুজ্জীবন:** সংসদের জন্য ন্যূনতম কার্যদিবস নিশ্চিত করা এবং 'ডিপার্টমেন্টাল স্ট্যান্ডিং কমিটি'গুলোকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে তারা নির্বাহী বিভাগের কাজের সঠিক তদারকি করতে পারে।
- **সাংবিধানিক নৈতিকতার প্রসার:** ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের দর্শনে সাংবিধানিক নৈতিকতা (Constitutional Morality) চর্চা বাড়তে হবে। ক্ষমতার প্রয়োগ যেন কেবল ব্যক্তিগত আধিপত্য নয়, বরং জনকল্যাণের মাধ্যম হিসেবে হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

টানা ৮,৯৩১ দিনের শাসনের এই রেকর্ডটি ভারতের জন্য একটি 'ওয়েক-আপ কল' বা সতর্কবার্তা। সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর পদের মধ্যে যে ব্যবধান, তা ঘোচানোর সময় এসেছে। প্রজাতন্ত্রের শক্তি কোনও নেতার জনপ্রিয়তার ওপর নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার ওপর নির্ভর করে।

'সাংবিধানিক নৈতিকতা কোনও সহজাত অনুভূতি নয়। এটিকে লালন করতে হয়। ভারতে গণতন্ত্র হলো ভারতীয় মাটির ওপর কেবলমাত্র একটি আলাদা আস্তরণ, যেখানে মাটির গভীরের প্রকৃতি মূলত অগণতান্ত্রিক।' — ডঃ বি.আর. আম্বেদকর

Q. The absence of term limits for the Prime Minister, combined with weakened parliamentary accountability, creates a structural imbalance in India's constitutional framework. Critically examine. 15 Marks

2.1.11. পরিচয়ের বিবর্তন: 'কেরল' থেকে 'কেরলম' নামকরণের ব্যবচ্ছেদ

ভূমিকা

কেরল রাজ্যকে 'কেরলম' (Keralam) হিসেবে পুনর্নবীকরণের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক অনুমোদন এই শব্দটির ঐতিহাসিকতা (Historicity) নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। এই উন্নয়ন মূলত মৌলিক পৌরাণিক কাহিনী, আইক্যু কেরল আন্দোলনের (United Kerala Movement) উত্তরাধিকার এবং সমসাময়িক ভাষাগত বিশুদ্ধতার (Linguistic purity) তাগিদকে স্পর্শ করে।



পরিচয়ের বিবর্তন: 'কেরল' থেকে 'কেরলম'

'কেরল' থেকে 'কেরলম'-এ এই উত্তরণ কেবল নামকরণের পরিবর্তন নয়, বরং এটি পৌরাণিক কাহিনী, ভাষাগত বিবর্তন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা গঠিত একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে প্রতিফলিত করে। এটি দেখায় যে কীভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিচয় নির্মিত এবং পুনর্ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

I. প্রাচীন ভিত্তি: পৌরাণিক কাহিনী এবং প্রাথমিক প্রমাণ

১. পৌরাণিক উৎস

- **কেরলোপত্তি (Keralolpatti)** অনুসারে, বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে এই ভূমি সৃষ্টি করেছিলেন।
- পৌরাণিক কাহিনীতে এই অঞ্চলটি **গোকর্ণম** থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই গ্রন্থগুলোতে 'কেরল' এবং 'কেরলম' উভয় শব্দই পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে (Interchangeably) ব্যবহৃত হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে কোনো একটি শব্দেরই একচেটিয়া ঐতিহাসিক প্রাধান্য ছিল না।

২. ভাষাগত ও ঐতিহাসিক শিকড়

- নামটি ‘কেরম’ (নারকেল গাছ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা এই অঞ্চলকে “নারকেল গাছের দেশ” হিসেবে প্রতীকায়িত করে।
- হারমান গুন্ডার্টের মালয়ালম অভিধানে (১৮৭২) **কেরল** এবং **কেরলম** উভয়কেই সমান বৈধ রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- অশোকের শিলালিপিতে ‘কেরলপুত্র’ (Keralaputra) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ‘কেরল’ শব্দটির প্রাচীন ব্যবহার এবং ঐতিহাসিক বৈধতা নিশ্চিত করে।

II. ১৯৫৬-পূর্ব পর্যায়: খণ্ডিত রাজনৈতিক পরিচয়

১. রাজনৈতিক কাঠামো স্বাধীনতার আগে এই অঞ্চলটি ঐক্যবদ্ধ ছিল না, বরং তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল:

- ত্রিবাকুর (Travancore)
- কোচিন (Cochin)
- মালাবার (ব্রিটিশ শাসনের অধীনে) অর্থাৎ, একটি একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে **কেরলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।**

২. ভাষাগত ও সামাজিক জটিলতা

- ত্রিবাকুরে বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য **তামিলভাষী জনসংখ্যা** ছিল।
- প্রশাসন ও সমাজে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে **মালয়ালি পরিচয় রাজনীতির** উত্থান ঘটে।
- সামাজিক স্তরবিন্যাস (যেমন: **পট্টর** বনাম **নম্বুদিরি**) গোষ্ঠীবদ্ধ পার্থক্য এবং পরিচয় গঠনে প্রভাব ফেলেছিল।

৩. স্বাধীনতার পরবর্তী অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

- সি. পি. রামস্বামী আইয়ারের অধীনে, ত্রিবাকুর ১৯৪৭ সালে একটি **স্বাধীন রাষ্ট্র** হিসেবে থাকার কথা বিবেচনা করেছিল।
- মুঘল এবং ইউরোপীয় বিজয় থেকে ত্রিবাকুরের **ঐতিহাসিক স্বায়ত্তশাসনকে** এই দাবির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, যা তৎকালীন খণ্ডিত ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতিফলন।

III. আইক্য কেরল আন্দোলন: ভাষাগত জাতিসত্তা

১. ভাষার ভিত্তি আইক্য কেরল আন্দোলন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ভূগোলের পরিবর্তে মালয়ালম ভাষাগত ঐক্যকে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে জোর দিয়েছিল। ফলে পরিচয় হয়ে ওঠে **জনগণ-কেন্দ্রিক** এবং **ভাষা-চালিত**।

২. নমনীয় নামকরণ তৎকালীন আলোচনায় ‘আইক্য কেরল’ এবং ‘আইক্য কেরলম’ উভয়ই অবাধে ব্যবহৃত হতো, যা নির্দেশ করে যে সেই সময়ে নামকরণ নিয়ে কোনো **রাজনৈতিক বিতর্ক** ছিল না।

৩. বাস্তববাদী আঞ্চলিক সিদ্ধান্ত

- পৌরাণিক দাবি সত্ত্বেও, প্রধানত **তামিলভাষী অধ্যুষিত** হওয়ায় কন্যাকুমারী এই রাজ্য থেকে বাদ পড়েছিল।
- এটি ঐতিহ্যের চেয়ে **ভাষাগত অভিন্নতাকে** (Linguistic homogeneity) অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি **বাস্তববাদী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি** তুলে ধরে।

৪. সাংবিধানিক ফলাফল রাজ্য পুনর্গঠন আইন, ১৯৫৬-এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাজ্যটি গঠিত হয়। ভারতের সংবিধানে “কেরল” (Kerala) নামটি গৃহীত হয়, যা বর্তমান নামকরণের বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে।

IV. আধুনিক সংহতি: অভিন্ন রাজনৈতিক চেতনা

১. **আন্তঃ-আঞ্চলিক ঐক্য** ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রাম, বহিরাগত আধিপত্যের প্রতিরোধ এবং **জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিজমের** উত্থান ত্রিবাকুর, কোচিন এবং মালাবারের মধ্যকার বিভাজন দূর করতে সাহায্য করেছিল। এই শক্তিগুলো একটি **অভিন্ন আঞ্চলিক চেতনা** গড়ে তোলে।

২. **রাজনৈতিক সংহতি** বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তৃণমূল পর্যায়ে **গণ-সংহতি** (Mobilisation) ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক খণ্ডিত অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠে। এটি ঐতিহাসিক সীমানা ছাড়িয়ে একটি বৃহত্তর **মালয়ালি পরিচয়** বা সত্তার একীকরণ ঘটায়।

সাংবিধানিক পদ্ধতি: ভারতে একটি রাজ্যের নামকরণ যেভাবে পরিবর্তন করা হয়

ভারতে একটি রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একটি **সুশৃঙ্খল সাংবিধানিক অনুশীলন**, যা ভারতীয় সংবিধানের ৩ নম্বর **অনুচ্ছেদ** (Article 3) দ্বারা পরিচালিত হয়। এই অনুচ্ছেদ **সংসদকে** (Parliament) যেকোনো রাজ্যের নাম, এলাকা বা সীমানা পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করে।

- **রাজ্য আইনসভা কর্তৃক উদ্যোগ:** নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত একটি **আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব** (Formal Resolution) সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানসভায় পাস করা হয় এবং এরপর তা **কেন্দ্রীয় সরকারের** কাছে পাঠানো হয়।
- **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (MHA) কর্তৃক যাচাই:** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি, যেমন— **ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB)**, **ডাক বিভাগ** এবং **সার্ভে অফ ইন্ডিয়া**-র কাছ থেকে '**অনাপত্তি শংসাপত্র**' (NOC) সংগ্রহ করে।
- **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্য আইনসভায় প্রেরণ:** ভারতের রাষ্ট্রপতি বিলটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভার কাছে তাদের **মতামত** জানার জন্য পাঠান। এই মতামতগুলি কেবল **পরামর্শমূলক** এবং সংসদের ওপর তা **বাধ্যতামূলক নয়**।
- **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংসদীয় অনুমোদন:** সংসদে একটি বিল পেশ করা হয় এবং উভয় কক্ষে তা **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়** (Simple Majority) পাস হয়। এর জন্য কোনো বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা অন্য রাজ্যগুলির অনুমোদনের **প্রয়োজন হয় না**, যা রাজ্যের নাম পরিবর্তনকে একটি **তুলনামূলক সহজ আইনি প্রক্রিয়া** হিসেবে গণ্য করে।
- **রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও সাংবিধানিক সংশোধন:** রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর, নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংবিধানের **প্রথম তফসিল** (First Schedule) আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধন করা হয়।
- **রাজ্য কর্তৃক প্রশাসনিক হালনাগাদ:** এরপর রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাদের **অফিসিয়াল সিল, গেজেট, ডিজিটাল ডেটাবেস, আইনি নথি, শিক্ষাসামগ্রী** এবং **জনসাধারণের জন্য নির্দেশিকা** বা **সাইনবোর্ডগুলো** পরিবর্তনের কাজ শুরু করে।

কেরল থেকে '**কেরলম**' নামকরণের প্রভাব

ইংরেজি ধাঁচের '**কেরল**' (Kerala) থেকে ধ্বনিগতভাবে স্থানীয় '**কেরলম**' (Keralam) নামটিতে স্থানান্তরের প্রস্তাবের গভীর প্রভাব রয়েছে।

১. ইতিবাচক প্রভাব: সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পুনরুত্থান

- **ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা:** এর মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি ইংরেজি নামটিকে **মালয়ালম উচ্চারণের** সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। এটি নামের শেষে '**অম**' (-am) প্রত্যয় যুক্ত করে **দ্রাবিড় ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে** সম্মান জানায়, যা এই ভাষার ধ্বনিগত কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- **নামকরণের ঔপনিবেশিকতা মুক্তি (Decolonization):** রাজ্যটির নাম '**কেরলম**' হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করাকে **সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা মুক্তির** একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়। এটি ঔপনিবেশিক আমলে চাপিয়ে দেওয়া বা জনপ্রিয় হওয়া ইংরেজি রূপ থেকে সরে এসে রাজ্যের নামকরণের ওপর **দেশীয় সার্বভৌমত্ব** প্রতিষ্ঠা করে।
- **আঞ্চলিক গর্ব বৃদ্ধি:** মাতৃভাষায় প্রচলিত নামটি গ্রহণ করার মাধ্যমে সরকার **আঞ্চলিক একাত্মতা** এবং **মালয়ালি পরিচয়ের** বোধকে আরও সুদৃঢ় করে। এটি ১৯৫৬ সালের **ভাষাসমূহ পুনর্গঠনের** (Linguistic Reorganization) মূল চেষ্টানাকে প্রতিফলিত করে।
- **প্রতীকী ঐক্য:** এটি রাজ্যের দাপ্তরিক ভাষা (**মালয়ালম**) এবং সাংবিধানিক পরিচয়ের মধ্যে ব্যবধান দূর করে। এর ফলে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে একটি **অভিন্ন পরিচয়** তৈরি হয়।

২. নেতিবাচক প্রভাব: প্রশাসনিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা

- **বিশাল আর্থিক বোঝা:** একটি রাজ্যের নাম পরিবর্তন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল কাজ। ধারণা করা হচ্ছে, এর খরচ কয়েকশ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ভূমি রেকর্ড, পরিচয়পত্র (আধার, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট), সরকারি স্টেশনারি এবং দাপ্তরিক সিল পরিবর্তন।
- **লজিস্টিক ও প্রশাসনিক জটিলতা:** সমস্ত ডিজিটাল ডেটাবেস এবং জাতীয় রেজিস্ট্রি জুড়ে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। রেল স্টেশন, পোস্টাল কোড এবং এয়ারপোর্ট কোড পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির (রেলওয়ে, ডাক বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন) সঙ্গে সমন্বয় করা বাধ্যতামূলক, যা সাময়িকভাবে প্রশাসনিক বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।
- **ব্র্যান্ড ভ্যালু ও বৈশ্বিক পরিচিতি:** পর্যটন (God's Own Country) এবং আয়ুর্বেদ ক্ষেত্রে 'কেরল' (Kerala) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গ্লোবাল ব্র্যান্ড। আন্তর্জাতিকভাবে 'কেরলম' (Keralam) নামে পরিবর্তন করলে ব্র্যান্ডের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। বিশ্বজুড়ে মানুষ যাতে নতুন নামটিকে একই সত্তা হিসেবে চিনতে পারে, তার জন্য একটি বড় অঙ্কের বিপণন বাজেট (Marketing Budget) প্রয়োজন হবে।
- **ঐতিহাসিক অস্পষ্টতা:** সমালোচকরা উল্লেখ করেন যে, প্রাচীন গ্রন্থ 'কেরলোংপত্তি' এবং 'অশোকের শিলালিপিতে' 'কেরল' এবং 'কেরলম' উভয় শব্দই একে অপরের পরিপূরক (Interchangeably) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই একটি শব্দ অন্যটির চেয়ে বেশি 'নির্ভরযোগ্য' কি না, তা নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ক থেকেই যায়।
- **সংখ্যালঘুদের সামাজিক-রাজনৈতিক সংহতি:** এই নাম পরিবর্তনের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মর্যাদা রক্ষা করা। মালয়ালম ভাষার বিশুদ্ধতা উদযাপন করার সময় রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে যেন তা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভাষাগত আধিপত্যবাদের (Majoritarianism) বার্তা না দেয়। সীমানা অঞ্চলের তামিল ও কন্নড়ভাষী জনগোষ্ঠী যাতে এই পরিবর্তনের ফলে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে না করে, তার জন্য নীতিনির্ধারকদের সতর্ক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

বৈশ্বিক শিক্ষা: নাম পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

একটি দেশের বা রাজ্যের নাম পরিবর্তন মূলত সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনরুদ্ধার এবং ঔপনিবেশিক তকমা বর্জনের একটি বৈশ্বিক প্রবণতা।

- **তুরস্ক থেকে তুর্কিয়ে (২০২২):** বিশ্বমঞ্চে জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে এবং ইংরেজি শব্দের অপ্রীতিকর অর্থ দূর করতে এই পরিবর্তন করা হয়। এটি জাতিসংঘের অনুমোদন এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **সোয়াজিল্যান্ড থেকে এসওয়াতিনি (২০১৮):** ঔপনিবেশিকতা-পরবর্তী পুনরুদ্ধার হিসেবে প্রাক-ঔপনিবেশিক আদি নাম ফিরিয়ে আনা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা পায়।
- **ভারতের উদাহরণ:** ওড়িশা (Odisha, ২০১১), উত্তরাখণ্ড (Uttarakhand, ২০০৬) এবং পুদুচেরি (Puducherry, ২০০৬) এর নাম পরিবর্তন সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিশুদ্ধতার সফল দৃষ্টান্ত।
- **শহরের নাম পরিবর্তন:** বোম্বাই থেকে মুম্বাই, মাদ্রাজ থেকে চেন্নাই এবং ক্যালকাটা থেকে কলকাতা—এই পরিবর্তনগুলো প্রমাণ করে যে প্রশাসনিক সমন্বয়ে সময় লাগলেও দেশীয় নাম বিশ্বজুড়ে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয়।
- **মূল শিক্ষা:** সফল নামকরণের জন্য কেবল রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, বরং সামাজিক ঐকমত্য, শক্তিশালী সাংস্কৃতিক যুক্তি এবং সুপরিকল্পিত যোগাযোগ কৌশল প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: একটি কৌশলগত রোডম্যাপ

- **সামাজিক ঐকমত্য:** নাম পরিবর্তনের আগে রাজনৈতিক দল, ভাষাগত সংখ্যালঘু এবং সুশীল সমাজের সাথে সার্থক আলোচনা করা উচিত যাতে এটি সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে থাকে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন:** আইনি নথি, ডেটাবেস এবং ডাক কোড হালনাগাদ করার জন্য একটি কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যাতে প্রশাসনিক বিঘ্ন সর্বনিম্ন হয়।

- **অন্তর্ভুক্তিমূলক ফেডারেলিজম:** এই প্রক্রিয়াকে সাংস্কৃতিক ডিকলোনাইজেশন হিসেবে দেখা উচিত, তবে তা যেন সংখ্যালঘুদের মনে কোনো শঙ্কা তৈরি না করে।
- **ব্র্যান্ড ভ্যালু রক্ষা:** নাম পরিবর্তনের আগে পর্যটন ও বিনিয়োগের ওপর প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং পুরনো ইতিবাচক ভাবমূর্তি বজায় রেখে ধীরে ধীরে নতুন নাম প্রতিষ্ঠিত করা জরুরি।
- **শিক্ষা ও সচেতনতা:** বিবর্তনশীল আঞ্চলিক পরিচয় ব্যাখ্যা করতে এই পরিবর্তনগুলো শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- **স্বচ্ছ মানদণ্ড:** ভবিষ্যতের জন্য কেন্দ্রে একটি নিরপেক্ষ মানদণ্ড তৈরি করতে হবে যা ঐতিহাসিক বৈধতা এবং প্রশাসনিক সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে কাজ করবে।

উপসংহার

কেরল থেকে ‘কেরলম’ নামকরণ একটি জীবন্ত গণতন্ত্রের পরিচয় পুনর্নির্ধারণের ক্ষমতার প্রতিফলন। তবে ঐতিহাসিক নথি অনুযায়ী উভয় শব্দেরই সমান বৈধতা রয়েছে। চূড়ান্তভাবে, এই উত্তরণটি ইতিহাসের খণ্ডিত পাঠের পরিবর্তে প্রকৃত সাংস্কৃতিক ভিত্তি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাস্তবায়নের মাধ্যমে হওয়া উচিত, যা গণতান্ত্রিক ঐকমত্যের গুণমান বজায় রাখে।

Q. Identity-driven changes like state renaming can test the stability of India's federal structure by encouraging similar demands. Critically examine. 15 Marks

2.1.12. ভারতে হেপাজতি সহিংসতা (CUSTODIAL VIOLENCE): এক পদ্ধতিগত বিচার

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক সাথানকুলাম হেপাজতি মৃত্যু মামলায় একাধিক পুলিশ কর্মীর সাজা হওয়ার ঘটনাটি বিচারবিভাগীয় জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। শক্তিশালী ফরেনসিক এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল পুলিশি ব্যবস্থা ও তদারকির গভীর পদ্ধতিগত ব্যর্থতাকেই প্রকাশ করে না, বরং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিচার বিভাগের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে।



হেপাজতি সহিংসতা (Custodial Violence) কী?

হেপাজতি সহিংসতা বলতে পুলিশ বা বিচারবিভাগীয় হেপাজতে থাকা কোনো ব্যক্তির ওপর যেকোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক আঘাত করাকে বোঝায়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- **শারীরিক নির্যাতন** যেমন মারধর এবং আক্রমণ।
- **মানসিক নির্যাতন** যার মধ্যে রয়েছে ভয় দেখানো এবং অপমান করা।
- **যৌন সহিংসতা।**
- **হেপাজতি মৃত্যু (Custodial deaths)।** বেআইনি এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও, অনেক সময় অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা এই জাতীয় কাজগুলোকে স্বীকারোক্তি আদায় বা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলে যুক্তি দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারতে হেপাজতি সহিংসতার শিকড় অনেক গভীরে এবং বিভিন্ন যুগে এর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

১. **প্রাচীন ভারত** কোটিল্যের **অর্থশাস্ত্রের** মতো গ্রন্থে অঙ্গহানি, পুড়িয়ে মারা এবং এমনকি পশুর মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। শাস্তি ছিল মূলত অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে, যেখানে ব্যক্তিগত অধিকারের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত সীমিত।

২. মধ্যযুগ মুঘল আমলে বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইন (শরিয়ত) দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বেত্রাঘাত এবং শারীরিক বলপ্রয়োগের মতো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি আইন প্রয়োগের সরঞ্জাম হিসাবে সাধারণ ছিল।
৩. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলপ্রয়োগকারী পুলিশি ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল:
 - ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন এমন একটি বাহিনী তৈরি করেছিল যার প্রধান কাজ ছিল জনগণের সেবা নয়, বরং দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা।
 - রাজনৈতিক বন্দি এবং সাধারণ কয়েদিদের প্রায়ই মারধর, অনাহার এবং নৃশংস শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো।
 - ১৮৯৪ সালের কারাগার আইন জেল কর্তৃপক্ষকে ব্যাপক স্বৈচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রদান করেছিল, যার অনেকগুলো আজও কারাগার প্রশাসনকে প্রভাবিত করছে। এই সময়টি জবাবদিহিতাহীন এক আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি তৈরি করেছিল।
৪. স্বাধীনতা-পরবর্তী আমল ১৯৪৭ সালের পর ভারত মূলত তার ঔপনিবেশিক পুলিশি এবং কারাগার কাঠামো বজায় রাখে:
 - পুলিশ ও কারাগার প্রশাসনে সংস্কার ছিল অত্যন্ত সীমিত।
 - বলপ্রয়োগকারী এবং শ্রেণিবিন্যাসগত মানসিকতা বজায় থাকে।
 - দুর্বল জবাবদিহিতা ব্যবস্থা এবং সেকেলে আইন। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও, পদ্ধতিগত স্থবিরতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিকীকরণের অভাবে হেপাজতি সহিংসতা চলতেই থাকে।

আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ

১. সাংবিধানিক বিধান

- অনুচ্ছেদ ২১: জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।
- অনুচ্ছেদ ২০(৩): নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে সুরক্ষা।
- অনুচ্ছেদ ২২: খেয়ালখুশি মতো গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষা।

২. বিচারবিভাগীয় সুরক্ষা

- ডি.কে. বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য: গ্রেপ্তার এবং আটকের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা।
- নীলাবতী বেহেরা বনাম ওড়িশা রাজ্য: ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিচারিক আইন।

৩. সংবিধিবদ্ধ সুরক্ষা

- মারধর এবং নরহত্যার বিরুদ্ধে আইপিসি (IPC)-র বিধান।
- গ্রেপ্তারের সময় সিআরপিসি (CrPC)-র সুরক্ষা কবচ।
- জোরপূর্বক আদায় করা স্বীকারোক্তিকে সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী বাতিল করা।

হেপাজতি সহিংসতার ফলাফল

১. মানবাধিকার লঙ্ঘন হেপাজতি সহিংসতা সরাসরি সংবিধান প্রদত্ত জীবন, মর্যাদা এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষার মতো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে। এটি মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ এবং সাংবিধানিক নৈতিকতা রক্ষায় রাষ্ট্রের ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করে।
২. আত্মার সংকট যখন পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তখন মানুষ সুরক্ষার বদলে পুলিশকে ভয় পেতে শুরু করে। এটি পুলিশ এবং বিচার বিভাগ—উভয়ের ওপরই জনগণের বিশ্বাস হ্রাস করে এবং বিচার ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
৩. বিচারের অবমাননা নির্যাতনের মুখে অনেক সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি কেবল যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হন। এর ফলে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যায় এবং নির্দোষ মানুষ শাস্তি পায়।
৪. আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি হেপাজতি সহিংসতার ঘনঘন ঘটনা মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতের মর্যাদাকে বিশ্ব দরবারে ক্ষুণ্ণ করে। এটি বিশেষ করে জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদের (UN Convention Against Torture) প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ তৈরি করে।

হেপাজতি সহিংসতা মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সংস্কারের দুর্বল বাস্তবায়ন:** প্রকাশ সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অনেক রাজ্য পুলিশ সংস্কার পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেনি। এর ফলে পুলিশি ব্যবস্থায় ক্রমাগত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
২. **প্রশিক্ষণ এবং ফরেনসিক সক্ষমতার অভাব:** বৈজ্ঞানিক তদন্ত কৌশলে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় পুলিশ প্রায়ই সেকেলে জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। সীমিত ফরেনসিক অবকাঠামো প্রমাণ-ভিত্তিক পুলিশিংয়ের পরিবর্তে বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীলতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।
৩. **সিসিটিভি-র মতো সুরক্ষা কবচের দুর্বল প্রয়োগ:** যদিও আদালত থানাগুলোতে সিসিটিভি (CCTV) স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে, তবুও এর বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা অকার্যকর রয়ে গেছে। এটি স্বচ্ছতা কমায় এবং হেপাজতি নির্যাতনের ঘটনাগুলো প্রমাণ করা কঠিন করে তোলে।
৪. **বিচারবিভাগীয় বিলম্ব এবং সাক্ষীদের ভয় দেখানো:** ধীরগতির আইনি প্রক্রিয়া বিচার পেতে দেরি করে, যা হেপাজতি সহিংসতার বিরুদ্ধে শান্তির ভয়কে কমিয়ে দেয়। এছাড়া, ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীরা প্রায়ই হুমকির সম্মুখীন হন, যা তাদের সাক্ষ্য দিতে নিরুৎসাহিত করে এবং মামলার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

হেপাজতি সহিংসতা নিয়ে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

১. **জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড:** জাতিসংঘ নির্যাতন প্রতিরোধ এবং হেপাজতে থাকা ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক মানবাধিকার মানদণ্ড তৈরি করেছে। অনেক দেশ বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করতে তাদের অভ্যন্তরীণ আইনগুলোকে এই মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে।
২. **ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার (UNCAT) কাঠামো:** UNCAT নির্যাতন নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির নির্দেশ দেয়। যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের মতো দেশগুলো UNCAT-এর সাথে সংগতি রেখে তাদের আইনি ব্যবস্থায় নির্যাতন-বিরোধী বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে।
৩. **উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর অনুশীলন:** উন্নত দেশগুলো পুলিশি ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দেয়:
 - **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** বলপ্রয়োগ রোধে বডি ক্যামেরা, মিরান্ডা রাইটস (গ্রেপ্তারের সময় অধিকার জানানো) এবং শক্তিশালী বিচারবিভাগীয় তদারকি ব্যবহার করা হয়।
 - **যুক্তরাজ্য:** 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফিস ফর পুলিশ কন্ট্রোল'-এর মতো স্বাধীন সংস্থাগুলো পুলিশের অপেশাদার আচরণ তদন্ত করে।
 - **জাপান:** স্বীকারোক্তি নিয়ন্ত্রণ, জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও রেকর্ডিং এবং কঠোর পদ্ধতিগত সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।

ভবিষ্যৎ পথ

১. **পুলিশ সংস্কার:** রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমাতে প্রকাশ সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলার সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। তদন্তের কাজকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে আলাদা করলে পেশাদারিত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
২. **আইনি সংস্কার:** একটি নির্দিষ্ট নির্যাতন-বিরোধী আইন হেপাজতি সহিংসতাকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং শাস্তিযোগ্য করবে। জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদ (UNCAT) অনুমোদন করলে ভারত বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে একাত্ম হতে পারবে।
৩. **প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা:** সিসিটিভি এবং বডি ক্যামেরা স্বচ্ছতা বাড়ায় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বাধা হিসেবে কাজ করে। এগুলো অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রমাণও সরবরাহ করে।
৪. **তদারকি শক্তিশালী করা:** স্বাধীন অভিযোগ কর্তৃপক্ষ পুলিশের অপেশাদার আচরণের নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC)-এর মতো সংস্থাগুলোকে আরও ক্ষমতাসালী করলে জবাবদিহিতা বাড়বে।
৫. **বিচারবিভাগীয় সতর্কতা:** অপব্যবহার রোধে আদালতকে গ্রেপ্তার এবং রিমান্ডের প্রক্রিয়াগুলো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করতে হবে। অবহেলাকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা শাস্তির ভয়কে আরও জোরদার করবে।

৬. **সক্ষমতা বৃদ্ধি:** বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক তদন্তের প্রশিক্ষণ বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরতা কমায়। মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি করলে পুলিশি ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও মানবিক আচরণ উৎসাহিত হবে।
৭. **কমিউনিটি পুলিশিং:** পুলিশ ও নাগরিকদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করলে সহযোগিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। এটি পুলিশিংকে 'বলপ্রয়োগ-ভিত্তিক' পদ্ধতি থেকে 'সেবা-ভিত্তিক' পদ্ধতিতে রূপান্তর করে।

উপসংহার

হেপাজতি সহিংসতা কেবল আইন প্রয়োগের ব্যর্থতা নয়, বরং এটি **সাংবিধানিক নৈতিকতার** এক গভীর সংকট; যেখানে রাষ্ট্র রক্ষকের পরিবর্তে অধিকার হরণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। **সাথানকুলাম হেপাজতি মৃত্যু মামলা** দেখায় যে, প্রতিষ্ঠানগুলো সাহস ও সততার সাথে কাজ করলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। তবে এমন মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রম নয়, বরং নিয়মে পরিণত হওয়া উচিত।

ভারতকে অবশ্যই একটি মানবিক এবং **অধিকার-ভিত্তিক পুলিশিং মডেলের** দিকে অগ্রসর হতে হবে, যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা হবে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং মর্যাদা ও ন্যায্যবিচার প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে।

Q. Custodial violence is a relic of colonial policing that continues to undermine the constitutional morality of modern India. In light of recent judicial developments, discuss the systemic challenges in eradicating custodial torture and suggest comprehensive reforms to transition from 'force-based' to 'rights-based' policing. 15 Marks

2.1.13. শবরীমালা মন্দির প্রবেশ মামলা এবং রিভিউ পিটিশন

শ্রেণাপট:

শবরীমালা মন্দির প্রবেশ মামলা সমসাময়িক ভারতের অন্যতম গভীর সাংবিধানিক দ্বিধা— **ধর্মীয় স্বাধীনতা** এবং **লিঙ্গ সমতা**-র মধ্যে দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। ২০১৮ সালে 'ইন্ডিয়ান ইয়ং লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম কেরালা রাজ্য' মামলার রায় শুধুমাত্র একটি মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশের অধিকার নিয়েই ছিল না; এটি ধারা ২৫-২৬-এর পরিধি, **অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ (ERP)** তত্ত্ব এবং সমাজ সংস্কারে বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলো পুনরায় সামনে এনেছে।



ধর্মনিরপেক্ষতার বিবর্তন

১. ধর্মনিরপেক্ষতার তুলনামূলক মডেলসমূহ

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ("Wall of Separation"):** এটি প্রথম সংশোধনীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; এখানে রাষ্ট্র ও ধর্ম একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। এটি **নেতিবাচক স্বাধীনতার** ওপর জোর দেয়—অর্থাৎ ধর্মীয় আচরণকে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা।
- **ফ্রান্স ("Laïcité"):** ধর্মীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে এর জন্ম; এটি ধর্মকে সম্পূর্ণ **ব্যক্তিগত বিষয়** হিসেবে গণ্য করে। রাষ্ট্র জনসমক্ষে ধর্মীয় প্রতীক (যেমন হিজাব বা বড় ক্রুশ) নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রের **সর্বোচ্চতা** বজায় রাখে।
- **ভারত ("Principled Distance"):** এটি '**সর্ব ধর্ম সমতার**' (সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা) আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র একটি '**নীতিগত দূরত্ব**' বজায় রাখে, যা সমাজ সংস্কারের জন্য (যেমন তিন তালাক নিষিদ্ধ করা) **ইতিবাচক হস্তক্ষেপে** এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদানে বাধা দেয় না।

২. ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বিবর্তন

- প্রথম পর্যায়: ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ভিত্তি
 - প্রেক্ষাপট: ব্রিটিশদের 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতির মোকাবিলা করে একটি বহুত্ববাদী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল।
 - সিদ্ধান্ত: গণপরিষদ ধর্ম ও রাষ্ট্রের 'কঠোর পৃথকীকরণ' প্রত্যাখ্যান করেছিল, যাতে অস্পৃশ্যতার মতো ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করতে রাষ্ট্র সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে।
- দ্বিতীয় পর্যায়: অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ (ERP) যুগ (১৯৫৪-১৯৮০-এর দশক)
 - শিরুর মঠ মামলা (১৯৫৪): সুপ্রিম কোর্ট অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ (ERP) তত্ত্বটি সংজ্ঞায়িত করে; রাষ্ট্র ধর্মের 'ধর্মনিরপেক্ষ' দিকগুলো (অর্থ/প্রশাসন) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে 'অপরিহার্য' আচার-অনুষ্ঠান রক্ষা করতে বাধ্য।
 - এস.আর. বোম্বাই (১৯৯৪): ৪২তম সংশোধনীকে সমর্থন করে আদালত ঘোষণা করে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর (Basic Structure) অংশ।
- তৃতীয় পর্যায়: রূপান্তরমূলক সাংবিধানিকতা (২০১৫-বর্তমান)
 - পরিবর্তন: অগ্রাধিকার এখন 'ঐতিহ্য' থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত মর্যাদা (ধারা ১৪, ১৫, ২১)-এর ওপর জোর দিচ্ছে।
 - শব্দীমালা (২০১৮): আদালত প্রতিষ্ঠা করে যে, 'সাংবিধানিক নৈতিকতা' যেকোনো অপরিহার্য আচরণের উর্ধ্বে; এখন ব্যক্তিগত অধিকার গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তুলনা: ধারা ২৫ বনাম ধারা ২৬

বৈশিষ্ট্য	ধারা ২৫	ধারা ২৬
মূল লক্ষ্য	ব্যক্তিগত অধিকার: ব্যক্তিকে রক্ষা করে।	গোষ্ঠীগত অধিকার: 'ধর্মীয় সম্প্রদায়কে' রক্ষা করে।
প্রযোজ্যতা	"সকল ব্যক্তি" জন্য (নাগরিক এবং অ-নাগরিক)।	প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার যেকোনো শাখার জন্য।
প্রাথমিক পরিধি	বিবেকের স্বাধীনতা; ধর্ম গ্রহণ, পালন ও প্রচারের অধিকার।	ধর্মীয় কার্যাবলি পরিচালনা, সম্পত্তি কেনা এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার।
সীমাবদ্ধতা	জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার।	জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য (সরাসরি অন্যান্য মৌলিক অধিকারের অধীনে নয়)।
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ	রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষমতা দেয়।	ধর্মের নিজস্ব বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করে।

অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ (ERP) তত্ত্ব

ERP তত্ত্ব হলো ভারতীয় আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত একটি বিচার বিভাগীয় হাতিয়ার, যার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কোন ধর্মীয় আচরণগুলো ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সংবিধানের ধারা ২৫ ও ২৬-এর অধীনে সংরক্ষিত।

১. উৎপত্তি ও বিবর্তন

- শিরুর মঠ মামলা (১৯৫৪): সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে, কোনো আচরণ 'অপরিহার্য' কি না তা শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের দাবির ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং ধর্মের মূল নথিপত্র ও তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে আদালত নির্ধারণ করবে।
- উদ্দেশ্য: পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান (যা সংরক্ষিত) এবং ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলি (যা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেমন আর্থিক ব্যবস্থাপনা)-এর মধ্যে পার্থক্য করা।

২. অপরিহার্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষা

একটি ধর্মীয় আচরণকে ERP হিসেবে গণ্য হতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:

- **অপরিহার্যতা (Indispensability):** এই আচারটি বাদ দিলে কি ধর্মের মৌলিক চরিত্র বদলে যাবে?
- **ধর্মীয় ভিত্তি:** আচারটি কি ধর্মের মূল গ্রন্থ বা দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের দ্বারা সমর্থিত?
- **অবিচ্ছেদ্যতা:** এটি কি কোনো গোণ বা ঐচ্ছিক আচারের বদলে একটি **মৌলিক বিশ্বাস**?

৩. বর্তমান বিচার বিভাগীয় পরিবর্তন (২০১৫-বর্তমান)

এই তত্ত্বটি এখন স্রেফ ঐতিহ্য রক্ষা নয়, বরং **সমাজ সংস্কারের** একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে:

- **আচার থেকে যুক্তি:** আগে আদালত অধিকাংশ আচারকে রক্ষা করত। এখন আদালত সেগুলোকে **সাংবিধানিক নৈতিকতার** মাপকাঠিতে বিচার করে।
- **অধিকারের সাথে দ্বন্দ্ব:** যদি কোনো আচরণ (তা 'অপরিহার্য' হলেও) **ধারা ১৪ (সমতা)** বা **ধারা ২১ (মর্যাদা)** লঙ্ঘন করে, তবে আদালত তা বাতিল করতে পারে (যেমন- শবরীমালা মামলা, তিন তালাক)।
- **উচ্চ মানদণ্ড:** সাম্প্রতিক মামলাগুলোতে (আদি শৈব শিবাচারিয়াগল) সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, প্রাক-সাংবিধানিক প্রথাগুলোও সুরক্ষা পাবে না যদি না সেগুলো ধর্মের মূল পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রভাব

১. আইনি ও বিচার বিভাগীয় প্রভাব

- **সাংবিধানিক নৈতিকতা (Constitutional Morality):** ধারা ২৫ এবং ২৬-এর অধীনে 'নৈতিকতা' শব্দটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ এখন কোনো ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত আদর্শ নয়, বরং **সাম্য, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা**-র মতো সাংবিধানিক মূল্যবোধ।
- **ERP স্ক্রুটিনি (ERP Scrutiny):** অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ (ERP) প্রমাণের মানদণ্ড আরও কঠোর করা হয়েছে। এখন কোনো আচরণকে সংরক্ষিত হতে হলে তাকে ধর্মের জন্য '**অপরিহার্য**' বা '**অনিবার্য**' হতে হবে। বৈষম্যমূলক প্রথাগুলোকে 'অনগ্রসর আচার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **ধারা ১৭-এর সম্প্রসারণ:** 'অস্পৃশ্যতা' দূরীকরণের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। শুধুমাত্র জাতপাত নয়, বরং ঋতুস্রাবের মতো **শারীরিক বা জৈবিক কারণে সামাজিক বর্জনকেও** অস্পৃশ্যতার আওতায় আনা হয়েছে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব

- **সীমিত স্বায়ত্তশাসন:** আইয়্যাপ্পা ভক্তদের 'আলাদা ধর্মীয় সম্প্রদায়' (Denomination) হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, সমতার আইন এড়ানোর জন্য কোনো গোষ্ঠী **ধারা ২৬-এর** দোহাই দিতে পারবে না।
- **প্রশাসনিক সংস্কার:** কেরালা হিন্দু প্লেসেস অফ পাবলিক ওয়ারশিপ রুলস (১৯৬৫)-এর **বিধি ৩(খ)** বাতিল করা হয়েছে, যা প্রথার নামে লিঙ্গভিত্তিক বর্জনকে আইনি বৈধতা দিত।

৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

- **বিশ্বাস বনাম আইন:** একটি গভীর ধর্মীয় সমাজে, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের বিরোধী আইনি নির্দেশ প্রায়ই জনরোষের মুখে পড়ে। ফলে বাস্তবে এই আইনগুলো কার্যকর করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
- **মেরুকরণ:** কেরালার এই রায় ব্যাপক জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল; সমালোচকরা একে সনাতন বিশ্বাসের ওপর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের '**অনুপ্রবেশ**' হিসেবে দেখেন।
- **প্রতিরোধ:** বাস্তবায়নে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের কারণে ৬০টিরও বেশি রিভিউ পিটিশন জমা পড়ে, যার ফলে বর্তমানের এই নয়জন বিচারপতির **বেঞ্চ** গঠন করতে হয়েছে।

8. 'শবরীমালা লিগ্যাসি' (The Sabarimala Legacy)

- **বিস্তৃত পর্যালোচনা:** এটি একটি 'প্যাভোরার বক্স' খুলে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এখন অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ বিষয়গুলো পরীক্ষা করতে পারছে (যেমন: মসজিদে মহিলাদের প্রবেশ, পার্সি অগ্নি মন্দিরে প্রবেশ, এবং দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ের মধ্যে মহিলাদের খৎনা বা FGM প্রথা)।
- **প্রকৃত সমতা (Substantive Equality):** বিচার বিভাগ এখন শুধু 'কাগজে-কলমে সমতা' নয়, বরং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতরে থাকা কাঠামোগত শোষণ দূর করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথ

১. সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা (Harmonious Construction)

- এমন একটি 'মধ্যপন্থা' খুঁজুন যেখানে ধারা ২৫ (ব্যক্তিগত অধিকার) এবং ধারা ২৬ (গোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন) একসাথে সহাবস্থান করতে পারে।
- ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনকে ততক্ষণই সম্মান করা উচিত যতক্ষণ না তা মানুষের মর্যাদা এবং সমতার মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করে।

২. ERP তত্ত্বের সংস্কার

- **বিচার বিভাগীয় সংঘম:** ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দেওয়ার বদলে আদালতকে এটি দেখতে হবে যে, কোনো প্রথা ক্ষতিকারক বা বৈষম্যমূলক কি না।
- **ভারসাম্যপূর্ণ অনুসন্ধান:** কোনো আচার অপরিহার্য কি না তা নির্ধারণ করতে প্রাচীন গ্রন্থের পাশাপাশি বর্তমান সমাজের 'জীবন্ত বিশ্বাস' (Living Faith) বিবেচনা করা উচিত।

৩. প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠা

- ধর্মীয় স্থানের ভেতরে থাকা কাঠামোগত পিতৃতন্ত্র এবং ঐতিহাসিক বর্জনকে নির্মূল করতে হবে।
- নিশ্চিত করতে হবে যেন 'প্রথা' শব্দটিকে বৈষম্যমূলক আচরণের রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করা না হয়।

৪. অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও আইনি পদক্ষেপ

- **রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব:** রাষ্ট্রকে কেবল আদালতের রায়ের ওপর নির্ভর না করে ধারা ২৫(২) অনুযায়ী আইনের মাধ্যমে সামাজিক সংস্কার ত্বরান্বিত করতে হবে।
- **সামাজিক সংলাপ:** ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ সংস্কারকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে সামাজিক প্রতিরোধ কমে এবং পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৫. সাংবিধানিক নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ

- নয়জন বিচারপতির বেঞ্চকে 'সাংবিধানিক নৈতিকতা'-র একটি সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞা দিতে হবে।
- এটি একটি স্থিতিশীল আইনি মানদণ্ড তৈরি করবে এবং বিচার বিভাগীয় অতি-সক্রিয়তার অভিযোগ দূর করবে।

উপসংহার

সুপ্রিম কোর্ট যখন রূপান্তরমূলক ন্যায়বিচার (Transformative Justice) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, তখন হবস-এর সামাজিক চুক্তি (Social Contract) তত্ত্ব সতর্ক করে যে—গভীর বিশ্বাসের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ সামাজিক শৃঙ্খলাকে অস্থিতিশীল করার ঝুঁকি রাখে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা 'লেভিয়াথান'-দের ওপর জোরপূর্বক ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কার চাপিয়ে দিলে সেই সাম্প্রদায়িক স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে, যা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।

Q. Judicial intervention in religious matters raises concerns of overreach as well as necessity. Discuss the challenges involved and suggest a way forward. 15 Word

2.1.14. মৃত্যুদণ্ড এবং "মধ্যপন্থা"

শ্রেণীপট

সম্প্রতি সান্তানকুলামে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় (CBI বনাম শ্রীধর) মাদুরাইয়ের একটি ট্রায়াল কোর্ট নয়জন বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে। এই রায়টি একদিকে যেমন পুলিশের বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি কঠোর বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে, অন্যদিকে এটি ভারতের আদালতগুলোর সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের "সাজা প্রদানের ফাঁদ"-কে সামনে নিয়ে এসেছে।



অন্তর্বর্তীকালীন সাজার বিবর্তনকাল

বিচার বিভাগ যখন থেকে শুধুমাত্র "যাবজ্জীবন বনাম মৃত্যুদণ্ড"—এই দুই বিকল্পের বদলে একটি ত্রি-স্তরীয় মডেলে (তিনটি বিকল্প) দিকে যাত্রা শুরু করেছে, তখন থেকেই এই "মধ্যপন্থা" বা "Middle Ground"-এর ধারণাটি গড়ে উঠেছে।

• ১৯৮০: বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য

এই মামলার মাধ্যমেই "বিরলতম থেকে বিরলতম" (Rarest of Rare) তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আদালত রায় দেয় যে, মৃত্যুদণ্ড কেবল তখনই দেওয়া উচিত যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিকল্পটি "নিশ্চিতভাবে বন্ধ" হয়ে যায়। এর ফলে যাবজ্জীবনের চেয়েও কঠোর কোনো বিকল্পের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়।

• ২০০৮: স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বনাম কর্ণাটক রাজ্য

আদালত সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি "শূন্যতা" খুঁজে পায়। দেখা যায় যে, সাধারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে অনেক ক্ষেত্রেই ১৪ বছর পর আসামির মুক্তি। আদালত তখন একটি "বিশেষ বিভাগ" বা স্পেশাল ক্যাটাগরি তৈরি করে: একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের (যেমন ২০-৩০ বছর) জন্য যাবজ্জীবন অথবা আমৃত্যু কারাদণ্ড, যেখানে কোনো সাজা কমানো বা রেহাই (Remission) পাওয়া যাবে না।

• ২০১৫: ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ভি. শ্রীহরণ

সুপ্রিম কোর্টের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ এই "মধ্যপন্থাকে" আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়, কিন্তু এর প্রয়োগের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। আদালত রায় দেয় যে, এই বিশেষ সাজা দেওয়ার ক্ষমতা কেবল হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকবে; ট্রায়াল কোর্ট বা নিম্ন আদালতগুলো এই সাজা দিতে পারবে না।

• ২০২২: মনোজ বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য

এই রায়টি সাজা প্রদানের প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়। এটি বাধ্যতামূলক করে যে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে আদালতকে আসামির লম্বাকারী পরিস্থিতি (যেমন মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক ইতিহাস) গুরুত্বের সাথে তদন্ত করতে হবে। এটি সাজার একটি সুশৃঙ্খল পথ তৈরির প্রয়োজনীয়তাকে আরও শক্তিশালী করে।

• ২০২৫: কিরণ বনাম কর্ণাটক রাজ্য

আদালত পুনরায় 'শ্রীহরণ' মামলার সীমাবদ্ধতাকে নিশ্চিত করে। পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সেশন কোর্ট বা দায়রা আদালতগুলো "১৪ বছরের কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডের মধ্যবর্তী ব্যবধান" ঘোচাতে পারবে না। এর ফলে একটি "ভাঙা মই"-এর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে মধ্যপন্থা বা মাঝখানের সাজাটি কেবল আপিল পর্যায়েই পাওয়া সম্ভব।

ট্রায়াল কোর্টের সাজা প্রদানের ক্ষমতার মূল সমস্যা

"মধ্যপন্থা" বা "Middle Ground" বিরোধভাস (The Paradox)

সাজা প্রদানের কাঠামোর এই বিরোধভাস বলতে এমন একটি আইনি শূন্যতাকে বোঝায়, যেখানে একজন বিচারককে দুটি চরম বিকল্পের (১৪ বছরের জেল অথবা মৃত্যুদণ্ড) মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়, যদিও সেখানে একটি যৌক্তিক তৃতীয় বিকল্প বিদ্যমান থাকে।

১. শাস্তির তিনটি স্তর

তাত্ত্বিকভাবে ভারতের আইনে শাস্তির তিনটি স্তর স্বীকৃত, কিন্তু যারা প্রথম প্রমাণাদি যাচাই করেন (ট্রায়াল কোর্ট), তাদের কাছে কেবল দুটি স্তর উন্মুক্ত থাকে।

- **স্তর ১: সাধারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড:** টেকনিক্যালি এটি "মৃত্যু পর্যন্ত" জেল হলেও বাস্তবে CrPC-র ৪৩৩এ ধারা অনুযায়ী ১৪ বছর পর রাজ্য সরকার সাজা কমিয়ে আসামিকে মুক্তি দিতে পারে।
- **স্তর ২: "মধ্যপস্থা":** একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (যেমন ৩০ বছর), যেখানে সাজা কমানোর কোনো সুযোগ নেই।
- **স্তর ৩: মৃত্যুদণ্ড:** অর্থাৎ ফাঁসি।

২. বিরোধভাসের প্রকৃতি

এই বিরোধভাসটি তৈরি হয়েছে ২০১৫ সালের শ্রীহরণ রায়ের **এখতিয়ারগত বাধার** কারণে:

- **ক্ষমতার ব্যবধান:** ট্রায়াল কোর্টের একজন মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা (মৃত্যুদণ্ড) আছে, কিন্তু একজনের জীবনের সীমানা নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা (রেহাই ছাড়াই নির্দিষ্ট মেয়াদের জেল) নেই।
- **হয় সব, না হয় কিছুই না:** যদি কোনো অপরাধ ১৪ বছরের সাজার জন্য অত্যন্ত জঘন্য হয়, কিন্তু আবার "বিরলতম থেকে বিরলতম" পর্যায়েও না পড়ে, তবে বিচারক ফাঁদে পড়ে যান। তিনি আইনত এই "মধ্যপস্থা" বেছে নিতে পারেন না।
- **পরিণতি:** একটি জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে মাত্র ১৪ বছরের "নরম" সাজা এড়াতে বিচারকরা অনেক সময় মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য বোধ করেন।

এখতিয়ারগত বাধা: ট্রায়াল কোর্ট বনাম সাংবিধানিক আদালত

ভারতের বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের মামলার ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ব্যবস্থা কাজ করে। যদিও উভয় স্তরের আদালতই মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে, কিন্তু "মধ্যপস্থা" বা নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড কঠোরভাবে বিভাজিত।

বৈশিষ্ট্য	ট্রায়াল কোর্ট (সেসন আদালত)	সাংবিধানিক আদালত (হাইকোর্ট/সুপ্রিম কোর্ট)
মৃত্যুদণ্ড	দিতে পারে (হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে— CrPC ৩৬৬ / BNSS ৪০৭ অনুযায়ী)।	দিতে পারে অথবা বহাল রাখতে পারে।
সাধারণ যাবজ্জীবন	দিতে পারে (১৪ বছর পর রাজ্য সরকার সাজা কমাতে পারে)।	দিতে পারে।
নির্দিষ্ট মেয়াদের যাবজ্জীবন	কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (রেহাই ছাড়া ২০, ৩০ বা ৪০ বছরের জেল দিতে পারে না)।	অনুমোদিত (রেহাই ছাড়াই "আমৃত্যু" বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জেল দিতে পারে)।

সাজা প্রদানের সংস্কারে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ভারতের সাজা প্রদানের কাঠামো বেশ কিছু কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন, যার ফলে মৃত্যুদণ্ডের মামলাগুলোতে "বিচার বিভাগীয় খামখেয়ালিপনা" (judicial arbitrariness) দেখা দেয়:

১. **"সাজা প্রদানের সরঞ্জামের" অভাব ও বিধিবদ্ধ কঠোরতা:** বর্তমান আইন (CrPC/BNSS) কেবল দুটি চরম বিকল্প দেয়: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড। ২০১৫ সালের 'শ্রীহরণ' মামলার সীমাবদ্ধতা ট্রায়াল কোর্ট বা বিচার বিভাগীয় আদালতগুলোকে "মধ্যপস্থা" (রেহাই ছাড়াই নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড) গ্রহণে বাধা দেয়। এর ফলে বিচারকরা "হয় সব, না হয় কিছুই না"—এমন একটি দ্বিধায় পড়েন, যা অনেক সময় অপরাধীকে কম সাজা থেকে বাঁচাতে বিচারকদের মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য করে।

২. **লঘুকারী পরিস্থিতি (Mitigation) অনুসন্ধান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা:** ২০২২ সালের 'মনোজ' মামলার নির্দেশনায় "প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট" এবং আসামির মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল তৈরি বাধ্যতামূলক করা হলেও, নালসার (NALSAR)-এর 'স্কয়ার সার্কেল ক্লিনিক'-এর তথ্য বলছে যে এগুলোকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয় বা কেবল একটি "কাগজে নিয়ম" হিসেবে পালন করা হয়। ফলে অপরাধীর জীবনের একটি সামগ্রিক চিত্র আদালতের সামনে আসে না।
৩. **"ভাঙা মাই" (Broken Ladder) পরিস্থিতি:** বর্তমানে একটি উচ্চ হার দেখা যাচ্ছে যেখানে ট্রায়াল কোর্ট মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে (বিকল্পের অভাবে), কিন্তু পরবর্তীতে উচ্চ আদালত সেই সাজা কমিয়ে দিচ্ছে। এই "যো-যো" (উত্থান-পতন) প্রভাব ভুক্তভোগীদের পরিবারের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং আইনি অনিশ্চয়তাকে দীর্ঘায়িত করে।
৪. **বিচারকদের বিবেচনার ক্ষেত্রে অসঙ্গতি:** দারিদ্র্য, মানসিক স্বাস্থ্য বা বয়সের মতো "লঘুকারী বিষয়গুলো" বিচারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো না থাকায় সাজা প্রদান প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ 'বিচারক-কেন্দ্রিক' হয়ে পড়ে। এর ফলে একই ধরনের অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারকের ব্যক্তিগত দর্শনের কারণে সাজার ধরনে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়।
৫. **পুলিশ ও ফরেনসিক ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ঘাটতি:** সাজার নির্ভুলতা সরাসরি পুলিশ সংস্কারের সাথে যুক্ত। সান্তানকুলাম মামলার মতো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দুর্বল ফরেনসিক মান এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্তকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে; একটি ভঙ্গুর তদন্ত ভিত্তি পুরো বিচার ব্যবস্থাকেই দুর্বল করে দেয়।
৬. **এখতিয়ারগত দ্বন্দ্ব বনাম একরূপতা:** সুপ্রিম কোর্ট "একরূপতা" বজায় রাখার জন্য ট্রায়াল কোর্টকে নির্দিষ্ট মেয়াদের সাজা দেওয়ার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সমালোচকদের মতে, একরূপতা আসা উচিত আপিল বিভাগের পর্যালোচনার মাধ্যমে, প্রমাণের সবচেয়ে কাছের আদালতটিকে (ট্রায়াল কোর্ট) তার এখতিয়ার বা ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে নয়।

ভবিষ্যৎ পথ: সাজা প্রদানের কাঠামো সংস্কার

১. **"মধ্যপন্থা"-র আইনি স্বীকৃতি:** বিএনএসএস (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) সংশোধন করে "রেহাই বা ক্ষমা ছাড়া নির্দিষ্ট মেয়াদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড"-কে একটি বিধিবদ্ধ সাজার বিকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা সেন্সন কোর্টসহ সকল আদালতের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
২. **সাজা প্রদানের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ:** ২০১৫ সালের 'শ্রীহরণ' মামলার সীমাবদ্ধতা বাতিল বা সংশোধন করে ট্রায়াল কোর্টগুলোকে সাজার সব ধরনের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এটি বিচারকদের ১৪ বছরের জেল এবং মৃত্যুদণ্ডের মাঝখানের "শূন্যতা" পূরণ করতে সাহায্য করবে।
৩. **লঘুকারী পরিস্থিতি বা মিটিগেশনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** ২০২২ সালের 'মনোজ' মামলার নির্দেশিকাগুলোকে একটি বাধ্যতামূলক ও আদর্শ প্রোটোকলে রূপান্তর করতে হবে। এর মধ্যে **মিটিগেশন ইনভেস্টিগেটর** (সমাজকর্মী ও মনোবিজ্ঞানী) নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে হবে যারা অভিযুক্তের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে আদালতকে সহায়তা করবে।
৪. **ফরেনসিক এবং তদন্তের বিশ্বস্ততা জোরদার করা:** পুলিশ সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে "বিরলতম থেকে বিরলতম" মামলার রায়গুলো পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বা নির্যাতনের মাধ্যমে আদায় করা স্বীকারোক্তির বদলে **উন্নত মানের ফরেনসিক প্রমাণের** ওপর ভিত্তি করে হয়। এটি অপূরণীয় বিচার বিভাগীয় ভুলের ঝুঁকি কমাবে।
৫. **একটি সেন্টেন্সিং কাউন্সিল (Sentencing Council) গঠন:** আন্তর্জাতিক মডেলের আদলে একটি স্বাধীন সংস্থা তৈরি করা উচিত যারা **সাজা প্রদানের নির্দেশিকা** তৈরি করবে। এটি বিচারকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রভাব কমিয়ে আনবে এবং সাজার ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবে।

উপসংহার

সান্তানকুলাম মামলার রায় সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি "ভাঙা মাই"-এর উপস্থিতিতে স্পষ্ট করে। ট্রায়াল কোর্টগুলোকে নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া এবং লঘুকারী পরিস্থিতি অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে এই "হয় সব, না হয় কিছুই না"—বিরোধভাসটির সমাধান হয় এবং একটি আরও **সুশৃঙ্খল ও মানবিক বিচার ব্যবস্থা** নিশ্চিত হয়।

Q. The restriction on trial courts in awarding intermediate sentences (life imprisonment without remission) creates a structural gap in India's criminal justice system. Critically examine in the light of recent judicial developments. 15 Words

2.1.15. ভারতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ: নারী সংরক্ষণের উর্ধ্বে ফেডারেল সাম্যের প্রকৃত পরীক্ষা

ভূমিকা

- **সীমানা পুনর্নির্ধারণ (Delimitation):** প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনার (Census) পর জনসংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংসদীয় আসন বিন্যাস করার একটি মৌলিক প্রক্রিয়া হলো সীমানা পুনর্নির্ধারণ। এর প্রধান লক্ষ্য হলো সারা ভারতে 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' (One Person, One Vote) নীতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা।
- **বর্তমান প্রেক্ষাপট:** যদিও নারী সংরক্ষণ বিল (Women's Reservation) সাংবিধানিকভাবে মীমাংসিত হয়েছে, তবুও প্রকৃত চ্যালেঞ্জটি নিহিত রয়েছে এমনভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার মধ্যে যা রাজনৈতিকভাবে ন্যায্যসঙ্গত (Politically Equitable) হবে এবং রাজ্যগুলোর মধ্যে ফেডারেল ভারসাম্য (Federal Balance) স্ফুট করবে না।



প্রেক্ষাপট: ভারতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন

ক. সীমানা পুনর্নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন কী?

- **সংজ্ঞা:** সীমানা পুনর্নির্ধারণ বলতে একটি দেশের বা প্রদেশের সংসদীয় এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা এবং 'জনগণনা' (Census)-এর তথ্যের ভিত্তিতে আসন বিন্যাস করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
- **মূল উদ্দেশ্য:** সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ('এক ভোট, এক মূল্য'), জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করা এবং নির্বাচনী ফলাফলে স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

খ. প্রধান সাংবিধানিক বিধানসমূহ

- **অনুচ্ছেদ ৮২:** এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি জনগণনার পর সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লোকসভায় আসন বণ্টন এবং নির্বাচনী এলাকাগুলো পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।
- **অনুচ্ছেদ ১৭০:** অনুচ্ছেদ ৮২-এর মতোই এটি রাজ্যগুলোর বিধানসভার (Legislative Assemblies) গঠন এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিধান দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ৮১:** লোকসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫৫০ জন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বেশি আসন বাড়াতে হলে সংবিধান সংশোধনী প্রয়োজন।
- **অনুচ্ছেদ ৫৫:** রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে পপুলেশন ডেটা বা জনসংখ্যার গুরুত্ব নির্ধারণ করে। তাই পরোক্ষভাবে এটি রাজ্যের গুরুত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।
- **অনুচ্ছেদ ৩২৭:** সংসদকে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ৩২৯:** সীমানা পুনর্নির্ধারণের নির্দেশকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না (Judicial Review-এর বাইরে)।

গ. বিবর্তন এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণ স্থগিতকরণ

- **৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৭৬):** জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা ২০০০ সাল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। লক্ষ্য ছিল—যেসব রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে, তারা যেন রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব না হারায়।

- ৮৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন (২০০১): আসন সংখ্যার ওপর এই স্থগিতাদেশ আরও ২৫ বছর অর্থাৎ ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়।
- ৮৭তম সংবিধান সংশোধনী আইন (২০০৩): মোট আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে রাজ্যের ভেতরে ২০০১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে সীমানা পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়।
- অনুচ্ছেদ ৩৩৪-এ (২০২৩ সালের নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম): লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৩%) আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা পরবর্তী সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর কার্যকর হবে।

ঘ. কমিশনের গঠন ও ক্ষমতা

- এটি একজন অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত হয়। সদস্য হিসেবে থাকেন ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারগণ।
- ১৯৫১, ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালের জনগণনার পর কমিশন গঠন করা হয়েছিল। বর্তমান প্রস্তুতি ২০২৭ সালের জনগণনার ওপর ভিত্তি করে করা হবে।
- অনুচ্ছেদ ৩২৯ অনুযায়ী, এই কমিশনের আদেশ আইনের সমান শক্তিশালী এবং চূড়ান্ত।

ঙ. সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়সমূহ

- মেঘরাজ কোঠারি বনাম ডিলিমিটেশন কমিশন (১৯৬৬): আদালত জানায়, এই কমিশনের নির্দেশগুলো আদালতের এক্জিয়ারভুক্ত নয়।
- মহিন্দর সিং গিল বনাম প্রধান নির্বাচন কমিশনার (১৯৭৮): নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এবং ডিলিমিটেশন আদেশের চূড়ান্ত বাধ্যবাধকতা পুনরায় নিশ্চিত করা হয়।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ ও নারী সংরক্ষণের সমন্বয়

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (১২৮তম সংবিধান সংশোধনী) নারী কোটাকে সীমানা পুনর্নির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত করে একটি জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

- নতুন অনুচ্ছেদ ৩৩৪-এ: এখানে বলা হয়েছে যে, ৩৩.৩% মহিলা সংরক্ষণ তখনই কার্যকর হবে যখন নতুন জনগণনা শেষ হবে এবং তার ভিত্তিতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ সম্পন্ন হবে।
- ২০২৭ জনগণনা ও বাস্তবায়ন: বর্তমান ধারণা অনুযায়ী, যদি ২০২৭ সালে জনগণনা হয়, তবে সীমানা পুনর্নির্ধারণের রিপোর্ট ২০২৮ বা ২০২৯ সালের আগে আসা সম্ভব নয়। এর ফলে মহিলা সংরক্ষণ সম্ভবত ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কার্যকর হতে পারে।

সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ভারতের নির্বাচনী মানচিত্রের পুনর্নির্ধারণ কেবল একটি কারিগরি কাজ নয়; বরং এটি দেশের ফেডারেল সমঝোতা (Federal Compact) এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের (Social Justice) কাঠামোর সামনে একটি গভীর চ্যালেঞ্জ।

১. ফেডারেল ভারসাম্যহীনতা এবং "উন্নয়নের জন্য দণ্ড"

- জনসংখ্যাগত পার্থক্য (Demographic Divergence): দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো (তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং পূর্ব ভারতের কিছু অংশ (পশ্চিমবঙ্গ) কয়েক দশক আগে সফলভাবে পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।
- আপেক্ষিক অসুবিধার চ্যালেঞ্জ: যদি ২০২৭ সালের জনসংখ্যার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়, তবে এই জনসংখ্যা স্থিতিশীল করা রাজ্যগুলোর লোকসভার আসনের অনুপাত কমে যাবে। একে "উন্নয়নের জন্য দণ্ড" বলা হচ্ছে, যেখানে জাতীয় উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজ্যগুলো রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- প্রভাবের তারতম্য: মোট আসন সংখ্যা বাড়লেও, অধিক জনসংখ্যা এবং স্বল্প জনসংখ্যার রাজ্যগুলোর মধ্যে আসনের সংখ্যার পার্থক্য অনেক বেড়ে যাবে। ফলে ইউনিয়নে দক্ষিণ ভারতের এবং ছোট রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক প্রভাব (Political Influence) হ্রাস পাবে।

২. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবক্ষয় এবং আন্তঃরাজ্য আস্থার সংকট

- **ঐকমত্য উপেক্ষা করা:** আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব শেয়ার না করে বা সর্বদলীয় বৈঠক না ডেকে বিশেষ অধিবেশন (এপ্রিল ২০২৬) ডাকার বিষয়টি ঐকমত্য তৈরির (Consensus-building) ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করে।
- **ফেডারেল আস্থার চ্যালেঞ্জ:** ভারতের স্থিতিশীলতা একটি সাংবিধানিক সমঝোতার ওপর নির্ভরশীল—যেখানে ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের (Equitable Representation) নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলোর সাথে আলোচনা না করে একতরফা সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা (Regional Alienation) বৃদ্ধি করতে পারে।
- **ঐতিহাসিক তুলনা:** ১৯৯৩ সালের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনী ৫ বছরের জাতীয় বিতর্কের পর কার্যকর হয়েছিল, যা স্থানীয় স্তরে নারী সংরক্ষণের বৈধতা নিশ্চিত করেছিল।

৩. সাংবিধানিক অখণ্ডতা এবং জনগণনা-ডিলিমিটেশন সংযোগ

- **পদ্ধতিগত বিচ্ছিন্নতা:** অনুচ্ছেদ ৮২ এবং ১৭০ অনুযায়ী, ডিলিমিটেশন অবশ্যই একটি সম্পন্ন জনগণনার পর হতে হবে। ২০২১ সালের জনগণনা স্থগিত হওয়ায় একটি তথ্যশূন্যতা (Data Vacuum) তৈরি হয়েছে। ২০২৭ সালের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের আগেই সীমানা পুনর্নির্ধারণের চেষ্টা সাংবিধানিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হতে পারে।
- **অধিকারের ওপর প্রভাব:** জনগণনায় বিলম্বের কারণে সরাসরি আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হচ্ছে। যেমন, ২০১১ সালের ডেটা ব্যবহারের ফলে প্রায় ১০ কোটি মানুষ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (NFSA, 2013)-এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
- **অপরিবর্তনীয়তার চ্যালেঞ্জ:** অনুচ্ছেদ ৩২৯ অনুযায়ী, ডিলিমিটেশনের আদেশ অ-বিচারযোগ্য (Non-justiciable)। যদি ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হয়, তবে তা একটি স্থায়ী সাংবিধানিক বাস্তবতায় পরিণত হবে যা বিচার বিভাগও সংশোধন করতে পারবে না।

৪. সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জাতি গুণায়ন (Caste Census) সংঘাত

- **অন্তর্ভুক্তির অভাব:** ২০২৩ সালের নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে SC/ST মহিলাদের জন্য উপ-কোটা থাকলেও OBC মহিলাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ওবিসিরা জনসংখ্যার প্রায় ৫০% হওয়ায় এটি সমতার ক্ষেত্রে একটি বড় ঘাটতি।
- **তথ্য বিপথগামী করা:** সমালোচকদের মতে, তড়িঘড়ি ডিলিমিটেশন আসলে জাতি গুণায়নকে (Caste Census) বিলম্বিত করার একটি কৌশল হতে পারে।
- **সামাজিক ক্ষমতায়ন:** সঠিক জাতিভিত্তিক তথ্য ছাড়া সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অধরা থেকে যায়। বিহার ও তেলঙ্গানার সমীক্ষা প্রমাণ করেছে যে এই গুণায়ন প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক এবং সুশাসনের বাধা

- **আলোচনার গুণমান (Deliberative Quality):** লোকসভার আসন সংখ্যা ৮০০-এর বেশি হলে হাউসের আলোচনার মান কমে যেতে পারে। সদস্য সংখ্যা বাড়লে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার সময় কমবে এবং জটিল আইনের যথাযথ যাচাই-বাছাই (Scrutiny) ব্যাহত হবে।
- **প্রশাসনিক জটিলতা:** প্রথমবারের মতো ডিজিটাল সেনসাস (Digital Census) করার ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতির ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক সমতা বজায় রেখে গাণিতিক নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য যে স্বচ্ছতা প্রয়োজন, তাড়াহুড়ো করলে তা পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: একটি সুসমন্বিত ভারসাম্যের সন্ধান

১. গণতান্ত্রিক ও পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া জোরদার করা

- **ঐকমত্য-ভিত্তিক সুশাসন পুনরুদ্ধার:** কেন্দ্রীয় সরকারকে 'বিশেষ অধিবেশন'-এর কৌশলের পরিবর্তে একটি আনুষ্ঠানিক সর্বদলীয় আলোচনা (All-party consultation) কাঠামোর দিকে এগোতে হবে। প্রধান জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক অংশীজনের মধ্যে ঐকমত্য ছাড়া রাজ্যভিত্তিক আসন বণ্টন সংক্রান্ত কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী পাস করা উচিত নয়।

- **আন্তঃরাজ্য পরিষদের (Inter-State Council) ভূমিকা:** আঞ্চলিক উদ্বেগগুলো তুলে ধরার জন্য **অনুচ্ছেদ ২৬৩** অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য পরিষদকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। আসন বণ্টনের সূত্রে যেকোনো পরিবর্তনের জন্য **৫০% রাজ্যের সম্মতি** বাধ্যতামূলক করলে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' (Union of States) বা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রকৃত অর্থে বজায় থাকবে।

২. পদ্ধতিগত অখণ্ডতা: জনগণনা ও ডিলিমিটেশনের সমন্বয়

- **আগে জনগণনা, পরে ডিলিমিটেশন:** অনুচ্ছেদ ৮২ এবং ১৭০ মেনে, সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশনের কাজ শুরু করার আগে **২০২৭ সালের জনগণনা** সম্পূর্ণ করতে হবে এবং তার তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। এটি স্থায়ী সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অস্থায়ী বা আনুমানিক তথ্যের ব্যবহার রোধ করবে।
- **সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ:** ২০২৭ সালের জনগণনায় **জাতি শুমারি (Caste Enumeration)** অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি কেবল রাজনৈতিক দাবি নয়, বরং 'কোটার ভেতরে কোটা' সংজ্ঞায়িত করতে এবং নারী সংরক্ষণকে সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে একটি কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা।
- **ডিজিটাল স্বচ্ছতা:** যেহেতু এটি একটি **ডিজিটাল সেনসাস (Digital Census)** হতে চলেছে, তাই তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে এবং 'ডিজিটাল বিভাজন'-এর কারণে আসন বণ্টন যাতে প্রভাবিত না হয়, তার জন্য একটি স্বতন্ত্র অডিট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩. ফেডারেল সুরক্ষা কবচ এবং সাম্য নিশ্চিত করার সূত্র

- **'আসন-মেঝে' (Seat-Floor) পদ্ধতি গ্রহণ:** যেসব রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে (যেমন—তামিলনাড়ু, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ), তাদের স্বার্থ রক্ষায় একটি **'ফ্লোর রুল' (Floor Rule)** প্রয়োগ করা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে, সংসদের মোট আসন সংখ্যা বাড়লেও কোনো রাজ্যের বর্তমান আসন সংখ্যা যেন হ্রাস না পায়।
- **কার্যকারিতা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব:** ডিলিমিটেশন কমিশনকে কেবল কাঁচা জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি না করে একটি **বহু-মুখী সূচক (Multi-weighted index)** গ্রহণ করা উচিত। এই সূত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
 - মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) স্কোর।
 - জনসংখ্যা স্থিতিশীলকরণে সাফল্য (TFR হার)।
 - সাক্ষরতা এবং স্বাস্থ্যসেবার মান।
- **ভারসাম্য রক্ষা:** উন্নয়নমূলক সূচকগুলোকে গুরুত্ব দিলে তা রাজ্যগুলোকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত করবে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দণ্ডিত করবে না।

৪. সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রকৃত সমতা বৃদ্ধি

- **অন্তর্ভুক্তিমূলক নারী সংরক্ষণ:** ২০২৩ সালের নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সংশোধন করে এতে **OBC মহিলাদের জন্য উপ-কোটা** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি **প্রকৃত সমতার (Substantive Equality)** সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে এবং ৩৩% সংরক্ষণকে ভারতের প্রকৃত সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন হিসেবে গড়ে তুলবে।
- **তথ্য-চালিত ক্ষমতায়ন:** ২০২৭ সালের জাতি শুমারির ফলাফল ব্যবহার করে সংরক্ষিত নির্বাচনী এলাকাগুলোকে (SC/ST) আরও নির্ভুলভাবে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে, যাতে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো সঠিক প্রতিনিধিত্ব পায়।

৫. দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক ও সংসদীয় সংস্কার

- **রাজ্যসভাকে শক্তিশালী করা:** লোকসভায় জনসংখ্যা-ভিত্তিক ভারসাম্যহীনতা দূর করতে **রাজ্যসভার (Council of States)** ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত। রাজ্যসভাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যেতে পারে যা রাজ্যগুলোকে সত্তা হিসেবে আরও ন্যায্য গুরুত্ব (Equitable Weightage) দেবে এবং একটি **'ফেডারেল নোডর' (Federal Anchor)** হিসেবে কাজ করবে।
- **স্থায়ী নির্বাচনী সংস্কার কমিশন:** অ্যাড-হক কমিশনের পরিবর্তে একটি **স্থায়ী সংস্থা** গঠন করা যেতে পারে যা নির্বাচনী সংস্কারের ওপর নিরপেক্ষ নজরদারি চালাবে।

উপসংহার

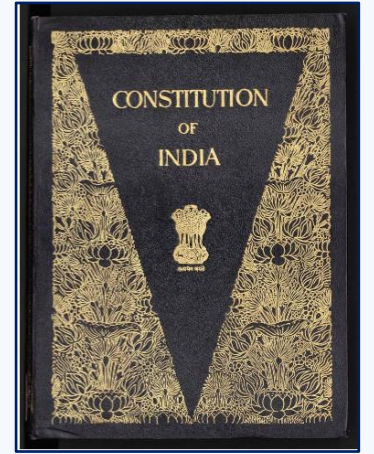
সীমানা পুনর্নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন হলো একটি ঐতিহাসিক সাংবিধানিক মুহূর্ত, যা আগামী দশকগুলোতে ভারতের ফেডারেল ভারসাম্য এবং গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের রূপরেখা তৈরি করবে। রাজনৈতিক সাম্য (Equity), ঐক্যমত এবং দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত নিশ্চিত করতে পারে যে, নারী সংরক্ষণ এবং ডিলিমিটেশন—উভয়ই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে দুর্বল করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালী করবে।

Q. Delimitation in India is not merely a technical exercise but a test of federal equity. Discuss how a balanced approach can ensure democratic legitimacy, social justice and cooperative federalism in India. 15 Marks

2.1.16. ভারতের সংবিধান সংশোধন: প্রক্রিয়া, ধারা ৩৬৮ এবং মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব

ভূমিকা

ভারতের সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল যা প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। **সংবিধান সংশোধন বিলগুলো** এই বিকাশের অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা জাতিকে উদীয়মান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। এই সংশোধনগুলো গণতান্ত্রিক ইচ্ছা এবং "মৌলিক কাঠামোর" মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ তৈরি করে, যা নিশ্চিত করে যে আইন তার মূল আদর্শের সাথে আপস না করেই প্রাসঙ্গিক থাকে। শেষ পর্যন্ত, এগুলো ভারতের শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিক বিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে সংসদীয় ক্ষমতার সাথে সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্বের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।



পদ্ধতিগত কাঠামো: সংবিধান কীভাবে সংশোধন করা হয়

সংশোধন প্রক্রিয়াটি মূলত ৩৬৮ নম্বর ধারা দ্বারা পরিচালিত হয়, যা কঠোরতা এবং নমনীয়তার এক সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ। সংবিধান প্রণেতারা নিশ্চিত করেছেন যে সংবিধানের বিবর্তন ঘটলেও এটি যেন ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সংশোধনের দ্বিমুখী পদ্ধতি: সংবিধানে পরিবর্তনের জন্য দুটি প্রধান উপায়ের কথা বলা হয়েছে—

১. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সংশোধন (৩৬৮ নম্বর ধারার বাইরে)

কিছু বিধানকে আনুষ্ঠানিক সংবিধান সংশোধন হিসেবে গণ্য করা হয় না। এগুলো সংসদ সাধারণ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে, অর্থাৎ উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে। এর উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- নতুন রাজ্য গঠন বা সীমানা পরিবর্তন।
- বিধান পরিষদ (Legislative Council) বিলোপ বা গঠন।
- বেতন এবং প্রশাসনিক বিধানসমূহ। এটি প্রণেতাদের সেই ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে যেখানে কম গুরুত্বপূর্ণ এবং অ-যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানগুলোকে পরিবর্তন করা সহজ রাখা হয়েছে।

২. ৩৬৮ নম্বর ধারার অধীনে সংশোধন (আনুষ্ঠানিক সংশোধন প্রক্রিয়া)

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোর জন্য সংবিধান ৩৬৮ নম্বর ধারার অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এখানে গুরুত্বের ভিত্তিতে সংশোধনগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

- I. **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সংশোধন** মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতিসহ (DPSP) বেশিরভাগ প্রধান বিধানের জন্য সংসদে এই বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন, যার জন্য:

- প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি সমর্থন, এবং
 - উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। উভয় কক্ষে পাস হওয়ার পর বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়, যিনি এতে সম্মতি দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর সংবিধান সংশোধিত হয়।
- II. **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা + রাজ্যগুলোর অনুমোদন** যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রভাবিত করে এমন বিধানগুলোর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়। সংসদে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হওয়ার পর, অন্তত **অর্ধেক রাজ্য আইনসভার** দ্বারা এটি অনুমোদিত (Ratified) হতে হবে। এটি নিচের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:
- রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (ধারা ৫৪-৫৫)।
 - কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা (ধারা ৭৩, ১৬২)।
 - সুপ্রিম কোর্ট এবং হাই কোর্ট।
 - আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বন্টন (একাদশ অংশ)।
 - সপ্তম তফসিল (কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং যুগ্ম তালিকা)।
 - সংসদে রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব।
 - খোদ ৩৬৮ নম্বর ধারা। রাজ্যগুলোর অনুমোদনের পরেই বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হয়।

সংসদের সংশোধন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

১. **মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব (Basic Structure Doctrine):** সংসদের সংশোধন করার ক্ষমতা **কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৭৩)** মামলায় বিবর্তিত এই তত্ত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ। এতে বলা হয়েছে যে, সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (যেমন— গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো) পরিবর্তন বা ধ্বংস করতে পারবে না।
২. **সংশোধনের শর্তাধীন বৈধতা:** ৩৬৮ নম্বর ধারার অধীনে করা সংশোধনগুলো কেবল তখনই বৈধ হবে যদি তারা মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘন না করে। অর্থাৎ, সংসদের ক্ষমতা ব্যাপক হলেও তা অসীম নয়।
৩. **৩৬৮ নম্বর ধারা নিজেই সীমাবদ্ধ:** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ৩৬৮ নম্বর ধারাটি মৌলিক কাঠামোর অংশ। এর মানে হলো, সংসদ এই ধারাটি ব্যবহার করে নিজের সংশোধনী ক্ষমতাকে সাংবিধানিক সীমার বাইরে প্রসারিত করতে পারবে না।
৪. **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বাতিল করা যাবে না:** **মিনার্ভা মিলস বনাম ভারত সরকার (১৯৮০)** মামলায় আদালত রায় দেয় যে সংসদ **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)** ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারবে না, কারণ এটি সংবিধানের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।
৫. **ট্রাইব্যুনাল সাংবিধানিক আদালতের বিকল্প হতে পারে না:** **এল. চন্দ্র কুমার বনাম ভারত সরকার (১৯৯৭)** মামলায় আদালত বলেছে যে ট্রাইব্যুনালগুলো হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতার বিকল্প হতে পারে না।
৬. **নবম তফসিল মৌলিক কাঠামোর আওতাধীন:** **আই.আর. কোয়েলহো বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০৭)** মামলায় আদালত রায় দেয় যে ১৯৭৩ সালের পর নবম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা আইনগুলোও মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘন করলে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।
৭. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অলঙ্ঘনীয়:** ২০১৫ সালের **NJAC** রায় বাতিল করার সময় আদালত পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** মৌলিক কাঠামোর অংশ।

সংবিধান সংশোধন বিলের তাৎপর্য

১. **সাংবিধানিক অভিযোজনযোগ্যতার হাতিয়ার:** সংশোধনগুলো নিশ্চিত করে যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে সংবিধান যেন প্রাসঙ্গিক থাকে। শুরুর দিকের ভূমি সংস্কার থেকে শুরু করে বর্তমানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মতো বিষয়গুলো আইনি কাঠামোর বিবর্তনে সাহায্য করে।

২. **সামাজিক ন্যায়ের বাহন:** ঐতিহাসিকভাবে সংবিধান সংশোধনগুলো কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে ব্যবহৃত হয়েছে। সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের সুরক্ষা সংবিধানের রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে।
৩. **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ গভীর করা:** স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন শক্তিশালী করার মতো সংশোধনগুলো গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে আরও ব্যাপক করেছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগুলো গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে।
৪. **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা:** সংশোধনগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি সংশোধন করতে এবং শাসন ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করে। কর সংস্কার (যেমন GST) বা নতুন সাংবিধানিক সংস্থা গঠন প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করে।
৫. **রাজনৈতিক ঐক্যমত্য ও জাতীয় অগ্রাধিকারের প্রতিফলন:** বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রাজ্যগুলোর অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তার কারণে সংবিধান সংশোধনগুলো প্রায়ই একটি ব্যাপক রাজনৈতিক ঐক্যমত্যকে প্রতিফলিত করে। এগুলো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে দেশের জাতীয় অগ্রাধিকারের চিহ্ন হিসেবে কাজ করে।

সংবিধান সংশোধনের প্রভাব

১. শাসনব্যবস্থার রূপান্তর

সংশোধনীগুলো ভারতের শাসন কাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনর্গঠিত করেছে। কর সংস্কার, দলত্যাগ বিরোধী আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন প্রশাসনের স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে।

- **উদাহরণ: ১০১তম সংশোধনী আইন (২০১৬)** জিএসটি (GST) চালু করে একাধিক পরোক্ষ করের বদলে একটি সমন্বিত জাতীয় বাজার তৈরি করেছে।

২. অধিকার ও কর্তব্যের সম্প্রসারণ

সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের পরিধি বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে **মৌলিক কর্তব্য** সংযোজিত হয়েছে। এটি নাগরিকত্বের একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি করে—যেখানে অধিকার এবং দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে।

- **উদাহরণ: ৮৬তম সংশোধনী আইন (২০০২)** ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষাকে একটি **মৌলিক অধিকার** হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অভিভাবকদের জন্য একটি সংশ্লিষ্ট কর্তব্য যুক্ত করেছে।

৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন

সংশোধনীগুলো কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে ক্রমাগত নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। কিছু সংশোধনী সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করলেও, অন্যগুলো কেন্দ্রীয়করণের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

- **উদাহরণ: ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনী আইন (১৯৯২)** পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং পৌরসভা গঠনের মাধ্যমে শাসনের তৃতীয় স্তর হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণকে শক্তিশালী করেছে।

৪. মৌলিক কাঠামো তত্ত্বের উত্থান

সবচেয়ে গভীর প্রভাব হলো বিচার বিভাগীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ। সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জানিয়েছে যে সংসদ সংবিধানের "**মৌলিক কাঠামো**" পরিবর্তন করতে পারে না। এই তত্ত্ব গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসনের মতো মূল নীতিগুলোকে রক্ষা করে।

- **উদাহরণ: ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট ৯৯তম সংশোধনী আইন (NJAC)** বাতিল করে দিয়ে নিশ্চিত করে যে **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ।

৫. রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিতর্ক

সংশোধনীগুলো প্রায়ই আদর্শিক বিতর্কের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কিছু সংশোধনী সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেলেও অন্যগুলো রাজনৈতিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রাণবন্ততাকে প্রতিফলিত করে।

- **উদাহরণ: ৪২তম সংশোধনী আইন (১৯৭৬)** জরুরি অবস্থার সময় বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করেছিল, যা পরবর্তীতে **৪৪তম সংশোধনী আইন (১৯৭৮)** দ্বারা সংশোধন করে গণতান্ত্রিক সুরক্ষা পুনরুদ্ধার করা হয়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ এবং উদ্বেগ

১. **ক্রমবর্ধমান পরিধি এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ:** বর্তমানের সংশোধনীগুলো প্রতিনিধিত্ব, সীমানা নির্ধারণ (Delimitation) এবং লিঙ্গ সমতার মতো বিষয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল শাসন, ডেটা সুরক্ষা এবং **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI)** মতো নতুন ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কাজ করছে—যা বর্তমান কাঠামোর পর্যাণ্ডতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
২. **সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অপব্যবহারের ঝুঁকি:** সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে এমন সংশোধনী পাস হওয়ার ঝুঁকি থাকে যা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ বা সংখ্যালঘুদের অধিকার দুর্বল করতে পারে। ঘন ঘন সংশোধন সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে।
৩. **কেন্দ্রীয়করণ বনাম যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য:** কিছু সংশোধনী কেন্দ্রের দিকে ক্ষমতার পাল্লা ভারী করার জন্য সমালোচিত হয়েছে, যা সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তরায় হতে পারে।
৪. **সীমিত জন অংশগ্রহণ:** সংশোধন প্রক্রিয়াটি মূলত সংসদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এতে সাধারণ নাগরিকদের সরাসরি অংশগ্রহণ খুব কম, যা স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক সম্পৃক্ততাকে হ্রাস করে।
৫. **বিচার বিভাগীয় উত্তেজনা এবং সাংবিধানিক নৈতিকতা:** সংশোধন করার ক্ষমতা নিয়ে সংসদ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান টানাপোড়েন সাংবিধানিক নৈতিকতা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

আগামীর পথ

১. **আলোচনামূলক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা:** যে কোনো সংশোধনীর আগে সংসদ এবং সংসদীয় কমিটিতে ব্যাপক বিতর্ক হওয়া উচিত।
২. **জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:** সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকায় সংশোধনীগুলোতে সাধারণ মানুষের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। এটি সংশোধনীর বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
৩. **মৌলিক কাঠামো রক্ষা করা:** সংবিধানের মূল মূল্যবোধ রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা সম্মান করা উচিত। এটি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ।
৪. **স্থিতিশীলতার সাথে নমনীয়তার ভারসাম্য:** পরিবর্তন জরুরি হলেও স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক লাভের জন্য সংশোধন করা উচিত নয়। দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রক্রিয়া চালানো উচিত।
৫. **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী করা:** কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে প্রভাবিত করে এমন সংশোধনীগুলো আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত। সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মূল নীতি হওয়া প্রয়োজন।
৬. **উদীয়মান অধিকারের সমাধান:** ভবিষ্যতের সংশোধনীগুলোতে ডিজিটাল অধিকার এবং পরিবেশ রক্ষার মতো আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে সংবিধান সময়ের সাথে তাল মেলাতে পারে।

উপসংহার

সংবিধান সংশোধন বিলগুলো ১৯৫০ সালের প্রতিষ্ঠাতা স্বপ্ন এবং আধুনিক ভারতের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। এদের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে **সাংবিধানিক নৈতিকতা**, প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য এবং ন্যায্যবিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ পালনের মধ্যে। সংযম ও প্রজ্ঞার সাথে ব্যবহার করা হলে এগুলো সংবিধানকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জীবন্ত প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তরিত করে।

Q. The power to amend the Constitution is a transformative tool, yet it is not an absolute power. In the light of the 'Basic Structure Doctrine,' discuss how Constitutional Amendment Bills balance the need for parliamentary sovereignty with the necessity of constitutional stability. 15 Marks

2.1.17. ভারতের জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন: বিশ্ব গ্রামীণ উন্নয়ন কূটনীতির রূপকার

ভূমিকা

- ২০১১ সালে, ভারত সরকারের পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রকের (Ministry of Rural Development) অধীনে National Rural Livelihood Mission (NRLM) বা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন চালু করা হয়েছিল। এটি মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self-Help Groups - SHGs), আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion), দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্ব-নিযুক্তির দর্শনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল, যার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ ভারতের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য (Multidimensional Poverty) হ্রাস করা।
- পনেরো বছর পর, NRLM কেবল তার অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যমাত্রাই অতিক্রম করেনি, বরং এটি গ্রামীণ উন্নয়নের একটি বিশ্বজনীন সমাদৃত মডেলে (Globally Admired Model) পরিণত হয়েছে। এটি বর্তমানে আফ্রিকার দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং ভারতের দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা (South-South Cooperation) কাঠামোকে নতুন রূপ দিচ্ছে।



ভারতের National Rural Livelihood Mission (NRLM) সম্পর্কে বিস্তারিত

National Rural Livelihoods Mission (NRLM) হলো পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রকের (MoRD) অধীনে একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি। এর লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকায় স্ব-নিযুক্তি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য (Multidimensional Poverty) হ্রাস করা। এটি ২০১১ সালে আগের 'স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' (SGSY)-র পরিবর্তে চালু করা হয়েছিল, যা বিচ্ছিন্ন এবং সরবরাহ-ভিত্তিক (supply-driven) হওয়ার কারণে সমালোচিত হয়েছিল।

SGSY-এর বিপরীতে, NRLM একটি চাহিদা-চালিত (Demand-driven) এবং প্রতিষ্ঠানিক পদ্ধতি (Institution-led approach) অনুসরণ করে, যা শক্তিশালী তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান গঠন এবং টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়।

ক. মূল বৈশিষ্ট্য এবং কর্মসূচির উপাদানসমূহ

১. সামাজিক সংহতি এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো

- NRLM গ্রামীণ দরিদ্রদের, বিশেষ করে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs)-তে সংগঠিত করে। এই গোষ্ঠীগুলি ছোট এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক, যা যৌথ সমন্বয়, ঋণের সুবিধা এবং জীবিকার বহুমুখীকরণে সহায়তা করে।
- এই SHG-গুলিকে একটি ফেডারেটেড কাঠামো বা স্তরীভূত কাঠামোয় সংগঠিত করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে গ্রাম সংগঠন (VOs), ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন (CLFs) এবং ব্লক লেভেল ফেডারেশন (BLFs)। এটি অংশগ্রহণমূলক শাসন এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

২. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ঋণ সহায়তা

- NRLM রিভলভিং ফান্ড (RF) এবং কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (CIF)-এর মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- এটি দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা – NRLM (DAY-NRLM)-এর অধীনে ব্যাংক সংযোগ সহজতর করে এবং SHG-Bank Linkage Programme (SBLP)-কে শক্তিশালী করে যাতে সময়মতো সাশ্রয়ী ঋণ নিশ্চিত করা যায়।

৩. জীবিকা উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

- এই মিশন উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক কাজের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক জীবিকা এবং দুগ্ধজাত পণ্য, হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মতো অ-কৃষি উদ্যোগ প্রচার করে।
- কমিউনিটি ক্যাডার: পরিষেবা প্রদানের জন্য ভারতজুড়ে ১ কোটিরও বেশি প্রশিক্ষিত কমিউনিটি রিসোর্স পারসন (CRPs), কমিউনিটি মোবাইলাইজার, পশু সখী (পশুপালন), কৃষি সখী (কৃষি) এবং ব্যাংক সখী মোতায়েন করা হয়েছে।

- এটি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (DDU-GKY)-এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা করে, যা গ্রামীণ যুবকদের আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়।

৪. প্রান্তিক পর্যায়ে পরিষেবা প্রদান এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি

- NRLM কমিউনিটি ক্যাডার এবং বিজনেস করেসপন্ডেন্ট (BCs)/ব্যাংক সখীদের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করে।
- এটি ডিজিটাল সাক্ষরতা, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল পেমেন্টকে উৎসাহিত করে। স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য SHG-গুলিকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সাথে একীভূত করা হয়।
- JAM ট্রিনিটি অন্তর্ভুক্তি (JAM Trinity Embedding): গ্রামীণ মহিলাদের জন ধন যোজনা (PMJDY) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আধার (Aadhaar) বায়োমেট্রিক পরিচয় এবং মোবাইল (Mobile) ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- প্রকল্পের সমন্বয় (Scheme Convergence): NRLM SHG প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বিত পরিষেবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন:
 - MGNREGS (মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান)
 - PM-KISAN (কৃষক আয় সহায়তা)
 - PMJDY (আর্থিক অন্তর্ভুক্তি)
 - PM-SVANidhi (ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের জন্য ঋণ)
 - PMAY-G (গ্রামীণ আবাসন)

খ. মূল অর্জনসমূহ—রূপান্তরের চিত্র

২০২৪-২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী NRLM-এর অর্জন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংহতি কর্মসূচিকে প্রতিফলিত করে:

- বিশাল ব্যাপ্তি (Mass Outreach): NRLM ৭৪২টি জেলা জুড়ে ১০ কোটিরও বেশি পরিবারের কাছে পৌঁছেছে।
- মহিলা-কেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধি (Women-Centric Growth): ৯ মিলিয়নেরও বেশি SHG গঠিত হয়েছে, যেখানে ২ কোটিরও বেশি মহিলা বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার বেশি আয় করছেন।
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion): প্রায় ৫ কোটি মহিলা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা পেয়েছেন এবং মোট ব্যাংক লিঙ্কেজ ১২ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে।
- কমিউনিটি ক্যাডার ব্যবস্থা (Community Cadre System): কমিউনিটি রিসোর্স পারসন এবং ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্টদের উপস্থিতির মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের ৬০%-এরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে শেষ প্রান্তের পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বাজেট সহায়তা (Budgetary Support): ২০২৬-২৭ কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৯,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গ্রামীণ উন্নয়নে NRLM-এর গুরুত্বকে পুনর্নিশ্চিত করে।

National Rural Livelihoods Mission (NRLM) বা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর গুরুত্ব

১. সামাজিক গুরুত্ব

- মহিলা ক্ষমতায়ন: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHGs) মাধ্যমে সম্মিলিত উদ্যোগ গার্হস্থ্য সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ হ্রাস করেছে এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।
- সামাজিক পুঁজি (Social Capital): বিশ্বাস-ভিত্তিক পারস্পরিক ঋণ এবং সম্মিলিত সঞ্চয় তৃণমূল স্তরের সংহতিকে পুনর্গঠিত করেছে।
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি: NRLM-সংযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কোভিড-১৯ ত্রাণ, মাস্ক উৎপাদন এবং পুষ্টি বাগান (Nutrition Gardens) তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** 'ব্যাংক সখী' এবং বিজনেস কনসাল্টেন্টরা ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রামীণ নারীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন।

২. অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **দারিদ্র্য বিমোচন:** গ্রামীণ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণে NRLM ভারতের প্রধান হাতিয়ার।
- **মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ (FLFPR) বৃদ্ধি:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী-সংযুক্ত জীবিকার কারণে মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১৮-২০২৩ সালের মধ্যে ১৭% থেকে বেড়ে প্রায় ৩৭% হয়েছে।
- **ক্ষুদ্র উদ্যোগের প্রসার:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা অ-কৃষি জীবিকা, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-উদ্যোগে প্রবেশ করছেন।
- **GVA-তে অবদান:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী-সংযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গ্রামীণ গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (GVA)-তে অর্থবহ অবদান রাখছে।

৩. শাসনতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব

- পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান (PRIs) এবং সামাজিক ফেডারেশনগুলোর মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত পরিষেবা প্রদান।
- সামাজিক অডিট (Social Audits), সামাজিক পর্যবেক্ষণ এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।
- অভিসারী শাসন (Convergent Governance) মডেল—স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থ, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ একাধিক মন্ত্রককে সংযুক্ত করা।

৪. কূটনৈতিক গুরুত্ব—উন্নয়ন কূটনীতির হাতিয়ার হিসেবে NRLM

- ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, মালাউই, কেনিয়া ও রুয়ান্ডার প্রতিনিধি দল NRLM-এর কার্যপ্রণালী বুঝতে ভারত সফর করেছে।
- এটি ভারতের 'দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা' (SSC) দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যেখানে পুঁজি নয়, বরং উন্নয়নমূলক জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া হয়।
- এটি ভারতের ITEC এবং ভারত-আফ্রিকা ফোরাম সামিট (IAFS) কূটনৈতিক কাঠামোর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

সীমানা ছাড়িয়ে NRLM—ভারতের বৈশ্বিক উন্নয়নের পদচিহ্ন

ক. কেন আফ্রিকার দেশগুলো আকর্ষিত হচ্ছে?

- **নারী-কেন্দ্রিক ফোকাস:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী মডেলটি আফ্রিকার নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যের সাথে মিলে যায়।
- **ব্যয়-সাশ্রয়ী:** এটি একটি সম্প্রদায়-চালিত প্রক্রিয়া যা বিশাল পুঁজি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরতা কমায়—যা সম্পদ-সংকটে থাকা দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির উপযোগী:** আফ্রিকার বিশাল অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির জন্য NRLM-এর জীবিকা বহুমুখীকরণ মডেলটি অত্যন্ত উপযুক্ত।
- **প্রতিষ্ঠান গঠন:** এটি কেবল একটি প্রকল্প নয়—এটি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা এবং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- **সহকর্মীদের থেকে শিক্ষা (Peer Learning):** গ্লোবাল সাউথ-এর দেশগুলো পশ্চিমা মডেলের বদলে ভারতের মতো একই কাঠামোগত বাস্তবতাসম্পন্ন দেশ থেকে শিখতে বেশি আগ্রহী।

খ. ভারত যেভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে

- রাজ্য জীবিকা মিশনগুলোতে (SRLMs) প্রতিনিধি দল প্রেরণ, স্টাডি ট্যুর এবং সরেজমিনে পরিদর্শন (Immersion Visits)।
- ভারতের ITEC প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি।

- ভারতের রাজ্য মিশনগুলোর সাথে আফ্রিকান সরকারি সংস্থাগুলোকে যুক্ত করতে 'গ্রামীণ জীবিকা জ্ঞান বিনিময় প্ল্যাটফর্ম' (Rural Livelihoods Knowledge Exchange Platform)-এর প্রস্তাব।
- আফ্রিকার স্থানীয় প্রেক্ষাপটে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মডেলটি খাপ খাইয়ে নিতে যৌথ পাইলট প্রকল্প গ্রহণ।

National Rural Livelihood Mission (NRLM) মডেলের সম্প্রসারণ এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ: গভীরতা এবং গুণমান নিশ্চিতকরণ

প্রভূত পরিমাণগত সাফল্য সত্ত্বেও, ভারতজুড়ে এই অভিযানের গতিধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিছু গুণগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় আঞ্চলিক বৈষম্য:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য "উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন" লক্ষ্য করা যায়। কেরালা (Kudumbashree) এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে পরিপক্ব ফেডারেশন থাকলেও, মধ্য ও পূর্ব ভারতের "সামাজিক পুঁজি" (Social Capital) এখনও বিকশিত হচ্ছে, যার ফলে দারিদ্র্য বিমোচন অসম হয়ে গেছে।
- **"ঋণ-সীমার" বাধা:** ব্যাংক সংযোগের উন্নতি হলেও, অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ভোগ-ভিত্তিক ঋণ থেকে বেরিয়ে উৎপাদনশীল মূলধন বিনিয়োগের দিকে অগ্রসর হতে হিমশিম খাচ্ছে। ভৌত জামানত (Physical Collateral) না থাকায় ব্যাংকগুলি উচ্চ-মূল্যের ঋণ দিতে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত।
- **"লখপতি দিদি"-দের স্থায়িত্ব:** জীবনধারণের ন্যূনতম আয় থেকে ১ লক্ষ টাকার ধারাবাহিক বার্ষিক মুনাফায় পৌঁছানোর জন্য বাজার বুদ্ধিমত্তা (Market Intelligence) এবং **ভালু-চেইন ইন্টিগ্রেশন** প্রয়োজন, যা বর্তমানে অনেক প্রাথমিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেই।
- **প্রশাসনিক অত্যধিক চাপ:** কমিউনিটি রিসোর্স পারসন (CRPs) এবং ব্যাংক সখীরা প্রায়শই একাধিক সরকারি প্রকল্পের কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকেন, যা সামাজিক সংহতি (Social Mobilization) এবং আর্থিক মেন্টরিং-এর মতো তাদের মূল কাজের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে।

২. বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ: আন্তঃসীমান্ত অভিযোজন সমস্যা

গ্লোবাল সাউথের (বিশেষ করে আফ্রিকা) দেশগুলিতে একটি "সামাজিক-খাত প্রতিষ্ঠান" রপ্তানি করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিল বাহ্যিক চলক কাজ করে।

- **সামাজিক-রাজনৈতিক এবং ভূমি বৈচিত্র্য:** ভারতের স্বনির্ভর গোষ্ঠী মডেলটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের স্থানীয় শাসন এবং স্থিতিশীল ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। অনেক আফ্রিকান দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতীয় আইন এবং ভূমির মালিকানার ধরণ কৃষি-ভিত্তিক যৌথ উদ্যোগ গঠনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
- **ডিজিটাল বিভাজন এবং পরিকাঠামো ঘাটতি:** ভারতের সাফল্য এখন আধার (Aadhaar) এবং UPI-এর মতো ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (DPI) ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কম ডিজিটাল অনুপ্রবেশ বা অনিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকা দেশগুলি এই মডেলের "ফিনটেক" (Fintech) দিকটি (যেমন- মোবাইল ব্যাংকিং বা ডিজিটাল লেজার) বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হয়।
- **ঋণ ঝুঁকি এবং ব্যাংকিং খাতের অনুন্নয়ন:** অনানুষ্ঠানিক ক্ষুদ্র ঋণ থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংক সংযোগে উত্তরণের জন্য একটি শক্তিশালী গ্রামীণ ব্যাংকিং খাত প্রয়োজন। গ্লোবাল সাউথের অনেক অংশে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক (RRBs) বা সমবায় নেটওয়ার্কের অভাব শেষ প্রান্তের ঋণ পরিষেবা প্রদানকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের সময়কাল:** সামাজিক সংহতি রাতারাতি সফল হয় না। একটি প্রশিক্ষিত ক্যাডার (মানব সম্পদ) তৈরি করতে বছরের পর বছর রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রয়োজন। অংশীদার দেশগুলো প্রায়ই দ্রুত ফলাফল চায়, যা NRLM কাঠামোর ধীর ও রূপান্তরমূলক প্রকৃতির পরিপন্থী।

- **সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য:** সম্মিলিত কার্যক্রম মূলত সামাজিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। ভিন্ন সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিবাদী মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজে ভারতের "পিয়র-প্রেসার" বা পারস্পরিক চাপের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের মডেলটি সফল করতে হলে ব্যাপক স্থানীয়করণ প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ - একটি সমন্বিত রোডম্যাপ

এই কূটনৈতিক হাতিয়ারটির প্রভাব সর্বোচ্চ করতে ভারতকে জ্ঞান বিনিময়ের একটি আনুষ্ঠানিক ও সমন্বিত কাঠামোর দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

- **ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগ:** ONDC, GeM এবং PM Vishwakarma-এর মতো প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে বড় করার মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবনধারণের পর্যায়ে থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে, যাতে গ্রামীণ পণ্যগুলি জাতীয় ও বিশ্ব বাজারে পৌঁছাতে পারে।
- **জলবায়ু-সহনশীল এবং সামগ্রিক সমন্বয়:** জীবিকার তালিকায় অ্যাগ্রোফরিস্ট্রি, সৌরশক্তি উদ্যোগ এবং জল সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে NRLM-স্বাস্থ্য-পুষ্টি সংযোগকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক লাভ মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নতি ঘটায়।
- **বৈশ্বিক জ্ঞান বিনিময় পরিকাঠামো:** ভারতের সফল রাজ্য মডেলগুলিকে (যেমন- কেরালা বা বিহারের JEEViKA) আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে যুক্ত করতে বিদেশ মন্ত্রক (MEA) এবং পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রকের (MoRD) যৌথ তত্ত্বাবধানে একটি নিবেদিত 'গ্রামীণ জীবিকা জ্ঞান বিনিময় প্ল্যাটফর্ম' স্থাপন করতে হবে।
- **প্রযুক্তিগত প্যাকেজ (DPI ইন্টিগ্রেশন):** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সাথে ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI) দক্ষতা, বিশেষ করে UPI এবং DBT (সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর) ব্যবস্থাকে যুক্ত করে গ্লোবাল সাউথের জন্য একটি "প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে" উন্নয়ন প্যাকেজ অফার করতে হবে।
- **সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ইমার্সন ফেলোশিপ:** ITEC-সংযুক্ত প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ করতে হবে এবং বিদেশী আমলা ও সামাজিক নেতাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইমার্সন ফেলোশিপ প্রদান করতে হবে, যাতে তারা ভারতের এই মিশনের সামাজিক কৌশল এবং সূক্ষ্ম কার্যপ্রণালীগুলি হাতে-কলমে শিখতে পারেন।
- **বৈশ্বিক শংসাপত্রের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব:** কমিউনিটি রিসোর্স পারসনদের (CRPs) প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতিকে মানসম্মত করতে হবে যাতে একটি বিশ্বস্বীকৃত দক্ষ বাহিনী তৈরি হয়, যারা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে মেন্টর হিসেবে কাজ করতে পারবে।
- **কৌশলগত ত্রিপর্যায় এবং বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্ব:** বিশ্ব ব্যাংক বা আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (AfDB)-এর মতো বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে হবে যেখানে ভারত প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদান করবে এবং বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলি অংশীদার দেশগুলিতে পাইলট প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করবে।

উপসংহার

NRLM এটি প্রমাণ করেছে যে, ভারত এমন কিছু তৃণমূল পর্যায়ে সমাধান (grassroots solutions) তৈরি করতে সক্ষম যা বিশ্বজুড়ে প্রয়োগযোগ্য, এবং এটি গ্রামীণ রূপান্তরকে একটি শক্তিশালী কূটনৈতিক সম্পদে (diplomatic asset) পরিণত করেছে। এই জ্ঞান-বিনিময় প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে, নতুন দিল্লি বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের একটি নতুন দৃষ্টান্ত (paradigm) স্থাপন করেছে—যা সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে।

Q. The success of NRLM lies not only in poverty alleviation but in building sustainable community institutions. Critically Examine and suggest a comprehensive roadmap for its effective expansion. 15 Marks

2.1.18. ভারতে ইউনিয়ন প্রথার দুর্বল হওয়া এবং শ্রমিক অধিকারের ওপর তার প্রভাব

ভূমিকা

- সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ভারতে শ্রমিকদের এক বিশাল আন্দোলনের ঢেউ দেখা গেছে, যেখানে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি (Higher Minimum Wages), ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) এবং কাজের চুক্তিভিত্তিকরণ (Contractualisation) বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। বিশেষ করে উৎপাদন (Manufacturing) খাতের এই আন্দোলনগুলি ট্রেড ইউনিয়নের (Trade Unions) ভূমিকাকে পুনরায় আলোচনায় নিয়ে এসেছে।
- ইউনিয়ন প্রথার এই দুর্বল হওয়া, যা প্রায়ই ডি-ইউনিয়নাইজেশন (Deunionisation) নামে পরিচিত, শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা (Bargaining Power) হ্রাস এবং তাদের অধিকার খর্ব হওয়া নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।



পটভূমি

১. ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ডি-ইউনিয়নাইজেশনের ক্রমবিবর্তন

- ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। এটি মূলত ঔপনিবেশিক শ্রম পরিস্থিতি এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল। বস্ত্রকল, রেলওয়ে এবং বন্দরের শ্রমিকরা উন্নত মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং আইনি সুরক্ষার দাবিতে নিজেদের সমিতি ও ইউনিয়ন (Associations and Unions) হিসেবে সংগঠিত করতে শুরু করেন।
- ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৬-এর মাধ্যমে প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি: এই আইনের মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনগুলি প্রথম আইনি স্বীকৃতি পায়। এতে ট্রেড ইউনিয়নকে এমন এক সমন্বয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা মূলত শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গঠিত হয়। এই আইন নিবন্ধনের (Registration) আইনি ভিত্তি তৈরি করার পাশাপাশি রাষ্ট্রকে ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর যৌক্তিক বিধিনিষেধ (Reasonable Restrictions) আরোপের ক্ষমতাও দেয়।
- স্বাধীনতা-পরবর্তী সংগঠন: স্বাধীনতার পর শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ (Industrial Disputes Act, 1947) এবং ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮ (Minimum Wages Act, 1948) সংগঠিত শ্রমিকদের জন্য একটি সুরক্ষামূলক কাঠামো (Protective Framework) তৈরি করে।
- ডিরিজিবল মডেল (Dirigisme Model/রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা)-এর অধীনে সরকারি খাতের সম্প্রসারণ ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে। তারা মজুরি নির্ধারণ (Wage Bargaining), বিবাদ মীমাংসা এবং নীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।
- অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর পরিবর্তন: ১৯৯১ সালের উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়ন (LPG Reforms) একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।
- বাজারের প্রতিযোগিতা এবং শ্রমের নমনীয়তার (Labour Flexibility) দিকে ঝোঁক বাড়ায় সরকারি খাতের কর্মসংস্থান কমে যায় এবং আউটসোর্সিং (Outsourcing), চুক্তিভিত্তিক শ্রম ও মানহীন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।
- এর ফলে, অসংগঠিত ক্ষেত্র (Informal Sector) শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ দখল করে নেয় এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দরকষাকষির ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. ট্রেড ইউনিয়নের আইনি ভিত্তির সাংবিধানিক বিধান

- অনুচ্ছেদ ১৯(১)(গ): এটি সমিতি বা ইউনিয়ন গঠন করার মৌলিক অধিকার (Fundamental Right) প্রদান করে, যা ট্রেড ইউনিয়নকে সম্মিলিত পদক্ষেপের একটি বৈধ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

- **অনুচ্ছেদ ১৯(৪):** এটি জনশৃঙ্খলা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতার স্বার্থে রাষ্ট্রকে ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর যৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপের অনুমতি দেয়।
- **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (DPSP) শ্রম কল্যাণের ওপর জোর দেয়:**
 - **অনুচ্ছেদ ৪৩:** শ্রমিকদের জন্য **জীবনধারণের উপযোগী মজুরি (Living Wage)** এবং মানসম্মত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়।
 - **অনুচ্ছেদ ৪৩এ (43A):** শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণকে (Worker Participation) উৎসাহিত করে, যা **শিল্প গণতন্ত্র (Industrial Democracy)** শক্তিশালী করে।
- এই বিধানগুলি সামগ্রিকভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শ্রমিক কল্যাণের প্রতি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

৩. ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের পরিধি নির্ধারণে বিচারবিভাগীয় রায়

- **অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন বনাম ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল (১৯৬২):** সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে, সংগঠন করার অধিকার মৌলিক হলেও, স্বীকৃতি পাওয়া বা যৌথ দরকষাকষির (Collective Bargaining) অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- **কামেশ্বর প্রসাদ বনাম বিহার রাজ্য (১৯৬২):** আদালত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও বলেছে যে, ধর্মঘট বা স্ট্রাইক (Strikes) যৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- **টি.কে. রঙ্গরাজন বনাম তামিলনাড়ু সরকার (২০০৩):** আদালত রায় দিয়েছে যে, সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার কোনো মৌলিক অধিকার নেই, যা শ্রমিকদের আন্দোলনের ওপর নিয়ন্ত্রক সীমাবদ্ধতাকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে।
- এইভাবে, বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যাগুলি শ্রম অধিকার এবং বৃহত্তর জনস্বার্থের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।

সমসাময়িক শ্রমবাজারে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব

১. যৌথ দরকষাকষি এবং মজুরি নির্ধারণ

- ট্রেড ইউনিয়নগুলি **যৌথ দরকষাকষির (Collective Bargaining)** প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পরিবর্তে একটি **ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী (Unified Group)** হিসেবে মজুরি, কাজের সময়, চাকরির নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দেয়।
- যখন ইউনিয়নগুলি শক্তিশালী থাকে, তখন নিয়োগকর্তারা **সংলাপে বসতে (Engage in dialogue)** বাধ্য হন এবং একতরফাভাবে কোনো প্রতিকূল শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ কম থাকে।
- শ্রমিকদের স্বার্থকে একত্রিত করার মাধ্যমে, ইউনিয়নগুলি **নিয়োগকর্তার আধিপত্য (Employer Dominance)** প্রতিহত করতে সাহায্য করে এবং **শোষণমূলক মজুরি প্রথা (Exploitative Wage Practices)** প্রতিরোধ করে—বিশেষ করে সেইসব বৃহৎ শিল্পে যেখানে শ্রমের যোগান বেশি কিন্তু শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা কম।
- **যৌথ দরকষাকষি ন্যায্য মজুরি (Fair Wages)**, ওভারটাইমের নিয়ম এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, যা **শ্রমের অবমূল্যায়ন (Undervalued Labour)** এবং **মানবতর কর্মপরিবেশের (Abusive Working Conditions)** ঝুঁকি কমায়।

২. বিরোধ নিষ্পত্তি এবং শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রীতি

- ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য **সমঝোতা বোর্ড (Conciliation Boards)**, শ্রম আদালত এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ ফোরামে অংশগ্রহণ করে।
- এই **প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা (Institutionalised Negotiation)** শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং নিশ্চিত করে যে বিরোধগুলি দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট বা সহিংস আন্দোলনের পরিবর্তে **আইনি ও সুসংগঠিত প্রক্রিয়ার (Legal and Structured Processes)** মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

- শক্তিশালী ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে বিরোধগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ (Unresolved) থেকে যায়, যা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট, লকআউট বা সংঘাতের দিকে পরিচালিত করে, যা শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষেরই ক্ষতি করে।
- আলোচনার স্থিতিশীল মাধ্যমের (Stable Channels for Negotiation) অভাব শিল্পাঞ্চলগুলিতে সামাজিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী শিল্প শান্তি (Industrial Peace) বিঘ্নিত করে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা এবং নীতিগত সওয়াল

- ট্রেড ইউনিয়নগুলি ওকালতি বা সওয়ালকারী সংস্থা (Advocacy Bodies) হিসেবে কাজ করে, যারা পেনশন স্কিম, স্বাস্থ্য বিমা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং বেকারত্ব সুরক্ষাসহ সামাজিক সুরক্ষা জালের (Social Security Nets) বিস্তারের জন্য চাপ দেয়।
- তারা আইনগত সংস্কার (Legislative Reforms), শ্রম আইনের আরও ভালো প্রয়োগ এবং অসংগঠিত ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষার জন্য প্রচার চালায়।
- কেরালা এবং তামিলনাড়ুর মতো যেসব রাজ্যে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন রয়েছে, সেখানে শ্রমিকরা ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমে উচ্চতর ন্যূনতম মজুরি (Higher Minimum Wage Settlements) এবং আরও শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।
- ইউনিয়নগুলি সরকারি প্রকল্প এবং নিয়োগকর্তাদের নিয়মনীতি পালনের বিষয়টি তদারকি করে, যাতে শ্রমিকরা কেবল কাগজে-কলমে নয় বরং বাস্তবেও সুবিধা পায়; এর ফলে সামাজিক সুরক্ষার ফাঁকফোকরগুলি (Gaps in Social Protection) পূরণ হয়।

৪. মনস্তাত্ত্বিক এবং কাঠামোগত ক্ষমতায়ন

- ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ শ্রমিকদের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতায়ন (Psychological Empowerment) এবং একটি যৌথ পরিচয় (Collective Identity) প্রদান করে, যা তাদের অধিকার, আইনি সুরক্ষা এবং আলোচনার কৌশলগুলি বুঝতে সাহায্য করে।
- এটি চাকরি হারানো, বৈষম্য বা হেনস্থার ভয় কমায় এবং শ্রমিকদের তাদের দাবি আদায়ে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।
- কাঠামোগতভাবে, শক্তিশালী ইউনিয়নগুলি ম্যানেজমেন্টের স্বৈচ্ছাচারী ক্ষমতার (Arbitrary Managerial Authority) ওপর নজরদারি হিসেবে কাজ করে। তারা নিশ্চিত করে যে ছাঁটাই, বদলি এবং শাস্তিমূলক পদক্ষেপগুলি যেন স্বচ্ছ প্রক্রিয়া (Transparent Procedures) এবং যথাযথ নিয়ম মেনে পরিচালিত হয়।
- এটি কর্মক্ষেত্রে ন্যায্যতা এবং একটি সমমর্যাদার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি, প্রতিনিধিত্ব শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য বা মতপ্রকাশ (Voice), সক্রিয়তা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে।

ট্রেড ইউনিয়নকরণের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং প্রভাব

১. ইউনিয়নের ঘনত্ব হ্রাস (Declining Union Density)

- বর্তমানে মোট শ্রমশক্তির মধ্যে ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার হার মাত্র ৬.৩%; যার মধ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রে মাত্র ১.৮% এবং সরকারি ক্ষেত্রে ১১.৮%। এই নিম্ন হার মূলত অসংগঠিত কর্মসংস্থানের (Informal Employment) প্রসারের প্রতিফলন, যেখানে অর্ধেক বা তার বেশি শ্রমিক কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি, সংবিধিবদ্ধ সুরক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই কাজ করেন।
- অসংগঠিত শ্রমিক—যেমন কৃষিশ্রমিক, গৃহকর্মী, নির্মাণ শ্রমিক এবং হকারদের সংগঠিত করা কঠিন, কারণ তারা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন, তাদের মজুরি কম এবং মালিকের সাথে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক নেই।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (Micro-enterprises and small-scale industries) বৃদ্ধি ইউনিয়ন গঠনকে আরও জটিল করে তোলে, কারণ এই কর্মক্ষেত্রগুলোতে যৌথ দরকষাকষির জন্য প্রয়োজনীয় পরিধি ও দৃশ্যমানতার অভাব রয়েছে।

২. বিভাজন, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং গ্রহণযোগ্যতার সংকট

- ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি **রাজনৈতিক আদর্শের (Political Lines)** ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে বিভক্ত। একই শ্রমশক্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক ফেডারেশন থাকায় অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়, যা তাদের দরকষাকষির **শক্তি (Bargaining Strength)** কমিয়ে দেয়।
- অনেক শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন হিসেবে না দেখে **রাজনৈতিক দলের শাখা (Extensions of Political Parties)** হিসেবে গণ্য করেন, যা সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে সংশয় ও অনাগ্রহ তৈরি করে। এই **রাজনীতিকরণ (Politicisation)** ইউনিয়নগুলোর বৈধতা ও কার্যকারিতা নষ্ট করে।
- আস্থার এই অভাব সংকটের সময়ে শ্রমিকদের **একত্রিত করার (Mobilise workers)** ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, যার ফলে নীতি নির্ধারণ বা দরকষাকষিতে ইউনিয়নের প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে।

৩. শ্রম বিধির (Labour Codes) অধীনে আইনি ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

- সাম্প্রতিক **শ্রম বিধিসমূহ**—মজুরি বিধি, শিল্প সম্পর্ক বিধি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধি এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিধি—ইউনিয়ন প্রথায় বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে।
- একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো ইউনিয়ন গঠনের জন্য **উচ্চতর সীমা (Higher Threshold)**: আগে যেখানে মাত্র ৮ জন শ্রমিক মিলে ইউনিয়ন নিবন্ধন করতে পারতেন, নতুন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমশক্তির প্রায় **১০% শ্রমিকের** সমর্থন প্রয়োজন। এর ফলে ছোট ইউনিয়নগুলোর পক্ষে সংবিধিবদ্ধ স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।
- এছাড়া, এই বিধিগুলি কিছু ক্ষেত্রে শ্রম দপ্তরের **রাষ্ট্রীয় তদারকি (State Supervision)** কমিয়ে দিয়েছে, যা ইউনিয়ন অধিকার রক্ষা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ভারসাম্য নষ্ট করেছে। বাস্তবে এটি নিয়োগকর্তাদের পক্ষে ক্ষমতার পাল্লা ভারী করতে পারে।

৪. চুক্তিভিত্তিক শ্রম, গিগ অর্থনীতি এবং নমনীয় কর্মসংস্থান

- বর্তমানে শ্রমিকদের প্রায়ই প্রধান নিয়োগকর্তার সাথে কোনো **সরাসরি কর্মসংস্থান সম্পর্ক (Direct Employment Relationships)** থাকে না, ফলে ইউনিয়নগুলোর পক্ষে তাদের হয়ে দরকষাকষি করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- মূল কাজগুলো **আউটসোর্সিং (Outsourcing)** করা এবং শ্রমশক্তির খণ্ডিতকরণ প্রথাগত ইউনিয়ন কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। **গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকরা (Gig and Platform Workers)** ডিজিটাল অ্যাপ ও অ্যালগরিদমের মাধ্যমে কাজ করেন, যেখানে কোনো নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র বা প্রথাগত সুপারভাইজার নেই।
- এই **প্রযুক্তিগত বিচ্ছুরণ (Technological Dispersion)** প্রথাগত যৌথ দরকষাকষির মডেল প্রয়োগ করা কঠিন করে তোলে এবং গিগ কাজের ক্ষেত্রে প্রকৃত 'নিয়োগকর্তা' কে—তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশালী করতে এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কিছু সফল মডেল অনুসরণ করে:

- **নর্ডিক মডেল (সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে):** এই দেশগুলোতে সরকার, মালিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে একটি **শক্তিশালী ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা (Tripartite Systems)** রয়েছে, যা সামাজিক সংলাপ এবং যৌথ দরকষাকষি নিশ্চিত করে।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** জাতীয় শ্রম সম্পর্ক আইন (NLRA) শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার রক্ষা করে এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখে।
- **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO):** ILO কনভেনশন নং ৮৭ (সংগঠন করার স্বাধীনতা) এবং নং ৯৮ (যৌথ দরকষাকষির অধিকার)—এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শ্রম অধিকার রক্ষার একটি কাঠামো প্রদান করে।

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় আগামীর পথ

ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনগুলির বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে:

- **আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা (Strengthen Legal Frameworks):** শ্রমিক সংগঠন বা ইউনিয়ন গঠনের বাধা (Threshold) কমানোর জন্য শ্রম বিধি (Labour Codes) সংশোধন করা প্রয়োজন। এছাড়া নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন বা হুমকি থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। **যৌথ দরকষাকষি (Collective Bargaining)** এবং বিরোধ নিষ্পত্তির আইনি ধারাগুলিকে আরও জোরালো করতে হবে।
- **ইউনিয়নকরণ বৃদ্ধি করা (Promote High Unionisation):** সচেতনতা প্রচার, শিক্ষা এবং জনসংযোগের মাধ্যমে **অসংগঠিত ক্ষেত্র (Informal Sector)** এবং তরুণ শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গঠনের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। ছোট ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন গঠনের প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানানো প্রয়োজন।
- **সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি (Enhance Social Security):** গিগ (Gig) এবং প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকসহ সকল স্তরের শ্রমিকের জন্য **সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা (Universal Social Security)** স্কিম চালু করতে হবে। বেকারত্ব, স্বাস্থ্য এবং বার্ধক্যজনিত সুবিধাগুলি যাতে সময়মতো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- **সামাজিক সংলাপ উৎসাহিত করা (Foster Social Dialogue):** সরকার, নিয়োগকর্তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন—এই তিন পক্ষকে নিয়ে গঠিত **ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা (Tripartite Mechanisms)** পুনরায় সক্রিয় করতে হবে যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হয়। কর্মক্ষেত্র, শিল্প খাত এবং জাতীয় স্তরে সামাজিক সংলাপকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- **শোষণ প্রতিরোধ করা (Combat Exploitation):** চুক্তিভিত্তিক শ্রমের (Contract Labour) বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রম পরিদর্শন (Labour Inspection) এবং আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
- **শ্রমিক ক্ষমতায়ন (Empower Workers):** শ্রমিকদের অধিকার, যৌথ দরকষাকষি এবং ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ইউনিয়নের নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সাধারণ শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।
- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (International Collaboration):** বিশ্বব্যাপী শ্রমের মানদণ্ড বজায় রাখতে এবং সেরা অনুশীলনগুলি (Best Practices) গ্রহণ করতে **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)**-এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

উপসংহার

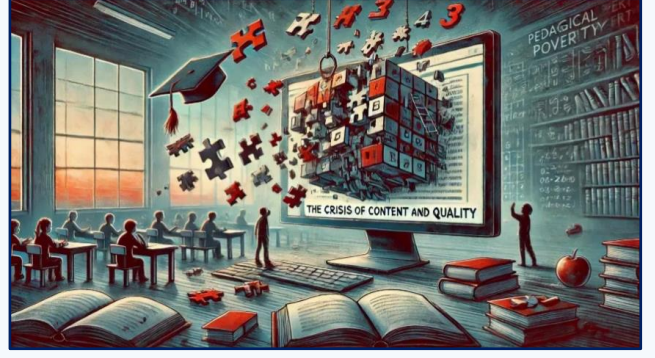
যদিও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রথাগত ইউনিয়ন কাঠামোকে দুর্বল করেছে, তবুও **ন্যায্য মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ** নিশ্চিত করতে এদের প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য। তাই একটি ন্যায্যসঙ্গত এবং টেকসই শ্রম শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অভিযোজনযোগ্য কৌশলের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে **পুনরুজ্জীবিত করা (Revitalising)** অত্যন্ত জরুরি।

Q. The weakening of trade unions in India has significantly altered the balance of power in labour markets. Critically examine the causes of declining unionisation and its impact on workers' rights in India. 15 Marks

2.1.19. ভারতের শিক্ষার সংকট: বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং শিক্ষার ফলাফলের মধ্যে ব্যবধান দূর করা

ভূমিকা: অগ্রগতির এক অদ্ভুত বৈপরীত্য

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে। শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act), ২০০৯-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় ১০০ শতাংশের কাছাকাছি (৯৮%-এর বেশি) ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত হয়েছে। তবে এই সংখ্যাগত সাফল্য একটি গভীর গুণগত সংকটকে আড়াল করে রাখছে। ASER (Annual Status of Education Report)-এর তথ্য বারবার দেখাচ্ছে যে, পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় ৫০% শিক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য



বই পড়তে পারে না এবং অনেকেই সাধারণ পাটিগণিত সমাধান করতে হিমশিম খায়। বিশ্বব্যাপক এই পরিস্থিতিতে "লার্নিং পভার্টি" বা "শিক্ষার দারিদ্র্য" হিসেবে বর্ণনা করেছে, যার অর্থ হলো ১০ বছর বয়সের মধ্যে একটি সহজ পাঠ্য পড়ে বোঝার অক্ষমতা।

ভারত এখন এমন এক 'নিম্ন-শিক্ষা ভারসাম্য'-এর মধ্যে আটকা পড়েছে, যেখানে শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু মৌলিক দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। আসল বিষয় এই সংকটের অন্তিত্ব নিয়ে নয়, বরং এটি সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তৎপরতার অভাব নিয়ে।

তাৎপর্য: কেন মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান (FLN) জরুরি?

ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমেরেসি (FLN) বা মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান হলো সেই ভিত্তি যার ওপর ভবিষ্যতের সমস্ত শিক্ষা এবং বিকাশ নির্ভর করে। এর গুরুত্ব বিভিন্ন দিক থেকে অপরিসীম:

১. সারাজীবনের শিক্ষার জন্য বৌদ্ধিক ভিত্তি FLN শিশুদের "পড়তে শেখা" থেকে "শেখার জন্য পড়া"-র স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করে। এই মৌলিক ক্ষমতা না থাকলে উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক দক্ষতা এবং বিষয়ের গভীর জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা মানসম্মত শিক্ষা সরাসরি অর্থনৈতিক ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, কার্যকরভাবে কাটানো প্রতিটি অতিরিক্ত শিক্ষা বছর একজন ব্যক্তির উপার্জন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। তাই দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে FLN একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
৩. সামাজিক সমতা এবং ন্যায়বিচার শিক্ষার নিম্নমানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী, যেমন—তফসিলি জাতি/উপজাতি (SC/ST) এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ওপর। দারিদ্র্যের আন্তঃপ্রজন্ম চক্র ভাঙতে এবং সংবিধানের ধারা ২১-এ (Article 21A) ও ৪৫-এর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সর্বজনীন FLN নিশ্চিত করা অপরিহার্য।
৪. জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) অর্জন ভারতের মধ্যক বয়স (median age) বর্তমানে ২৮ বছর, যা দেশের জন্য একটি বিশাল সুযোগ। কিন্তু পর্যাপ্ত মৌলিক দক্ষতা না থাকলে এই তরুণ প্রজন্ম দেশের সম্পদ হওয়ার পরিবর্তে এক বিশাল কর্মসংস্থানহীন বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
৫. গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ শক্তিশালী করা একজন শিক্ষিত এবং অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নাগরিক গণতান্ত্রিক কাজে আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারেন।
৬. বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা এবং বিকশিত ভারত @২০৪৭ ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্য পূরণে একটি দক্ষ ও মানিয়ে নিতে সক্ষম কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা এবং বিশ্বজুড়ে ভারতের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধির মূল ভিত্তি হলো উচ্চমানের শিক্ষার ফলাফল।

চ্যালেঞ্জ বা বাধা: "তৎপরতার অভাব"-এর স্বরূপ

দৃঢ় নীতিগত লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষার ফলাফল উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তৎপরতা বেশ কিছু কাঠামোগত এবং আচরণগত কারণে এখনো দুর্বল:

১. রাজনৈতিক অর্থনীতিতে গুরুত্বের অভাব

- শিক্ষা সংস্কার, বিশেষ করে শিক্ষার মানোন্নয়ন বা লার্নিং আউটকাম উন্নত করার ফলাফল আসতে অনেক বছর সময় লাগে, যা প্রায়ই একটি নির্বাচনী চক্রের সময়ের চেয়েও বেশি।
- তাই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিকাঠামো, ভর্তুকি বা বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের মতো **দৃশ্যমান এবং তাৎক্ষণিক** লাভজনক কাজগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেন, যা ভোটারদের কাছ থেকে দ্রুত স্বীকৃতি এনে দেয়।
- এর ফলে, বৌদ্ধিক বিকাশ বা **FLN** (মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাভাজন)-এর মতো অদৃশ্য বিষয়গুলো নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব ও কম মনোযোগ পায়।

২. শেখার ঘাটতির অদৃশ্যতা

- শারীরিক বা বাহ্যিক কোনো অভাবের মতো শিক্ষার ঘাটতি সরাসরি চোখে দেখা যায় না, ফলে এটি জনমনে উদ্বেগ বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ তৈরি করতে পারে না।
- ব্ল্যাকবোর্ড থেকে দেখে লেখা বা মুখস্থ করার মতো গতানুগতিক ক্লাসরুমের কাজগুলো একটি **ভুল ধারণা** তৈরি করে যে শিশুটি প্রকৃত অর্থে শিখছে।
- নিয়মিত এবং নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নের অভাবে এই লুকানো ঘাটতিগুলো ধরা পড়ে না, যার ফলে নিম্নমানের ফলাফল অজানাই থেকে যায়।

৩. তথ্যের অসামঞ্জস্য (Information Asymmetry)

- **অভিভাবকদের সীমাবদ্ধতা:** অনেক অভিভাবক, বিশেষ করে যারা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, তারা সন্তানের পড়ার বা অংকের সক্ষমতা বিচার করতে পারেন না। তারা মনে করেন নিয়মিত **স্কুলে উপস্থিত** থাকাই হলো প্রকৃত শিক্ষা।
- **সচেতনতার অভাব:** ASER-এর মতো প্রতিবেদনের মানদণ্ড সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তারা নিম্নমানের শিক্ষার ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন না।
- এটি নিচুতলা থেকে দায়বদ্ধতা তৈরির প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়, কারণ স্কুলের ওপর শিক্ষার গুণমান বাড়ানোর জন্য স্থানীয় স্তরে তেমন কোনো চাপ থাকে না।

৪. সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মধ্যবিত্তের প্রস্থান

- মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকে পড়ায় সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তাদের সরাসরি কোনো স্বার্থ থাকে না।
- এর ফলে, সরকারি স্কুলের গুণমান, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য যেসব প্রভাবশালী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন ছিল, তারা এই ব্যবস্থার বাইরে থেকে যান।
- এটি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত চাপ কমিয়ে দেয়।

৫. "যোগ্যতা"-র ফাঁদ (The "Ability" Trap)

- শিক্ষার নিম্নমানের জন্য প্রায়ই শিশুর জন্মগত বুদ্ধি বা প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশকে দায়ী করা হয়, কিন্তু স্কুলের কার্যকারিতাকে নয়।
- এটি শিক্ষার গুণমান, পাঠদান পদ্ধতি বা পাঠ্যক্রমের মতো পদ্ধতিগত ত্রুটি থেকে দায়বদ্ধতাকে সরিয়ে দেয়।
- ফলে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত সংস্কারগুলো পিছিয়ে যায় বা গুরুত্ব হারায়।

৬. দুর্বল জবাবদিহিতা ব্যবস্থা

- ক্ষমতার কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক এবং প্রশাসকরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন, যেখানে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের প্রভাব থাকে খুবই কম।

- এই ভারসাম্যহীনতা পাঠদানের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলাকে নিরুৎসাহিত করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর নজরদারি কমিয়ে দেয়।
- ফলস্বরূপ, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (SMC) গুলো শেখার মান উন্নয়নের পরিবর্তে কেবল নিয়ম পালনেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৭. নীতি এবং বাস্তবায়নের মধ্যে দূরত্ব

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং নিপুণ ভারত (NIPUN Bharat) মিশনের মতো পরিকল্পনাগুলো চমৎকার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- তবে তৃণমূল স্তরে তদারকির অভাব, প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবে এই নীতিগুলো সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না।

বৈশ্বিক উদাহরণ: ভিয়েতনাম থেকে শিক্ষা

ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, ভিয়েতনাম PISA-এর মতো বৈশ্বিক মূল্যায়নে উন্নত দেশগুলোর সমতুল্য শিক্ষার মান অর্জন করেছে।

ভিয়েতনামের সাফল্যের মূল কারণ:

- **সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম:** অনেক বিষয়ের ওপর ভাষা-ভাষা জ্ঞানের বদলে মূল দক্ষতাগুলোতে (Core Skills) পারদর্শিতা অর্জনে জোর দেওয়া।
- **সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা:** শিক্ষকদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ রাখা হয়, আবার একইসাথে তাদের পেশাগত সম্মান এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সামাজিক গুরুত্ব: শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখা হয়, যা সমাজের সব স্তরে একতাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি তৈরি করে।

শিক্ষার সংকট নিরসনে সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ

১. জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০

- **মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান (FLN)**-কে একটি জরুরি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- এটি মুখস্থ বিদ্যার বদলে দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রকৃত ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দেয়।

২. নিপুণ ভারত মিশন (NIPUN Bharat Mission)

- এটি একটি বিশেষ উদ্যোগ যার লক্ষ্য হলো ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন FLN নিশ্চিত করা।
- এটি সরাসরি এই নিবন্ধে আলোচিত শিক্ষার সংকট মোকাবিলায় কাজ করছে।

৩. দীক্ষা (DIKSHA)

- ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে।

ভবিষ্যৎ পথ: "সবার জন্য স্কুল" থেকে "সবার জন্য শিক্ষা"

শিক্ষার সংকট দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার প্রয়োজন:

১. **শিক্ষাকে দৃশ্যমান করা:** স্থানীয় স্তরে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুর পড়ার ক্ষমতা জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে, যাতে এটি একটি জরুরি সামাজিক ইস্যুতে পরিণত হয়।
২. **পাঠদান পদ্ধতিতে সংস্কার:** শিশুর বর্তমান শেখার স্তরের ওপর ভিত্তি করে পড়ানোর পদ্ধতি (যেমন—Teaching at the Right Level) গ্রহণ করতে হবে।

৩. ফলাফল-ভিত্তিক নজরদারি: পরিকাঠামো বা স্কুলে ভর্তির সংখ্যার বদলে ছাত্রছাত্রীরা কতটুকু শিখল, তার ভিত্তিতে সাফল্যের পরিমাপ করতে হবে।
৪. স্থানীয় দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি: স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে (SMC) ক্ষমতা প্রদান এবং বিকেন্দ্রীকৃত শাসনের মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণ বাড়ানো।
৫. প্রযুক্তি ব্যবহার: DIKSHA-র মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শেখার ঘাটতি মেটানো।

উপসংহার

কোঠারি কমিশন বলেছিল, "ভারতের ভাগ্য তার শ্রেণীকক্ষে গড়ে উঠছে।" দশকের পর দশক পরেও এই কথাটি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ভারত সবাইকে স্কুলে পাঠাতে সফল হয়েছে, কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ হলো সবাইকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আমাদের এই 'স্কুলে যাওয়ার বিভ্রম' থেকে বেরিয়ে এসে 'প্রকৃত শেখার' দিকে এগোতে হবে। প্রতিটি শিশুর মৌলিক দক্ষতা নিশ্চিত করা কেবল একটি শিক্ষাগত লক্ষ্য নয়, এটি একটি জাতীয় আবশ্যিকতা।

Q. Schooling is not synonymous with learning. In the context of India's education sector, critically examine the structural and behavioral barriers that have resulted in a 'low-learning equilibrium' despite high enrolment rates. 15 Marks

2.1.20. গণতন্ত্র এক সন্ধিক্ষণে: পতনের লক্ষণ এবং স্থিতিস্থাপকতার পথ

ভূমিকা: গণতন্ত্র এক সন্ধিক্ষণে

গণতন্ত্রকে দীর্ঘকাল ধরে শাসনের সবচেয়ে বৈধ রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা এবং স্বাধীনতার আদর্শকে ধারণ করে। গত এক শতাব্দীতে এটি বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং বিশ্বজুড়ে সমাজের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিশালী নেতাদের উত্থান, প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন হ্রাস এবং অপপ্রচারের বিস্তারের মতো প্রবণতাগুলো গণতন্ত্রের পশ্চাদগমন বা পতন নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। "অনুদার গণতন্ত্র"-এর উত্থান এই পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে, যেখানে নির্বাচন হয় ঠিকই কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়।



গণতন্ত্রের গুরুত্ব: কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার উর্ধ্ব

১. **সম্মতির মাধ্যমে বৈধতা:** গণতন্ত্র তার নৈতিক কর্তৃত্ব পায় জনগণের সম্মতি থেকে। জন লক যেমন যুক্তি দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা তখনই যুক্তিসঙ্গত হয় যখন এটি ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে। এটি গণতন্ত্রকে সহজাতভাবেই জবাবদিহিমূলক করে তোলে।
২. **অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা:** গণতন্ত্র বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশ এবং সংগঠনের স্বাধীনতার মতো নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে, যা নিশ্চিত করে যে ব্যক্তির জীবনে অর্থবহভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
৩. **জনসাধারণের যুক্তিবাদিতার প্ল্যাটফর্ম:** অমর্ত্য সেন জোর দিয়ে বলেছেন যে, গণতন্ত্র কেবল ভোট দেওয়ার বিষয় নয়, বরং এটি "জনসাধারণের যুক্তিবাদিতা" (Public reasoning) সম্পর্কে—অর্থাৎ নাগরিকদের বিতর্ক করার, প্রশ্ন করার এবং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা।
৪. **শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার পরিবর্তন:** গণতন্ত্র ভিন্নমতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুযোগ করে দেয়, যা সহিংস সংঘাতের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

৫. **সহজাত এবং যান্ত্রিক মূল্য:** গণতন্ত্র একটি মাধ্যম (জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা) এবং একটি লক্ষ্য (মর্যাদা ও অংশগ্রহণ বজায় রাখা)—উভয় দিক থেকেই মূল্যবান। এটি কেবল একটি ব্যবস্থা নয়, বরং যৌথ জীবনকে সংগঠিত করার একটি মাধ্যম।

মূল বক্তব্য: গণতান্ত্রিক পতনের লক্ষণ

এর গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, বেশ কিছু প্রবণতা নির্দেশ করে যে গণতন্ত্র বর্তমানে চাপের মুখে রয়েছে।

১. **অনুদার গণতন্ত্রের উত্থান:** ফরীদ জাকারিয়ার বর্ণিত **অনুদার গণতন্ত্রের (Illiberal Democracy)** ধারণাটি এমন একটি ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে যেখানে নির্বাচন থাকলেও স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। ভিক্টর অরবানের অধীনে হাঙ্গেরি এর একটি বড় উদাহরণ, যেখানে নির্বাহী ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে।
২. **কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ:** ক্যারিশম্যাটিক বা প্রভাবশালী নেতাদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রায়ই আইনসভাকে কোণঠাসা করে দেয় এবং বিচার বিভাগীয় তদারকিকে দুর্বল করে। নেতারা অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়াগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারেন, যা জবাবদিহিতাকে কমিয়ে দেয়। এটি ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে নষ্ট করে।
৩. **প্রতিষ্ঠানগুলোর অবক্ষয়:** রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বিচার বিভাগ, সংবাদমাধ্যম এবং নির্বাচন সংস্থাগুলোর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এর ফলে **পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্ট** বা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দুর্বল তদারকি দেখা দিতে পারে। যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়, তখন তারা ক্ষমতার ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
৪. **অপপ্রচার এবং ডিজিটাল কারসাজি:** ভুয়া খবর এবং ভুল তথ্যের দ্রুত বিস্তার একটি বিকৃত পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে নাগরিকদের জন্য সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। **অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত (Algorithmic bias)** মেরুকরণকারী কন্টেন্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়, যা ভিন্নমতের সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।
৫. **রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার হ্রাস:** জোসেফ শম্পিটার যুক্তি দিয়েছিলেন যে, নাগরিকদের অর্থবহ পছন্দ দেওয়ার জন্য নেতাদের মধ্যে প্রকৃত প্রতিযোগিতা থাকা প্রয়োজন। যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার বা সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হয়, তখন এই প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়। ফলে গণতন্ত্র কেবল **ভোটের একটি আনুষ্ঠানিকতায়** পরিণত হয়।

আধুনিক গণতন্ত্রের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহ

গণতন্ত্রের ওপর চাপগুলো কাঠামোগত এবং উদীয়মান উভয়ই:

১. **সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ এবং সামাজিক মেরুকরণ:** অ্যালেক্সিস ডি টকভিল সতর্ক করেছিলেন যে, অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এটি বর্জন এবং পরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতিকে উৎসাহিত করে এবং সামাজিক বিভাজনকে গভীর করে।
২. **জনমোহিনী নীতির উত্থান (Rise of Populism):** জনমোহিনী রাজনীতি প্রায়ই তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনার চেয়ে আবেগপ্রবণ বর্ণনা এবং **"জনগণ বনাম অভিজাত"** কাঠামোকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর ফলে জটিল নীতিগত বিষয়গুলো সাধারণ ভ্রমের মধ্যে পরিণত হয়, যা গণতন্ত্রের গঠনমূলক আলোচনার মান কমিয়ে দেয়।
৩. **প্রতিযোগিতামূলক শাসন মডেল:** শক্তিশালী এবং কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি বিকল্প শাসন মডেলগুলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেয়ে স্থিতিশীলতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়। সংকটের সময়ে এই মডেলগুলোর কার্যকারিতা গণতান্ত্রিক আদর্শের সামনে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।
৪. **সত্যের সংকট:** যখন নাগরিকরা মৌলিক তথ্য বা সত্যের বিষয়ে একমত হতে পারে না, তখন অর্থবহ জনবিতর্ক অসম্ভব হয়ে পড়ে। তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনার জায়গা দখল করে নেয় **ভুল তথ্য ও পাল্টাপাল্টি বর্ণনা**, যা গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।
৫. **নাগরিক অংশগ্রহণের হ্রাস:** কম ভোটার উপস্থিতি এবং সীমিত নাগরিক অংশগ্রহণ নেতাদের জবাবদিহিতার চাপ কমিয়ে দেয়। নিষ্ক্রিয় নাগরিকরা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন করতে বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে কম আগ্রহী হন, যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর থেকে দুর্বল করার সুযোগ করে দেয়।

সামনের পথ: গণতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করা

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী রাখতে একটি বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. **প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা:** স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া, চাকরির মেয়াদের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষার মাধ্যমে **প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা** নিশ্চিত করতে হবে। এটি বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনের মতো সংস্থাগুলোকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে এবং আইনের শাসন বজায় রাখতে সাহায্য করে। শক্তিশালী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করে যে ক্ষমতা যেন একটি কার্যকর **তদারকি ও ভারসাম্য (Checks and Balances)** ব্যবস্থার মধ্যে থাকে।
২. **সাংবিধানিক নৈতিকতার প্রচার:** বি. আর. আম্বেদকর যুক্তি দিয়েছিলেন যে, **সাংবিধানিক নৈতিকতা** সংস্কৃতি ছাড়া কেবল প্রতিষ্ঠানের ওপর ভর করে গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। এর জন্য নাগরিক এবং নেতাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাধীনতা, সমতা এবং আইনের শাসনের মতো মূল্যবোধগুলোকে সম্মান করা প্রয়োজন। এই নৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া আনুষ্ঠানিক কাঠামোগুলো অকার্যকর বা অপব্যবহারের শিকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
৩. **অপপ্রচার মোকাবিলা:** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ভুল তথ্যের বিস্তার রোধ করতে পারে এবং ক্ষতিকর কন্টেন্টের জন্য দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারে। **মিডিয়া লিটারেসি** বা সংবাদ মাধ্যমের সাক্ষরতা নাগরিকদের তথ্য যাচাই করতে এবং কারসাজি প্রতিরোধ করতে সক্ষম করে তোলে। অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা বজায় থাকলে জনমতকে অন্যায়ভাবে বিকৃত করা রোধ করা সম্ভব হয়।
৪. **সক্রিয় নাগরিকত্বকে উৎসাহিত করা:** জঁ-জ্যাক রুসো যেমনটি বলেছিলেন, সার্বভৌমত্ব মূলত শাসকদের হাতে নয় বরং জনগণের হাতে থাকে। এর অর্থ হলো নাগরিকদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে, কেবল নীরব দর্শক হয়ে থাকলে চলবে না। নিরন্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে যে শাসন ব্যবস্থা জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে।
৫. **অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়িত্বশীল শাসন:** বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সমাজের বড় একটি অংশকে অর্থবহ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এটি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সমতা এবং সুযোগের প্রকৃত প্রাপ্তির মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করে। গণতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং বৈধ রাখতে এই বৈষম্যগুলো দূর করা অপরিহার্য।
৬. **অভিযোজনযোগ্য এবং উন্মুক্ত সমাজ:** গণতন্ত্রকে সমালোচনা ও সংস্কারের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে, যাতে নীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমাগত মূল্যায়ন ও উন্নত করা যায়। **কার্ল পপার** যেমন যুক্তি দিয়েছিলেন, একটি উন্মুক্ত সমাজ যুক্তিনির্ভর বিতর্কের মাধ্যমে নিজের ভুল সংশোধনের ক্ষমতার মাধ্যমেই বিকশিত হয়। এই **স্ব-সংশোধন** করার ক্ষমতাই দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করে।

কেস স্টাডি হিসেবে ভারত: স্থিতিস্থাপক তবুও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ গণতন্ত্র

গভীর সামাজিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও গণতন্ত্র কীভাবে টিকে থাকতে পারে, ভারত তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ; যদিও এটি বর্তমানে বেশ কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

১. **সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শিক শক্তি:** ভারতীয় সংবিধান ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। বি. আর. আম্বেদকর যেমন জোর দিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো বাস্তবে বজায় রাখতে **সাংবিধানিক নৈতিকতা** অপরিহার্য।
২. **প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা এবং নির্বাচনী প্রাণবন্ততা:** ভারত নিয়মিতভাবে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বড় আকারের নির্বাচন আয়োজন করে আসছে। **নির্বাচন কমিশনের** মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে, যা ভারতের নির্বাচনকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক অনুশীলনে পরিণত করেছে।
৩. **বিচার বিভাগ এবং অধিকার-ভিত্তিক কাঠামো:** একটি সক্রিয় বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকার রক্ষায় এবং বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে অধিকারের পরিধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি কেবল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরেও গণতন্ত্রের সারমর্মকে শক্তিশালী করেছে।

৪. **সম্পদ হিসেবে বৈচিত্র্য:** ভারতের ভাষাগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ফেডারেলিজম (যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো), বিকেন্দ্রীকরণ এবং সংরক্ষণের মতো নীতিগুলোর মাধ্যমে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই বহুত্ববাদ গণতন্ত্রকে দুর্বল করার বদলে প্রায়ই আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ প্রশস্ত করেছে।
৫. **উদীয়মান চ্যালেঞ্জ এবং গণতান্ত্রিক চাপ:** একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক চাপ, তথ্যের বিকৃতি এবং সামাজিক মেরুকরণের মতো উদ্বেগগুলো ইঙ্গিত দেয় যে ভারতীয় গণতন্ত্র বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক চাপের প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো প্রতিষ্ঠানের স্থিতিস্থাপকতা এবং নাগরিক সংস্কৃতির পরীক্ষা নিচ্ছে।
৬. **গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং জনঅংশগ্রহণ:** নির্বাচন, সুশীল সমাজ এবং জনালোচনার মাধ্যমে নাগরিকদের অব্যাহত অংশগ্রহণ গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার মূল চাবিকাঠি। **জওহরলাল নেহরু** যেমন জোর দিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক জীবনের যুক্তিবাদী এবং অংশগ্রহণমূলক চরিত্র বজায় রাখতে **বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি (Scientific temper)** এবং উন্মুক্ত বিতর্ক অপরিহার্য।

উপসংহার: একটি জীবন্ত আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র

উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, "গণতন্ত্র হলো নিকৃষ্টতম শাসন ব্যবস্থা, তবে অন্য যেসব ব্যবস্থা এ পর্যন্ত চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলোর কথা বাদ দিলে।" এটি নিখুঁত হওয়াকে নয়, বরং এর স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিফলিত করে। গণতন্ত্র আজ চূড়ান্ত পতনের মুখে নয়, বরং একটি রূপান্তরের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর প্রকৃত শক্তি কেবল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নয়, বরং অংশগ্রহণ, **জবাবদিহিতা** এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত। মহাত্মা গান্ধী যেমনটি বলেছিলেন, গণতন্ত্রের চেতনা ভেতর থেকে আসতে হবে।

Q. The contemporary global trend of 'illiberal democracy' poses a significant challenge to the traditional understanding of constitutionalism. In this context, evaluate the resilience of India's democratic institutions in balancing majoritarian impulses with the principles of constitutional morality. 15 Marks

2.1.21. শহরকেন্দ্রিক নির্বাচনী ভোটাধিকার হরণ এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের সামনে চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা

- সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি, যা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে কোনো বৈষম্য ছাড়াই ভোটের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, তা ভারতের গণতন্ত্রের নৈতিক ও সাংবিধানিক ভিত্তি গঠন করে; তবে, দ্রুত নগরায়ণ হওয়া এলাকাগুলোতে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অধিকার ক্রমবর্ধমানভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে যা দরিদ্র, **পরিযায়ী** এবং **প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে** বাদ দিয়ে দিচ্ছে।



- ভোটের তালিকার **বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)** সংক্রান্ত চলমান বিতর্ক শহরকেন্দ্রিক নির্বাচনী ভোটাধিকার হরণের একটি গভীরতর **কাঠামোগত সংকটকে** উন্মোচিত করেছে, যা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের পক্ষ থেকে জরুরি মনোযোগ দাবি করে।

পটভূমি: ভারতের শহরগুলিতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বোঝা

I. সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের অর্থ

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলতে একটি নির্দিষ্ট বয়সের (ভারতে ১৮ বছর) উপরে প্রতিটি নাগরিকের জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম বা অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়াই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারকে বোঝায়। এটি "একজন ব্যক্তি, একটি ভোট, একটি মূল্য" - এই গণতান্ত্রিক নীতিকে প্রতিফলিত করে, যা রাজনৈতিক সমতা নিশ্চিত করে।

II. স্বাধীনতা-পূর্ব শিকড়: একটি বিতর্কিত অধিকার

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভোটের অধিকার মারাত্মকভাবে সীমিত ছিল—যা সম্পত্তির মালিকানা, কর প্রদান এবং সাক্ষরতার সাথে যুক্ত ছিল। এটি রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে কেবল একটি সংকীর্ণ অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল এবং ভারতীয়দের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে, বিশেষ করে দরিদ্র, দলিত এবং মহিলাদের বাদ দিয়েছিল।

- **ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ (মস্টেণ্ড-চেসমফোর্ড সংস্কার):** এই আইনটি সীমিত ভোটাধিকার প্রবর্তন করেছিল কিন্তু ভোটদানকে একটি ছোট সম্পত্তিবান শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।
- **ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫:** ভোটাধিকার সামান্য প্রসারিত করা হয়েছিল—মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪% পর্যন্ত—কিন্তু দরিদ্র, অধিকাংশ মহিলা এবং ভূমিহীনদের বাদ রাখা অব্যাহত ছিল।
- **গণপরিষদের বিতর্ক (১৯৪৬-১৯৪৯):** ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে গণপরিষদ ঔপনিবেশিক সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তারা সম্পত্তি, সাক্ষরতা, জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গের কোনো যোগ্যতা ছাড়াই সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার গ্রহণ করে—যা একটি নতুন স্বাধীন এবং মূলত নিরক্ষর জাতির জন্য ছিল এক বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার।

III. স্বাধীনতা-পরবর্তী বিবর্তন: ভোটাধিকারের গভীরতা বৃদ্ধি

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২) ছিল বিশ্ব গণতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। প্রায় ১৭.৩ কোটি ভোটার প্রথমবারের মতো তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন, যা ছিল তৎকালীন যে কোনো গণতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত বৃহত্তম নির্বাচনী মহড়া।

- **ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ — ৬১তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৮৮:** ভোটারের বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রায় ৫ কোটি অতিরিক্ত তরুণ নাগরিককে যুক্ত করে।
- **ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM), ১৯৯৮:** দেশজুড়ে ইভিএম-এর প্রবর্তন নির্বাচনের সহজলভ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।
- **সিস্টেমটিক ভোটার এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন (SVEEP) প্রোগ্রাম, ২০০৯:** ভারতের নির্বাচন কমিশন বিশেষ করে শহরকেন্দ্রিক পরিযায়ী এবং বস্তিবাসীসহ প্রান্তিক ও প্রতিনিধিত্বহীন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভোটার নিবন্ধন এবং অংশগ্রহণ বাড়াতে এই কর্মসূচি চালু করে।
- **ইন্ডিজিং গুপ্ত কমিটির সুপারিশ:** এর ফলে জালিয়াতি রোধ করতে এবং প্রকৃত ভোটার যাতে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করতে ভোটার ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (EPIC) গৃহীত হয়।

IV. সাংবিধানিক এবং আইনি কাঠামো

- **ভারতীয় সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ:** এটি প্রধান সাংবিধানিক বিধান যা ১৮ বছরের কম নয় এমন প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ভোটার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।
- **ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ:** এই অনুচ্ছেদটি নির্বাচন কমিশনকে (ECI) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করে।
- **ভারতীয় সংবিধানের ৩২৫ অনুচ্ছেদ:** এই অনুচ্ছেদটি ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে নির্বাচনী তালিকা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে।
- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০:** এই আইনটি নির্বাচনী তালিকা তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংশোধন পরিচালনা করে। এটি ভোটার নিবন্ধনের যোগ্যতা এবং নাম অন্তর্ভুক্ত ও বাদ দেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করে।
- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১:** এই আইনটি প্রার্থীদের যোগ্যতা, অপরাধ এবং নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি সহ নির্বাচনের প্রকৃত পরিচালনা পরিচালনা করে।

V. গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় রায়

- **মোহন লাল ত্রিপাঠী বনাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রায়বেরেলি (১৯৯২):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ভোটার অধিকার একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার হলেও এটি কোনো সাধারণ অধিকার নয়—এটি সর্বোচ্চ তাৎপর্যের একটি সাংবিধানিক অধিকার।
- **পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (PUCL) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০৩):** সুপ্রিম কোর্ট প্রার্থীদের অপরাধমূলক পূর্বসূরী, সম্পদ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা জানার ভোটারদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

- **লিলি থমাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৩):** সুপ্রিম কোর্ট জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৮(৪) ধারা বাতিল করে। আদালত জানায় যে কোনো সংসদ সদস্য বা বিধায়ক যদি কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং দুই বা ততোধিক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তবে তিনি অবিলম্বে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ভারতে শহরকেন্দ্রিক সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের তাৎপর্য

শহরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ শহরে বৈচিত্র্যময়, গতিশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি থাকে, যার ফলে ন্যায়সঙ্গত শাসনের জন্য নির্বাচনী অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর:** সর্বজনীন ভোটাধিকার বস্তিবাসী, পরিযায়ী শ্রমিক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষদের এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম করে যারা আবাসন, জল, স্যানিটেশন এবং জীবিকার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। এটি নগর শাসনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে।
- **অর্থনৈতিক ন্যায়ের হাতিয়ার:** ভোটের অধিকার রাজনৈতিক সমতাকে অর্থনৈতিক দাবিতে রূপান্তরিত করে। এটি দুর্বল গোষ্ঠীগুলোকে উন্নত মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সম্পদের সুযম বন্টনের দাবি করার সুযোগ দেয়, যা গণতন্ত্রকে বাস্তব ফলাফলের সাথে যুক্ত করে।
- **জবাবদিহিমূলক নগর শাসন নিশ্চিত করা:** পৌর নিগমের মতো শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলো তখনই প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক এবং দায়বদ্ধ হয়ে ওঠে, যখন পরিযায়ী এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়সহ সমস্ত অংশ সক্রিয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।
- **পরিযায়ী জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব:** বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, ২০৩১ সালের মধ্যে ভারতের শহরকেন্দ্রিক জনসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি (600 million) পৌঁছানোর পূর্বাভাস রয়েছে। তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য, যাতে শাসনব্যবস্থা তাদের চাহিদাকে প্রতিফলিত করতে পারে যারা শহরের অর্থনীতিকে সচল রাখে।
- **গণতান্ত্রিক বৈধতা এবং সামাজিক সংহতি শক্তিশালী করা:** অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটের তালিকা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা তৈরি করে এবং সামাজিক চুক্তিকে শক্তিশালী করে। অন্যদিকে, সংখ্যাগুরু এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে বাদ দিলে তা বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে এবং গণতান্ত্রিক বৈধতাকে দুর্বল করে।
- **অন্যান্য অধিকারের প্রবেশদ্বার:** ভোটের তালিকায় নাম থাকা প্রায়শই কল্যাণমূলক প্রকল্প, আবাসন সুবিধা এবং পরিচয়পত্র-সংযুক্ত পরিষেবাগুলি পেতে সহায়তা করে। ফলে ভোটের অধিকার ব্যাপক আর্থ-সামাজিক অধিকার লাভের একটি মৌলিক মাধ্যম হয়ে ওঠে।

শহরকেন্দ্রিক ভোটাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অখণ্ডতার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. SIR প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শহরকেন্দ্রিক দরিদ্রদের বর্জন:

ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR), যা নির্ভুলতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল, বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক দরিদ্র, পরিযায়ী শ্রমিক এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে বর্জনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণ হলো বসবাসের কঠোর নথিভুক্ত প্রমাণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা।

- **বিপুল পরিমাণে নাম বাদ দেওয়ার প্রবণতা:** সাম্প্রতিক তথ্য প্রধান শিল্প ও মহানগর কেন্দ্রগুলিতে ভোটের বাদ দেওয়ার একটি চমকপ্রদ চিত্র তুলে ধরে:
 - **গাজিয়াবাদ (UP):** ৩৬.৬৭% ভোটের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, যা মূলত ভ্রাম্যমাণ কর্মীবাহিনীকে প্রভাবিত করেছে।
 - **লখনউ (UP):** সংশোধনের পর ৩০.৮৮% নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
 - **পাটনা (বিহার):** খসড়া তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক ১৬.৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
 - **মুম্বাই (মহারাষ্ট্র):** ২০২৫ সালের SIR-এর অধীনে ১৪ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে; বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক আবাসনের (Informal housing) বাসিন্দাদের প্রায় ৫০% অনির্ভুক্ত বা তালিকাচ্যুত।
 - **গুলশান কলোনি (কলকাতা):** একটি চরম উদাহরণ যেখানে ৯০% ভোটের তালিকা থেকে নিখোঁজ পাওয়া গেছে।

- **প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর অসম প্রভাব:** দলিত, সংখ্যালঘু এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের মতো দুর্বল গোষ্ঠীগুলো দ্বৈত বোঝার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা প্রথমত নিবন্ধনের সময় সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং দ্বিতীয়ত তাদের নাম বাদ পড়ার হারও অনেক বেশি।

২. কঠোর নথিপত্রের মাধ্যমে নির্বাচনী ছাঁটাই:

SIR প্রক্রিয়ার ফলে ভোটারদের একটি বাছাইকৃত ছাঁটাই ঘটে, যেখানে নথিপত্রের কঠোর প্রয়োজনীয়তা দরিদ্র এবং পরিযায়ী জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে দেয়।

- **কঠোর নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তা:** দীর্ঘমেয়াদী বসবাসের প্রমাণ (যেমন ২০০২ বা ২০০৫ সালের নথি) দেওয়া পরিযায়ী এবং বস্তিবাসীদের জন্য প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- **কাঠামোগত বাধা হিসেবে পরিচালনা:** যেহেতু অভ্যন্তরীণ পরিচালনা নগরায়ণের কেন্দ্রবিন্দু, তাই স্থায়ী বসবাসের প্রমাণ চাওয়ার বিষয়টি পরিযায়ী শ্রমিকদের অসমভাবে বর্জন করে।
- **অনানুষ্ঠানিক বসতি ও তথ্যের বাস্তবতা:** বিশ্বব্যাংকের মতে, শহরের জনসংখ্যার প্রায় ৪০% বস্তিতে বাস করে। বর্তমান ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক ঠিকানার প্রমাণের অভাবে তাদের ব্যাপক বর্জন অনিবার্য হয়ে পড়ছে।

৩. ব্যালটের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হওয়া:

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য গোপন ব্যালটের নীতি অপরিহার্য, যা শহুরে প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।

- **বুথ-ভিত্তিক তথ্য প্রকাশ:** ছোট বা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বুথ-ভিত্তিক ভোটের ধরণ বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোটদানের আচরণ অনুমান করা সম্ভব হয়। এটি ভোটারদের চাপ, ভীতি প্রদর্শন বা প্রতিশোধের মুখে ফেলতে পারে।

৪. শহুরে যুবকদের বর্জন এবং অংশগ্রহণের ঘাটতি:

- ভারতের শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ২৮% ১৮ বছরের নিচে, যারা ভোট দেওয়ার অযোগ্য। যখন এর সাথে ভোটার নিবন্ধন না করা এবং নাম বাদ পড়ার বিষয়টি যুক্ত হয়, তখন মোট জনসংখ্যা এবং প্রকৃত নির্বাচনী অংশগ্রহণের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান তৈরি হয়, যা গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বকে দুর্বল করে।

৫. দুর্বল শহরকেন্দ্রিক নির্বাচনী পরিকাঠামো:

- **নিম্ন ভোটার নিবন্ধন:** উচ্চ গতিশীলতা এবং বস্তি এলাকায় পৌঁছানোর সীমাবদ্ধতার কারণে শহরাঞ্চলে নিবন্ধনের হার কম।
- **পরিযায়ী ভোটিং কার্ডার অভাব:** একটি বহনযোগ্য (Portable) ভোটার নিবন্ধন ব্যবস্থার অভাবে পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের নিজ নির্বাচনী এলাকায় নিবন্ধিত থাকতে বাধ্য হন। ফলে তারা কার্যত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী অংশগ্রহণে বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহ

- **কানাডা — প্রোঅ্যাক্টিভ এনিউমারেশন মডেল (Proactive Enumeration Model):** কানাডায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে নির্বাচন কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে নাগরিকদের কাছে পৌঁছান, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের এবং অস্থায়ী বসতির মানুষদের কাছে। এটি নিবন্ধনের বোঝা কমাতে এবং ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে।
- **ব্রাজিল — সুগম্যতাসহ বাধ্যতামূলক ভোটদান (Compulsory Voting with Accessibility):** ব্রাজিল বাধ্যতামূলক ভোটদানের সাথে বস্তি এবং অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে বিশেষ প্রচারণার সমন্বয় ঘটায়। এর ফলে উচ্চ নির্বাচনী অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং প্রমাণিত হয় যে প্রশাসনিক সহায়তা কাঠামোগত বর্জনকে কাটিয়ে উঠতে পারে।
- **এস্তোনিয়া — ডিজিটাল এবং রিমোট ভোটিং সিস্টেম:** এস্তোনিয়া অনলাইন ভোটার নিবন্ধন এবং রিমোট ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে নাগরিকরা যেকোনো স্থান থেকে ভোট দিতে পারেন, যা বিশেষ করে ভ্রাম্যমাণ এবং পরিযায়ী জনসংখ্যার জন্য নির্বাচনী সুযোগ নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যতের পথ: অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটাধিকারের কৌশল

- **অন্তর্ভুক্তির দিকে SIR প্রক্রিয়ার সংস্কার:** ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়াকে নথিপত্র-নির্ভর মডেল থেকে সরিয়ে একটি 'প্রোঅ্যাক্টিভ আউটরিচ' বা সক্রিয় প্রচারণার দিকে নিয়ে যেতে হবে। কর্মকর্তাদের সরাসরি বস্তি, শ্রমবাজার এবং অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে গিয়ে নিবন্ধন অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

- **বাসস্থানের প্রমাণের সরলীকরণ:** প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার টি.এন. শেষনের দর্শন অনুসরণ করে ঠিকানার সংজ্ঞা হওয়া উচিত "যেখানে ব্যক্তি বসবাস করেন"। বস্তিবাসীদের জন্য স্ব-ঘোষণা (Self-declaration) বা সামাজিক যাচাইকরণকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- **টোটালাইজার (Totalizer) মেশিনের প্রবর্তন:** ভোটাধিকারের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের উচিত 'টোটালাইজার' ব্যবহার করা। এটি ফলাফল ঘোষণার আগে বেশ কয়েকটি ইভিএম (EVM)-এর ভোটকে একত্রিত করে ফেলে।
- **পরিয়ায়ীদের জন্য বহনযোগ্য (Portable) ভোটার নিবন্ধন:** জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ সংশোধন করে একটি বহনযোগ্য নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এতে পরিয়ায়ী শ্রমিকরা তাদের আদি নিবন্ধন না হারিয়েই কর্মস্থলে বা বর্তমান বাসস্থানে ভোট দিতে পারবেন।
- **ডিজিটাল ডেটাবেসের সাথে ভোটার তালিকার সংহতি:** ভোটার তালিকার সাথে [Aadhaar Redacted], ১০০ দিনের কাজের (MGNREGA) রেকর্ড, নগর সংস্থাগুলোর তথ্য এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধনের (NPR) সংযোগ স্থাপন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালিকা আপডেট করা সম্ভব হবে।
- **নাম বাতিলের আগে সঠিক প্রক্রিয়া (Due Process) নিশ্চিত করা:** আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে যে, ভোটার তালিকা থেকে কোনো নাম বাদ দেওয়ার আগে অবশ্যই: ১. ব্যক্তিগত নোটিশ, ২. ক্ষেত্র যাচাই (Field verification), এবং ৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটি গণহারে নাম কাটা রোধ করবে।
- **ব্যালটের গোপনীয়তা শক্তিশালী করা:** বৃথ-ভিত্তিক তথ্যের বেনামীকরণ বা একত্রীকরণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোটদানের ধরণ অনুমান করা না যায়। এতে ভোটারের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকবে।
- **সুশীল সমাজের ভূমিকা বৃদ্ধি:** সুশীল সমাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষণ, নাম বাতিলের অডিট এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

উপসংহার

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কেবল একটি সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নয়, বরং এটি ভারতের গণতান্ত্রিক পরিচয়ের ভিত্তি। তবে, যখন প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলো দুর্বল নাগরিকদের অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে, তখন এই অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই নগর নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার, সক্রিয় অস্তিত্ব নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি নাগরিকের সমান ভোটাধিকার রক্ষা করা একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং গণতান্ত্রিক প্রয়োজন। কারণ গণতন্ত্রের শক্তি এবং বৈধতা শেষ পর্যন্ত তার ভোটাধিকারের ব্যাপকতা এবং অখণ্ডতার ওপর নির্ভর করে।

Q. Universal Adult Franchise is the cornerstone of Indian democracy, yet urban electoral processes are leading to increasing disenfranchisement." Examine the challenges and suggest reforms. 15 Marks

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.2.1. প্রতিবেশী প্রথম: ভারত-নেপাল সম্পর্কের সুদৃঢ়করণ

ভূমিকা

- নেপালের সাম্প্রতিক নেতৃত্বের পরিবর্তন ভারতের জন্য সক্রিয় কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পুনরুজ্জীবিত করার একটি নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং দুই দেশের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে "প্রতিবেশী প্রথম" (Neighbourhood First) নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।



ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিবর্তন

ভারত ও নেপালের সম্পর্ক শতাব্দী প্রাচীন **shared history** (অংশীদারিত্বমূলক ইতিহাস), ভৌগোলিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক মিলের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

১. ঐতিহাসিক ভিত্তি

- **সভ্যতার সংযোগ:** হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্য, পবিত্র তীর্থস্থান (লুম্বিনী, পশুপতিনাথ) এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক বিদ্যমান।
- **সুগৌলি চুক্তি (১৮১৫-১৬):** ব্রিটিশ ভারতের সাথে নেপালের বর্তমান ১,৭৫১ কিমি **উন্মুক্ত সীমান্ত (open border)** মূলত এই চুক্তির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছিল।

২. স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগ (১৯৪৭-১৯৯০)

- **কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা:** ১৯৪৭ সালের ১৭ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
- **ভিত্তিপ্রস্তর: ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি—**যা উন্মুক্ত সীমান্ত, মানুষের অবাধ চলাচল, পণ্য পরিবহন এবং **নিরাপত্তা সহযোগিতার** পথ প্রশস্ত করে।
- **জলসম্পদ চুক্তি:** কোশি (১৯৫৪) এবং গণ্ডক (১৯৫৯) নদীর পানিবন্টন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- **বিশেষ সম্পর্ক:** অর্থনৈতিক সহায়তা এবং জনগণের সাথে জনগণের নিবিড় সম্পর্ক (যার মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে গোষ্ঠী নিয়োগ অন্যতম) এই সময়কালকে চিহ্নিত করে।

৩. গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও অর্থনৈতিক গভীরতা (১৯৯০-২০১৪)

- **গণতন্ত্রে সমর্থন:** ১৯৯০ সালে নেপালের বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং ২০০৬ সালের **বিস্তৃত শান্তি চুক্তি (Comprehensive Peace Agreement)** স্থাপনে ভারত সমর্থন জানায়।
- **মহাকালী চুক্তি (১৯৯৬):** সমন্বিত নদী উন্নয়নের জন্য এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- **বাণিজ্য ও ট্রানজিট:** বাণিজ্য ও পারাপার চুক্তির নবায়ন এবং **জলবিদ্যুৎ সহযোগিতা** ও বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা দূর করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

৪. একবিংশ শতাব্দী: কানেক্টিভিটি ও কার্যকরী সহযোগিতা (২০১৫-বর্তমান)

- **প্রতিবেশী প্রথম নীতি:** ২০১৪ সালের পর থেকে উচ্চপর্যায়ের সফর (১৭টিরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ের সফর) দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করেছে।
- **অবকাঠামো উন্নয়ন:** মোতিহারি-অমলখগঞ্জ পেট্রোলিয়াম **পাইপলাইন**, আন্তঃসীমান্ত রেলপথ (জয়নগর-কুর্থা), ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (ICP) এবং মালবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- **জ্বালানি খাতে অগ্রগতি:** দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে; যেখানে ভারত আগামী দশকে নেপাল থেকে **১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ** আমদানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া অরুণ-৩ (Arun-III) ও লোয়ার অরুণের মতো বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোতে কাজ চলছে।
- **ডিজিটাল সংযোগ:** UPI ইন্টারঅপারেবিলিটি চালু করার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সহজতর করা হয়েছে।
- **শিক্ষা ও সংস্কৃতি:** ভারত প্রতি বছর হাজার হাজার **বৃত্তি (scholarship)** প্রদান করে এবং **পশুপতিনাথ-কাশী** ধর্মীয় সার্কিট লক্ষ লক্ষ পর্যটককে আকৃষ্ট করে।

৫. সমসাময়িক প্রবণতা (২০২৫-২০২৬)

- **জ্বালানি, কানেক্টিভিটি এবং সবুজ বিদ্যুৎ (green power)** বাণিজ্যের মাধ্যমে বাস্তবমুখী অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ।
- **তৃতীয় দেশের সাথে (যেমন- বাংলাদেশ) ত্রিপাক্ষীয় ব্যবস্থা** এবং ট্রানজিট প্রোটোকল আধুনিকীকরণের পথে অগ্রগতি।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. আঞ্চলিক ও সীমান্ত বিরোধ:

- সুগৌলি চুক্তির (১৮১৫-১৮১৬) ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আজও এই সম্পর্কের একটি প্রধান সমস্যা। বিতর্কিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে কালাপানি (Kalapani), লিপুলেখ (Lipulekh) এবং লিম্পিয়াধুরা (Limpiyadhura)।
- নেপাল ২০২০ সালে তাদের সংবিধানে মানচিত্র সংশোধন করে এই অঞ্চলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ২০২৫ সালে তাদের নতুন ১০০ টাকার নোটে এগুলো চিত্রিত করে।
- ভারত এই অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে এবং নেপালের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। ২০২৬ সালের জুনে লিপুলেখ পাস দিয়ে ভারত-চীন সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় শুরু করার পরিকল্পনা নেপালের সার্বভৌমত্বের উদ্বেগকে আবারও উসকে দিয়েছে।

২. অসমতার ধারণা এবং ১৯৫০ সালের চুক্তি:

- আকার এবং প্রভাবের ক্ষেত্রে কাঠামোগত অসমতা (Asymmetry) নেপালের মধ্যে ভারতের "দাদাগিরি" (Big Brother attitude) সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে।
- ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিকে নেপালের তরুণ প্রজন্ম ক্রমবর্ধমানভাবে একটি অসম এবং ঔপনিবেশিক আমলের অবশেষ হিসেবে দেখে।
- চুক্তি সংশোধনের সুপারিশকারী এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ (EPG)-এর রিপোর্ট ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ না করায় দুই দেশের মধ্যে আস্থার সংকট (Trust Deficit) গভীর হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং বাণিজ্য ঘাটতি:

- নেপাল একটি বিশাল বাণিজ্য ঘাটতির (Trade Deficit) সম্মুখীন, কারণ তারা তাদের আমদানির প্রায় ৭০% এর জন্য ভারতের ওপর নির্ভরশীল।
- নেপালি কৃষি পণ্যের (যেমন আদা ও চা) ওপর শুল্ক বহির্ভূত বাধা (Non-tariff barriers) এবং নেপালি ব্যবসায়ীদের GST রিফান্ড প্রক্রিয়ায় বিলম্ব প্রায়ই অর্থনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

৪. উন্মুক্ত সীমান্তের নিরাপত্তা সমস্যা:

- ১,৭৫১ কিমি উন্মুক্ত ও ছিদ্রযুক্ত (Porous) সীমান্ত মানুষের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখলেও এটি পাচার (Smuggling), মানবপাচার, জাল নোটের প্রচলন এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধের মতো চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য নিরন্তর দ্বিপাক্ষিক সমন্বয় প্রয়োজন।

৫. জলসম্পদ এবং জলবিদ্যুৎ বাস্তবায়ন:

- অংশীদারিত্বমূলক নদীগুলো জ্বালানি ও সেচের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি করলেও সুবিধা-বন্টন (Benefit-sharing), প্রকল্পের বিলম্ব এবং ভাটির প্রভাব নিয়ে বিতর্ক লেগেই থাকে।
- পঞ্চেশ্বর বহুমুখী প্রকল্পের (Pancheshwar Multipurpose Project) মতো উদ্যোগগুলোর ধীরগতি দুই দেশের ভিন্ন অগ্রাধিকার এবং বাস্তবায়নগত বাধাগুলোকে তুলে ধরে।

৬. ভূ-রাজনৈতিক বহুমুখীকরণ এবং চীন ফ্যাক্টর:

- চীনের সাথে নেপালের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এ অংশগ্রহণ একটি ত্রিমুখী গতিশীলতা তৈরি করেছে। ভারত নেপালে চীনের বর্ধিত অবকাঠামো এবং কানেক্টিভিটি প্রকল্পগুলোকে কৌশলগত উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করে।

৭. নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা:

- ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, জোটের রাজনীতি এবং ২০২৫ সালের Gen-Z প্রতিবাদ ও ২০২৬ সালের সংসদীয় নির্বাচনের মতো ঘটনাগুলো নীতির ধারাবাহিকতাকে প্রভাবিত করে। ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদ এবং যুব-চালিত দাবিগুলো মাঝেমাঝে নেপালের অভ্যন্তরীণ আলোচনায় ভারত-বিরোধী মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে।

ভবিষ্যৎ পন্থা: ভারত-নেপাল সম্পর্কের কৌশলগত রোডম্যাপ

১. আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক ও সীমান্ত সমস্যার সমাধান:

- কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরা সংক্রান্ত বিরোধগুলোকে জনসমক্ষে বাগবিতণ্ডার পরিবর্তে শান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন কূটনৈতিক চ্যানেলের (Diplomatic channels) মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।
- একতরফা পদক্ষেপ এড়িয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে যৌথ সীমান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ (Joint Boundary Working Group) এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. ১৯৫০ সালের চুক্তির আধুনিকায়ন:

- এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ (EPG)-এর রিপোর্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং পর্যায়ক্রমে এর ওপর আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন।
- অনন্য উন্মুক্ত সীমান্ত এবং জনগণের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্ককে অক্ষুণ্ণ রেখে, বর্তমান সময়ের সার্বভৌম সমতা (Sovereign equality) বজায় রেখে ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিকে আধুনিকীকরণ করতে হবে।

৩. জলবিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সহযোগিতায় গতি আনা:

- অরুণ-৩, পঞ্চেশ্বর বহুমুখী প্রকল্প এবং আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ বাণিজ্য চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে নেপাল ভারতে ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি করতে পারে, যা দুই দেশের জন্যই লাভজনক হবে।

৪. কানেক্টিভিটি এবং অবকাঠামো বাস্তবায়ন বৃদ্ধি:

- আন্তঃসীমান্ত রেলপথ (যেমন- রত্নৌল-কাঠমান্ডু), পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন সম্প্রসারণ, ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (ICP) এবং অভ্যন্তরীণ জলপথের কাজ সময়মতো শেষ করা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা বাড়িয়ে আস্থা অর্জন এবং দৃশ্যমান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ এবং বাণিজ্যের প্রসার:

- একটি দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির (BEPA) মাধ্যমে বাণিজ্য বৈচিত্র্য আনা, সীমান্ত অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং নেপালের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে হবে। কৃষি, পর্যটন এবং উৎপাদন খাতে ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য ঘাটতি (Trade deficit) কমাতে হবে।

৬. সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার:

- মানবিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য উন্মুক্ত সীমান্ত বজায় রাখতে হবে, তবে চোরাচালান, পাচার এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমনে নজরদারি, উপাত্ত আদান-প্রদান (Data exchange) এবং উন্নত যৌথ মেকানিজম চালু করতে হবে।

৭. ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব গভীর করা:

- UPI ইন্টারঅপারেবিলিটি, আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল পেমেন্ট, ফিনটেক, এআই (AI) এবং সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নেপালের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং দক্ষতা উন্নয়নে 'নেপাল-ভারত টেক ফোরাম ২০২৬'-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

উপসংহার

ভারত ও নেপালের মধ্যকার এই অনন্য বন্ধন **অর্থনৈতিক সহযোগিতা** এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব। পুরোনো মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে উভয় পক্ষ যদি **আধুনিক কানেক্টিভিটি (Modern connectivity)** বা সংযোগকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ অর্জন করা যাবে। সমান অংশীদার হিসেবে একত্রে কাজ করার মাধ্যমেই একটি শক্তিশালী এবং আরও সমন্বিত **দক্ষিণ এশিয়া** গড়ে তোলা সম্ভব।

Q. India-Nepal relations, despite deep historical and cultural ties, face recurring geopolitical and economic challenges. Examine these challenges and suggest measures to strengthen bilateral ties under India's 'Neighbourhood First' policy. 15 Marks

2.2.2. ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে কৌশলগত বাস্তববাদ

ভূমিকা

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বর্তমানে **"আবেগপ্রবণ কূটনীতি"** থেকে সরে এসে **"কৌশলগত বাস্তববাদ"**-এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের (অপারেশন সিন্দুর) ফলে সৃষ্ট কূটনৈতিক অচলাবস্থার পর, নয়া দিল্লি এখন **তুরস্ক** এবং **আজারবাইজান**-এর সাথে পুনরায় যোগাযোগ শুরু করেছে। এই পরিবর্তনটি ভারতের সেই ঐতিহ্যগত শক্তিকেই তুলে ধরে, যেখানে কোনো নির্দিষ্ট দেশের বলয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে বা পাকিস্তানের সাথে তুলনা (hyphenation) না করে, শুধুমাত্র **জাতীয় স্বার্থের** ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।



সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষাপট - "কূটনৈতিক শীতলতা"

২০২৫ সালের সংঘাতের সময় যে দেশগুলো পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা বা অবস্থানকে সমর্থন করেছিল, তাদের সাথে ভারতের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে।

ক. শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ

- **"ত্রিমুখী শত্রু" (Triple Adversary) ধারণা:** ভারতের সামরিক ব্রিফিংয়ে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের পাশাপাশি **তুরস্ক**কেও আনুষ্ঠানিকভাবে শত্রু হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কারণ তারা পাকিস্তানকে কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিচ্ছিল।
- **আজারবাইজানের ভূমিকা:** ধারণা করা হয় যে ৯৬ ঘণ্টার সেই যুদ্ধের সময় আজারবাইজান পাকিস্তানকে প্রযুক্তিগত এবং গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিল।
- **মালয়েশিয়া ও ওআইসি (OIC):** ভারতের অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলায় মালয়েশিয়া এবং ওআইসি-র বেশ কয়েকজন সদস্য দেশকে ভারতের পক্ষ থেকে কড়া কূটনৈতিক বার্তা (Demarche) দেওয়া হয়।

খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক কঠোর অবস্থান

- **বর্জন আন্দোলন:** ভারতের প্রভাবশালী সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো তুর্কি এবং আজারবাইজানি পণ্য ও পর্যটন বর্জনের ডাক দেওয়ায় বাণিজ্য ও পর্যটনে ব্যাপক ধস নামে।
- **ভিসা ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা:** চাপের কৌশল হিসেবে ভারত পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য **সার্ক (SAARC) ভিসা অব্যাহতি** স্কিম স্থগিত করে এবং **সিন্ধু জল চুক্তি (Indus Waters Treaty)** সাময়িকভাবে মূলতবি রাখে।

গ. পাল্টা কৌশলগত জোট

- **আর্মেনিয়া-গ্রিস অক্ষ:** আজারবাইজান ও তুরস্কের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ **আর্মেনিয়া** এবং **গ্রিস**-এর সাথে ভারত সুকৌশলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে।
- **বিকল্প স্থলপথ:** ২০২৫ সালের জুন মাসে (ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনার সময়) ইরান থেকে ভারতীয়দের সরিয়ে আনার সময় বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট নির্দেশ দেয় যাতে তুরস্ক ও আজারবাইজান এড়িয়ে **আর্মেনিয়া** এবং **তুর্কমেনিস্তান** রুট ব্যবহার করা হয়।

সাম্প্রতিক কূটনৈতিক পরিবর্তনের প্রধান কারণসমূহ

১. আঞ্চলিক অস্থিরতা এবং "ইরান ফ্যাক্টর"

- **যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা:** ২০২৫ সালের জুনে ইরানে আমেরিকা ও ইসরায়েলের হামলার কারণে তুরস্ক ও আজারবাইজানের স্থলপথ বর্জন করা আর সম্ভব ছিল না।
- **মানবিক সম্পর্ক স্থাপন:** আজারবাইজান সম্প্রতি ইরান থেকে ২০০-র বেশি ভারতীয়কে উদ্ধার করতে সাহায্য করায় দুই দেশের মধ্যে বরফ গলতে শুরু করে।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** আজারবাইজানের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা জরুরি ছিল যাতে সে দেশ থেকে **অপরিশোধিত তেল** (যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ৯৮%) আসা অব্যাহত থাকে এবং ওএনজিসি বিদেশ (ONGC Videsh)-এর বিনিয়োগ সুরক্ষিত থাকে।

২. দ্বিপাক্ষিক "অক্ষ" ভেঙে দেওয়া

- **কৌশলগত পৃথকীকরণ (De-hyphenation):** বাকু (৩ এপ্রিল) এবং দিল্লিতে (৮ এপ্রিল) পুনরায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শুরু করার মাধ্যমে ভারত তুরস্ক ও আজারবাইজানকে সরাসরি আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসেছে। এর ফলে পাকিস্তানের সাথে তাদের তথাকথিত "ত্রাত্তমূলক" সম্পর্কের প্রভাব কমেছে।
- **দর্পণ কূটনীতি (Mirror Diplomacy):** গ্রিস এবং আর্মেনিয়ার সাথে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব বজায় রেখে ভারত এই সংকেত দিচ্ছে যে, আঙ্কারা বা বাকু যদি কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত-বিরোধী অবস্থান নেয়, তবে ভারতের কাছেও শক্তিশালী বিকল্প পথ খোলা আছে।

৩. অর্থনৈতিক "রিয়লপলিটিক" (Realpolitik)

- **অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার:** ২০২৫ সালের "তুরস্ক বর্জন" আন্দোলনের ফলে পর্যটনে ৩৬% এবং বাণিজ্যে ১৬% ঘাটতি হয়েছিল, যা এখন কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে।
- **পারস্পরিক স্বার্থ:** ভারত তুরস্কের বিশাল বাজারে প্রবেশ করতে চায় (চীনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম), অন্যদিকে তুর্কি সংস্থাগুলো ভারতের "মেক ইন ইন্ডিয়া" প্রকল্পে অংশ নিতে আগ্রহী।
- **যোগাযোগ ব্যবস্থা:** ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ায় পৌঁছানোর জন্য ভারতের প্রধান পথ **আইএনএসটিসি (INSTC)**-র সাফল্যের জন্য এই দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ অপরিহার্য।

৪. সাধারণ ভাষা হিসেবে "সম্মতবাদ বিরোধী লড়াই"

- **সরাসরি আলোচনা:** অপারেশন সিন্দুরের পর ভারত তার প্রতিটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে **"সীমান্তবর্তী সম্মতবাদ"** ইস্যুটিকে কেন্দ্রে রাখছে।
- **শর্তসাপেক্ষ স্বাভাবিক সম্পর্ক:** বাণিজ্য ও অন্যান্য সহযোগিতার আগে এখন **নিরাপত্তা সহযোগিতা** নিশ্চিত করাকে ভারত পূর্বশর্ত হিসেবে দেখছে। এর মাধ্যমে ভারত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালানো দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক রাখা হবে না, তবে কাজের ক্ষেত্রে আলোচনার দরজা খোলা থাকবে।

পুনরায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **ত্রিপাক্ষিক জোটের প্রভাব:** পাকিস্তান-আজারবাইজান-তুরস্কের মধ্যকার গভীর ত্রিপাক্ষিক জোট একটি বড় বাধা। এই দেশগুলো প্রায়ই ওআইসি (OIC)-র মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে অবস্থান নেয়।
- **সার্বভৌমত্ব এবং কাশ্মীর ইস্যু:** ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং কাশ্মীর বিরোধ নিয়ে তুরস্কের বারবার মন্তব্য করার প্রবণতা কূটনৈতিক তিক্ততা বাড়িয়ে দেয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ "কৌশলগত অংশীদারিত্বের" পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- **জনমত এবং ডিজিটাল ক্ষোভ:** সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্জন (Boycott) আন্দোলন খুব দ্রুত সরকারি নীতিতে প্রভাব ফেলে। এই ধরনের আবেগপ্রবণ জনরোষ দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবসম্মত লক্ষ্যগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- **"আর্মেনিয়া-গ্রিস" ভারসাম্য বজায় রাখা:** আর্মেনিয়া এবং গ্রিসের সাথে ভারতের নতুন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে এমনভাবে সামলাতে হবে যাতে তারা আজারবাইজান বা তুরস্কের সাথে কাজের সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে স্থায়ী বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।
- **সামরিক অবিশ্বাস:** 'অপারেশন সিন্দুর'-এর সময় তুরস্ককে যেভাবে "সক্রিয় বিরোধী" হিসেবে দেখা হয়েছিল, সেই রেশ কাটিয়ে উঠতে স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধির পদক্ষেপ (CBMs) নেওয়া প্রয়োজন।
- **বহুপাক্ষিক "শিবির"-এর চাপ:** কোনো নির্দিষ্ট ব্লকে বা শিবিরে যোগ না দিয়ে ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy) বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে এমন দেশগুলোর সাথে লেনদেনের সময় যারা ঐতিহাসিকভাবে ভারতের শত্রুপক্ষের ঘনিষ্ঠ।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **বাস্তবসম্মত বিভাজন (Pragmatic Compartmentalization):** কাশ্মীর নিয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে সরিয়ে রেখে অর্থনৈতিক এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত স্বার্থকে (যেমন INSTC) আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া। যেখানে স্বার্থ মিলবে সেখানে কাজ করা এবং যেখানে মিলবে না সেখানে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া।
- **প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা:** মাঝে মাঝে বৈঠক না করে নিয়মিত বিরতিতে পররাষ্ট্র দপ্তর পর্যায়ে আলোচনা (FOC) চালু করা। এর ফলে চরম উত্তেজনার সময়েও যোগাযোগের পথ খোলা থাকবে।
- **"দর্পণ কূটনীতি"-র প্রয়োগ:** আর্মেনিয়া এবং গ্রিসের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ককে একটি কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা। এটি তুরস্ক ও আজারবাইজানকে ভারতের সাথে সমান মর্যাদায় আলোচনা করতে উৎসাহিত করবে।
- **আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন:** ঐতিহাসিক শত্রুতার বদলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকে বিশ্বজনীন সমস্যার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া—যেমন জলবায়ু পরিবর্তন (DAC প্রযুক্তি), জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো।
- **সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কূটনীতি:** সকল দ্বিপাক্ষিক কাঠামোর মধ্যে "সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসবাদ" ইস্যুটিকে শক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। এটি পরিষ্কার করা যে উন্নত বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা একটি বাধ্যতামূলক শর্ত।
- **অভ্যন্তরীণ জনমত নিয়ন্ত্রণ:** সরকারকে জাতীয়তাবাদী জনরোষ এবং কৌশলগত লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, যাতে অনলাইন আবেগ রাষ্ট্রের কূটনৈতিক চালচলনকে সীমাবদ্ধ না করে।

উপসংহার

তুরস্ক এবং আজারবাইজানের সাথে ভারতের এই পুনরায় যোগাযোগ রক্ষা করা আসলে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy)-এরই একটি প্রতিফলন। আবেগের বদলে বাস্তব রাজনীতি (Realpolitik)-কে প্রাধান্য দিয়ে নয়া দিল্লি সফলভাবে আঞ্চলিক স্বার্থগুলোকে পাকিস্তানের প্রভাব থেকে আলাদা করছে এবং নিজেকে একটি বাস্তববাদী বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

Q. In the context of the India-Pakistan conflict of 2025, examine the challenges and opportunities in India's relations with countries aligned with Pakistan. How should India balance strategic interests and diplomatic principles? 15 Marks

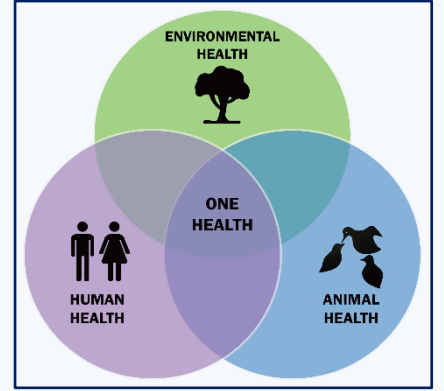
2.3. স্বাস্থ্য

2.3.1. 'ওয়ান হেলথ' বা সমন্বিত স্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গি

ভূমিকা

ওয়ান হেলথ হলো একটি সমন্বিত এবং বহুমুখী চিন্তাধারা, যা স্বীকার করে যে মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণীর স্বাস্থ্য এবং আমাদের ভাগ করে নেওয়া পরিবেশের সুস্থতা একে অপরের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল।

- **বিবর্তন:** 'ওয়ান হেলথ' শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৩-০৪ সালে (সার্স অতিমারির পর) চালু হয়, যদিও ১৯ শতকে রুডলফ ভার্চো (Rudolf Virchow) প্রথম "ওয়ান মেডিসিন" বা সমন্বিত চিকিৎসার ধারণা দিয়েছিলেন।
- **চতুর্মুখী জোট (The Quadripartite):** এটি মূলত চারটি প্রধান সংস্থার সমন্বয়ে পরিচালিত হয়:



১. WHO (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)
২. FAO (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)
৩. UNEP (জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি)
৪. WOAH (বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থা)

'ওয়ান হেলথ' পদ্ধতির গুরুত্ব

১. **প্রাণিজাত রোগের বোঝা:** বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থা (WOAH)-এর মতে, মানুষের মধ্যে হওয়া পরিচিত সংক্রামক রোগগুলোর ৬০% হলো প্রাণিজাত (Zoonotic) এবং নতুনভাবে উদ্ভূত সংক্রামক রোগগুলোর (যেমন—কোভিড-১৯, ইবোলা এবং নিপাহ) ৭৫% প্রাণী থেকে ছড়ায়।
২. **অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR):** গবাদি পশু এবং মানুষের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এমন "সুপারবাগ" তৈরি হচ্ছে যা পরিবেশের মাধ্যমে চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়ছে।
৩. **খাদ্য নিরাপত্তা:** FAO-এর তথ্য অনুযায়ী, পশুর রোগের কারণে বিশ্বজুড়ে গবাদি পশুর উৎপাদন অন্তত ২০% হ্রাস পায়, যা সরাসরি সেই ১.৩ বিলিয়ন মানুষের পুষ্টি ও জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে যারা গবাদি পশুর ওপর নির্ভরশীল।
৪. **জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি:** বন উজাড় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রাণীরা তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল হেড়ে লোকালয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে, যার ফলে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত এবং ভাইরাসের "স্পিলওভার" (প্রাণী থেকে মানুষের দেহে সংক্রমণ) বাড়ছে।
৫. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** বিশ্বব্যাংক-এর হিসাব অনুযায়ী, 'ওয়ান হেলথ' বাস্তবায়নে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে, যেখানে কোভিড-১৯ এর মতো একটি বড় অতিমারির ফলে বিশ্বের জিডিপি (GDP) ক্ষতির পরিমাণ ট্রিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়।

বৈশ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- **ওয়ান হেলথ জয়েন্ট প্ল্যান অফ অ্যাকশন (২০২২-২০২৬):** এটি চতুর্মুখী জোটের একটি ৫ বছরের পরিকল্পনা, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেয়।
- **WHO অতিমারি চুক্তি (Pandemic Agreement):** এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি।
- **মূল স্তম্ভ:** প্যাথোজেন অ্যাক্সেস অ্যান্ড বেনিফিট-শেয়ারিং (PABS) সিস্টেম, যা টিকার সমবন্টন এবং তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করে।

- **ম্যানহাটন নীতি (২০০৪):** এটি ১২টি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করেছিল যেখানে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হয় যে, "সবার স্বাস্থ্যই এক ও অভিন্ন।"

ভারতের ওয়ান হেলথ ইকোসিস্টেম

ক. **জাতীয় ওয়ান হেলথ মিশন (NOHM)** প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন উপদেষ্টা পরিষদ (PM-STIAC) দ্বারা চালু হওয়া এই মিশনটি পশুপালন ও দুগ্ধ বিভাগ (DAHD) এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সমন্বিত উদ্যোগ।

- **নজরদারি (Surveillance):** মানুষ ও প্রাণীর রোগ রিয়েল-টাইমে ট্র্যাক করার জন্য সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।
- **ল্যাব নেটওয়ার্ক:** সারা দেশে BSL-3 এবং BSL-4 ল্যাবরেটরির নেটওয়ার্ক তৈরি করা (বর্তমানে ২২টি ল্যাব এই নেটওয়ার্কের অধীনে আছে)।
- **সাড়া প্রদান (Response):** একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য "ওয়ান হেলথ সাপোর্ট ইউনিট" গঠন করা হয়েছে।

খ. রাজ্যভিত্তিক সফল উদ্যোগ

- **ওড়িশা:** টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রথমবার **জলবায়ু বাজেট (Climate Budget)** চালু করেছে।
- **কেরল:** মিনানগাডি মডেলের মতো অংশগ্রহণমূলক কার্বন-নিরপেক্ষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
- **তামিলনাড়ু:** পরিবেশগত চাপ কমাতে গ্রিন ক্লাইমেট কোম্পানি এবং "কুল রুফ" প্রজেক্ট চালু করেছে।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ বা বাধা

- **প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছিন্নতা (Institutional Silos):** PM-STIAC এবং নীতি আয়োগের মতে, মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের স্বাস্থ্য আলাদা আলাদা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকায় এবং তাদের কাজের ক্ষেত্র ভিন্ন হওয়ায় সঠিক সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়।
- **তহবিলের ভারসাম্যহীনতা:** বিশ্বব্যাংক ও WHO-এর মূল্যায়ন অনুযায়ী, বেশিরভাগ বরাদ্দ কেবল মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যয় হয়; প্রাণী স্বাস্থ্যের মতো প্রতিরোধমূলক খাতে মোট বাজেটের ১৫%-এরও কম বরাদ্দ দেওয়া হয়।
- **তথ্যের বিচ্ছিন্নতা (Data Fragmentation):** NCDC-এর রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে কোনো সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থা নেই। মানুষ এবং প্রাণীর তথ্যের ফরম্যাট আলাদা হওয়ায় দ্রুত রোগ প্রবৃত্তি দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
- **আইনি ও নিয়ন্ত্রক ঘাটতি:** ভারতে কোনো সুনির্দিষ্ট "ওয়ান হেলথ অ্যাক্ট" নেই। অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ORF)-এর মতে, বর্তমানের মহামারি রোগ আইন (১৮৯৭) আধুনিক সময়ের জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়।
- **পরিকাঠামো ও জনবল সংকট:** ICMR ও WOA-এর মতে, জেলা পর্যায়ে BSL-3 ল্যাবের চরম অভাব রয়েছে এবং গবাদি পশুর সংখ্যার তুলনায় পশুচিকিৎসকের অনুপাত আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে অনেক কম।
- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা:** FAO-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, কৃষকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং গবাদি পশু মেরে ফেলার ভয়ে (আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায়) রোগের খবর গোপন করার প্রবণতা বাস্তবায়নে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

- **সমন্বিত আইনি কাঠামো:** ভারতের উচিত একটি নির্দিষ্ট "ওয়ান হেলথ অ্যাক্ট" বা আইন তৈরির দিকে এগিয়ে যাওয়া। অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ORF)-এর আইনি সুপারিশ অনুযায়ী, এটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং যৌথ বাজেট নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধিবদ্ধ ভিত্তি প্রদান করবে।
- **"ওয়ান হেলথ" ইউনিট কার্যকর করা:** নীতি আয়োগের 'ভিশন ২০৩৫' অনুযায়ী, ভারতকে জেলা পর্যায়ে সমন্বিত নজরদারি ইউনিট স্থাপন করতে হবে। সেখানে চিকিৎসা, পশুচিকিৎসা এবং পরিবেশ কর্মকর্তাদের একই স্থানে নিয়োগ করতে হবে যাতে তৃণমূল স্তরে দ্রুত সাড়াপ্রদান নিশ্চিত করা যায়।
- **একীভূত ডেটা পরিকাঠামো:** ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের ওপর ভিত্তি করে একটি "ন্যাশনাল ওয়ান হেলথ ডিজিটাল পোর্টাল" তৈরি করা অপরিহার্য। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-এর মাধ্যমে মানুষের জন্য IDSP এবং প্রাণীদের জন্য NADRS সিস্টেমের তথ্যগুলোকে একে অপরের সাথে যুক্ত করবে।

- তথ্য প্রদানে উৎসাহ দান: FAO-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারের উচিত কৃষকদের জন্য "ক্ষতিপূরণ প্রকল্প" চালু করা। এতে আর্থিক ক্ষতির ভয়ে প্রাণিজাত রোগের প্রাদুর্ভাবের খবর গোপন করার প্রবণতা কমবে।
- "পরিবেশগত" স্বাস্থ্য শক্তিশালী করা: UNEP-এর সুপারিশ অনুযায়ী, ওয়ান হেলথ-কে কেবল ডাক্তার এবং পশুচিকিৎসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংযোগস্থলগুলো আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে নগর পরিকল্পনায় বন কর্মকর্তা এবং বাস্তুসংস্থানবিদদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বৈশ্বিক নেতৃত্ব: জি-২০ (G20) নয়াদিল্লি ঘোষণার প্রতিশ্রুতিগুলোকে কাজে লাগিয়ে ভারতের উচিত গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতৃত্ব দেওয়া। বিশেষ করে WHO অতিমারি চুক্তির PABS সিস্টেম কার্যকর করার মাধ্যমে চিকিৎসা সরঞ্জামের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

ওয়ান হেলথ পদ্ধতি গ্রহণ করা বর্তমানে একটি জৈবিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যকে সমন্বিত করার মাধ্যমে ভারত অতিমারি মোকাবিলায় সক্ষমতা, বৈশ্বিক নেতৃত্ব এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

Q. Discuss the significance of the One Health approach in strengthening pandemic preparedness and addressing emerging zoonotic diseases in India. What challenges hinder its effective implementation?
10 Marks

Scan to attempt more questions...



DEGREE + IAS INTEGRATED PROGRAMME

4-Year / 2-Year at ADAMAS UNIVERSITY

- IAS course now offered as a credit-based programme
- Complete IAS syllabus covered alongside graduation
- All IAS classes conducted by top Delhi faculty
- Honours subject syllabus aligned with respective UPSC-CSE Optional syllabus

Prepare for **IAS Exam** along with Your Graduation



সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. সাপ্লাই চেইন রেজিলিয়েন্স (সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিস্থাপকতা)

ভূমিকা

সাধারণ অর্থনৈতিক অর্থে, **সাপ্লাই চেইন** বা সরবরাহ শৃঙ্খল হলো সংস্থা, মানুষ এবং সম্পদের একটি রৈখিক নেটওয়ার্ক, যা একটি পণ্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়। তবে, **সাপ্লাই চেইন রেজিলিয়েন্স (SCR)** হলো একটি বাস্তবত্বের এমন এক **অভিযোজন ক্ষমতা**, যার মাধ্যমে এটি অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন—সেটি ভূ-রাজনৈতিক (যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা), পরিবেশগত (জলবায়ু পরিবর্তন) বা পদ্ধতিগত (অতিমারি) যাই হোক না কেন—তা আগে থেকে আঁচ করতে, প্রতিরোধ করতে এবং কাটিয়ে উঠতে পারে।



কেন ভারতের জন্য সাপ্লাই চেইন রেজিলিয়েন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্বজুড়ে এখন "দক্ষতা-প্রথম" (জাস্ট-ইন-টাইম) থেকে "স্থিতিস্থাপকতা-প্রথম" (জাস্ট-ইন-কেস) মডেলে যে পরিবর্তন আসছে, তার মূলে রয়েছে ভারতকে বাইরের ধাক্কা থেকে রক্ষা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তা।

১. "আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি" থেকে সুরক্ষা:

- **জ্বালানি-মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্ক:** ভারত তার প্রয়োজনীয় খনিজ তেলের ৮৫% আমদানির ওপর নির্ভরশীল। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ১০ ডলার বাড়লে ভারতের ফরেক্স বা বৈদেশিক মুদ্রার ভাগ্য থেকে ১৩-১৪ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে যায় এবং খুচরা মুদ্রাস্ফীতি (CPI) ৩০-৪০ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে যায়।
- **রাজস্ব বোঝা:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ঘটনার ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে সার ভর্তুকির খরচ বেড়ে যায়। এটি সরকারের রাজকোষ ঘাটতি বাড়ায় এবং সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করে।

২. "গভীর উৎপাদন" (Deep Manufacturing) ব্যবস্থায় রূপান্তর:

- **"মিডস্ট্রিম" বা মধ্যবর্তী ব্যবধান:** এপিআই (API) এবং গুরুত্বপূর্ণ সেমিকন্ডাক্টরের জন্য একটি নির্দিষ্ট দেশের (চীন) ওপর ৭০% নির্ভরশীলতা, ভারতের ৩০০ বিলিয়ন ডলারের ইলেকট্রনিক্স এবং ফার্মাসিউটিক্যাল লক্ষ্যমাত্রার পথে একটি বড় বাধা বা "চোক-পয়েন্ট" তৈরি করে।

৩. "কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন" (Strategic Autonomy) রক্ষা করা:

- **বাজারের অস্ত্রায়ন:** ইলেকট্রিক গাড়ির (EV) জন্য লিথিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা থাকলে, বিদেশি শক্তিগুলো সেই সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে ভারতের ওপর কৌশলগত চাপ তৈরির সুযোগ পায়।
- **"চীন প্লাস ওয়ান" (China Plus One) সুবিধা:** একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য সাপ্লাই চেইন ভারতের প্রধান শক্তি (USP), যা চীন থেকে সরে আসা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে (MNC) ভারতে বিনিয়োগ করতে আকৃষ্ট করে।

৪. "সবুজ রূপান্তর" (Green Transition) ত্বরান্বিত করা: ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ইলেকট্রিক যানবাহন (EV) এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন।

- **খনিজ সম্পদের চ্যালেঞ্জ:** "তেল নির্ভরতা" কাটিয়ে উঠে যাতে আবার নতুন করে "খনিজ নির্ভরতা" (লিথিয়াম, কোবাল্ট, রেয়ার আর্থ মেটাল) তৈরি না হয়, সেজন্য ভারতকে KABIL এবং চক্রাকার অর্থনীতি (রিসাইক্লিং) উদ্যোগের মাধ্যমে শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অস্থিরতা কমানো:

- **কৃষি-স্থিতিস্থাপকতা:** অনিয়মিত বর্ষা এবং তাপপ্রবাহ ডাল ও তৈলবীজের সরবরাহকে ব্যাহত করে। গ্রামীণ সংকট এবং খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে জলবায়ু-সহনশীল সাপ্লাই চেইন এবং **কৌশলগত মজুদ (Strategic Reserves)** গড়ে তোলা অপরিহার্য।

খাত-ভিত্তিক সাপ্লাই চেইন ঝুঁকি বিশ্লেষণ

১. **জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খল: "আমদানি-মুদ্রাস্ফীতি" ফাঁদ** জ্বালানি হলো ভারতের অর্থনীতিতে বাইরের ধাক্কা পৌঁছানোর প্রধান পথ।
 - **আমদানির বাস্তবতা:** ভারত প্রায় **৮৫% অপরিশোধিত তেল** এবং **৫০% প্রাকৃতিক গ্যাস** আমদানি করে। হরমুজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পথে কোনো সমস্যা হলে পরিবহন এবং উৎপাদন খরচ তাৎক্ষণিকভাবে বেড়ে যায়।
 - **কৌশলগত ঘাটতি:** বর্তমানে ভারতের **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR)** মাত্র **৯.৫ দিনের** নিট আমদানির সুরক্ষা দিতে পারে—যা দীর্ঘস্থায়ী ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয়।
 - **সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব:** তেলের দাম ১০ ডলার বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার পাশাপাশি **চলতি হিসাবের ঘাটতি (CAD)** বৃদ্ধি পায়।
২. **খাদ্য ও সার: "গ্রামীণ সংকট" যোগসূত্র** খাদ্যশস্যের নিট রপ্তানিকারক হওয়া সত্ত্বেও ভারতের কৃষি উৎপাদন আমদানিকৃত উপকরণের ওপর নির্ভরশীল।
 - **P&K সারের ব্যবধান:** ইউরিয়া উৎপাদনে ভারত অনেকটা স্বাবলম্বী হলেও **ফসফ্যাটিক (P)** এবং **পটাশীয় (K)** সারের জন্য মরক্কো, জর্ডান এবং রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল।
 - **ভোজ্য তেল ও ডাল:** ভারত তার ভোজ্য তেলের চাহিদার মাত্র **৪৪% অভ্যন্তরীণভাবে** উৎপাদন করে। ইন্দোনেশিয়া (পাম তেল) বা দক্ষিণ আমেরিকার (সয়াবিন) সরবরাহ ব্যবস্থায় সামান্য পরিবর্তন ভারতের সাধারণ মানুষের হেঁশেলে প্রভাব ফেলে।
 - **রাজস্ব ঝুঁকি:** বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম বাড়লে সরকারের **সার ভর্তুকির বিল** আকাশচুম্বী হয়, যা রাজকোষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।
৩. **উৎপাদন ও প্রযুক্তি: "মিডস্ট্রিম" বা মধ্যবর্তী স্তরের ফাঁক** ভারত পণ্য সংযোজনে (Assembly) দক্ষ হলেও মূল যন্ত্রাংশ (Component) উৎপাদনে পিছিয়ে আছে।
 - **ফার্মা (API ঝুঁকি):** "বিশ্বের ওষুধের দোকান" বলা হলেও ভারত ওষুধের কাঁচামাল বা **এপিআই-এর (API) জন্য ৬৫-৭০% চীনের ওপর নির্ভরশীল**। চীনের অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যায় ভারতের ওষুধ রপ্তানি থমকে যেতে পারে।
 - **ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর:** ভারতের ৩০০ বিলিয়ন ডলারের ইলেকট্রনিক্স লক্ষ্যমাত্রা তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার 'ফ্যাব' (Fab) কেন্দ্রিকতার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে ভারতে পণ্যের **মূল্য সংযোজন (Value-addition) মাত্র ১৫-২০%**।
 - **মূলধনী পণ্য:** উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প যন্ত্রপাতি (রোবোটিক্স/সিএনসি মেশিন) আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা ভারতের দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।
৪. **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি: "সবুজ" নির্ভরতা** "সবুজ অর্থনীতিতে" রূপান্তর নতুন ধরনের কাঠামোগত ঝুঁকি তৈরি করছে।
 - **কেন্দ্রীভূত হওয়ার ঝুঁকি:** লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং রেয়ার আর্থ মেটাল (REEs)—যা ইভি এবং প্রতিরক্ষা খাতের জন্য জরুরি—তার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার **৬০%-এর বেশি চীনের নিয়ন্ত্রণে**।
 - **জ্বালানি নিরাপত্তা ২.০:** ৫০০ গিগাওয়াট অ-ফসিল জ্বালানি ক্ষমতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো মধ্যপ্রাচ্যের **তেল নির্ভরতা** কাটিয়ে চীনের **খনিজ নির্ভরতার** দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকি।
 - **প্রযুক্তির বাধা:** কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআই (AI) চিপস মুষ্টিমেয় কিছু দেশের হাতে থাকায় ভারত ভবিষ্যতে **"প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞার"** মুখে পড়তে পারে।

- নিচে আপনার প্রদান করা তথ্যের সহজ ও সাবলীল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। এটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে আপনি সরাসরি এটি Word ফাইল-এ কপি করে ব্যবহার করতে পারেন।

সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিস্থাপকতায় সরকারি উদ্যোগ

ভারত একটি বৈশ্বিক "সরবরাহ শৃঙ্খলের ভোক্তা" থেকে "দেশীয় বাস্তুতন্ত্রের নির্মাতা" হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। এর প্রধান স্তম্ভগুলো হলো:

১. **উৎপাদন ভিত্তিক প্রণোদনা (PLI) প্রকল্প:** ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে (যেমন: ব্যাটারি, ওষুধ) লক্ষ্য করে এই প্রকল্প করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ভারতকে কম মূল্যের 'অ্যাসেম্বলি' বা পণ্য জোড়া দেওয়ার কাজ থেকে সরিয়ে উচ্চ মূল্যের যন্ত্রাংশ তৈরির (Component manufacturing) কেন্দ্রে পরিণত করা।
২. **পিএম গতি শক্তি ও জাতীয় লজিস্টিক নীতি (NLP):** ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল ও ভৌত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে লজিস্টিক বা পণ্য পরিবহন খরচ জিডিপি-র ১৪% থেকে কমিয়ে ৮%-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
৩. **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন:** ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এটি ইম্পাত ও রিফাইনারির মতো ভারী শিল্পগুলোকে কার্বনমুক্ত করবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে।
৪. **কাবিল (KABIL - Khanij Bidesh India Ltd):** এটি একটি বিশেষ যৌথ উদ্যোগ যা বৈদ্যুতিক যানবাহন (EV) এবং প্রতিরক্ষা খাতের জন্য বিদেশ থেকে লিথিয়াম ও কোবাল্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের উৎস নিশ্চিত করে ভারতের "জ্বালানি নিরাপত্তা ২.০" নিশ্চিত করবে।
৫. **ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (ISM):** দেশীয়ভাবে 'ফ্যাব' (Fab) বা চিপ তৈরির কারখানা ও ডিসপ্লে ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য ১০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশেষ কাঠামো। এর লক্ষ্য হলো ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পূর্ব এশিয়ার ওপর "সিলিকন নির্ভরশীলতা" কাটানো।
৬. **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR) – দ্বিতীয় পর্যায়:** চন্ডীখোল এবং পাদুরে খনিজ তেল মজুদের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়বে এবং পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সামুদ্রিক অবরোধের সময়ও অর্থনীতি সুরক্ষিত থাকবে।

বৈশ্বিক প্রবণতা

১. **"ফ্রেন্ড-শোরিং" (Friend-Shoring) এবং "অ্যালি-শোরিং":** দেশগুলো এখন প্রতিকূল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক চাপ এড়াতে তাদের সাপ্লাই চেইনকে "বিশ্বস্ত অংশীদার" বা বন্ধু দেশগুলোর (যেমন: ভারত-মার্কিন-ইইউ) দিকে সরিয়ে নিচ্ছে।
২. **"চীন প্লাস ওয়ান" (China Plus One) কৌশল:** বহুজাতিক কোম্পানিগুলো (MNCs) শুধুমাত্র চীনের ওপর নির্ভরশীল থাকার ঝুঁকি কমাতে তাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলো ভারত, ভিয়েতনাম এবং মেক্সিকোর মতো দেশে সরিয়ে এনে উৎপাদন ব্যবস্থার বৈচিত্র্য বাড়চ্ছে।
৩. **ডিকাপলিং বনাম ডি-রিস্কিং:** ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জি-৭ দেশগুলোর মধ্যে এখন "ডি-রিস্কিং" বা ঝুঁকি কমানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হলো বিশ্ব বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও নির্দিষ্ট কিছু দেশের (যেমন: রেয়ার আর্থের জন্য চীন বা গ্যাসের জন্য রাশিয়া) ওপর থেকে অতি-নির্ভরশীলতা কমানো।

সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিস্থাপকতা তৈরিতে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **উচ্চ লজিস্টিক খরচ:** 'পিএম গতি শক্তি' থাকা সত্ত্বেও ভারতের পণ্য পরিবহন খরচ এখনও জিডিপি-র ১৩-১৪%। এই উচ্চ খরচ দেশীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় এবং আমদানি বিকল্প পণ্য তৈরির পথে বাধা সৃষ্টি করে।
২. **বিপরীত শুল্ক কাঠামো (Inverted Duty Structure):** অনেক ক্ষেত্রে তৈরি পণ্যের তুলনায় কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক বেশি থাকে। এটি দেশীয় উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে এবং নির্মাতাদের প্রকৃত উৎপাদনের বদলে শুধু "পণ্য জোড়া দেওয়া" বা অ্যাসেম্বলিতে উৎসাহিত করে।

৩. MSME-তে প্রযুক্তির অভাব: ভারতের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (MSME) পর্যাপ্ত মূলধন এবং গবেষণার (R&D) অভাব রয়েছে। ফলে তারা বৈশ্বিক মানসম্পন্ন উচ্চ-নির্ভুল যন্ত্রাংশ বা বিশেষায়িত রাসায়নিক তৈরি করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।
৪. গুরুত্বপূর্ণ খনিজের অভাব: ভারতে লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং রেয়ার আর্থ মেটালের (REEs) নিজস্ব মজুদ সীমিত। অস্ট্রেলিয়া বা লাতিন আমেরিকার "লিথিয়াম ট্রায়্যাঙ্গেল" থেকে এগুলো নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং ব্যয়বহুল।
৫. দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া: সেমিকন্ডাক্টর মিশনের মতো উচ্চ-প্রযুক্তিগত কাজ সফল হতে কয়েক দশক ধরে বিনিয়োগ এবং জল-বিদ্যুৎ-মেধার সমন্বয় প্রয়োজন। এটি কোনো তাৎক্ষণিক সমাধান নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদী ম্যারাথন।
৬. "দক্ষতা বনাম স্থিতিস্থাপকতা"র সংঘাত: পণ্য মজুদ করা এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা ব্যয়বহুল। চীনের মতো "সবচেয়ে সস্তা" উৎস ছেড়ে "বিশ্বস্ত উৎসের" দিকে ফিরলে পণ্যের দাম ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

ভবিষ্যৎ পথচলা: স্থিতিস্থাপক ভারতের কৌশল

১. মধ্যবর্তী স্তরের উৎপাদন বাড়ানো: শুধুমাত্র পণ্য জোড়া দেওয়ার বদলে এপিআই (API), সেমিকন্ডাক্টর এবং বিশেষ রাসায়নিকের মতো মধ্যবর্তী যন্ত্রাংশ উৎপাদনে জোর দিয়ে সরবরাহের বাধা বা "চোকপয়েন্ট" দূর করতে হবে।
২. তীব্র "সম্পদ কূটনীতি": লিথিয়াম ট্রায়্যাঙ্গেল এবং আফ্রিকার দেশগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ নিশ্চিত করতে কাবিল (KABIL)-এর মাধ্যমে সক্রিয় কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে।
৩. লজিস্টিক বাধা দূর করা: পিএম গতি শক্তি এবং জাতীয় লজিস্টিক নীতিকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করে পরিবহন খরচ ৮%-এ নামিয়ে আনতে হবে, যাতে দেশীয় পণ্য বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক হয়।
৪. বহুমুখী কৌশলগত মজুদ: শুধু তেলের (SPR) মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভোজ্য তেল, ডাল এবং সারের জন্যও কৌশলগত মজুদ গড়ে তুলতে হবে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে ঢাল হিসেবে কাজ করবে।
৫. বিশ্বস্ত নেটওয়ার্ক জোরদার করা: SCRI (জাপান/অস্ট্রেলিয়া) এবং iCET (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)-এর মতো জোটগুলোকে ব্যবহার করে 'ফ্রেন্ড-শোরিং' নিশ্চিত করতে হবে এবং উন্নত প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার পেতে হবে।
৬. চক্রাকার অর্থনীতির প্রসার: ই-বর্জ্য থেকে রেয়ার আর্থ মেটাল পুনরুদ্ধারের জন্য "আরবান মাইনিং" বা নগর খনি ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে। এটি কাঁচামাল আমদানির চাহিদা কমাবে এবং পরিবেশের সুরক্ষা দেবে।

উপসংহার

ভারতের ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রাকে সুরক্ষিত রাখতে হলে আমাদের "বৈশ্বিক দর-গ্রহণকারী" (Price-Taker) থেকে "কৌশলগত মূল্য-নির্ধারক" (Value-Maker) হতে হবে। আত্মনির্ভরশীলতার সাথে বিশ্বস্ত বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের মেলবন্ধন ঘটিয়েই ভারত একটি স্থিতিশীল, শক্তিশালী এবং সার্বভৌম অর্থনৈতিক যুগ নিশ্চিত করতে পারে।

Q. The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance.' Explain this statement with examples. 10 Marks

3.1.2. ভারতের LPG সংকট: সরবরাহ নিরাপত্তা বিহীন এক জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা

ভূমিকা

- ভারত প্রায় ৩৩ কোটি পরিবারকে পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানির আওতায় এনেছে, যার মূল ভিত্তি হলো এলপিগিজ। তবে পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালীতে বাধার ফলে ভারতের অতিরিক্ত আমদানিনির্ভরতা এবং দুর্বল সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে।



- বর্তমানে এটি স্পষ্ট যে, নারী ক্ষমতায়ন ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নেওয়া এই রূপান্তরটি একটি সুরক্ষিত ও রাষ্ট্র-পরিচালিত সরবরাহ ব্যবস্থার পরিবর্তে ভঙ্গুর বৈশ্বিক বাজারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রেক্ষাপট: কেরোসিন থেকে এলপিগিজ-তে রূপান্তর

১. কেরোসিন যুগ – রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত জনকল্যাণ

- কয়েক দশক ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান রান্নার জ্বালানি ছিল কেরোসিন, যা রেশন কার্ডের মাধ্যমে গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS)-এর অধীনে সরবরাহ করা হতো।
- সরকার স্থানীয় ডিপোগুলোতে জ্বালানির ভৌত মজুদ (Physical Stocks) বজায় রাখত এবং পুরো সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ করত, যা পরিবারগুলোকে আন্তর্জাতিক মূল্যের আকস্মিক বৃদ্ধি থেকে সুরক্ষা দিত।
- তবে, কেরোসিন এবং জৈব জ্বালানি (কাঠ, ঘুঁটে) পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট মারাত্মক অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ নারী ও শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ এবং অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২. এলপিগিজ-তে স্থানান্তর – আধুনিক জ্বালানি উন্নয়ন

- ২০১৬ সাল থেকে সরকার কেরোসিনের পরিবর্তে এলপিগিজ ব্যবহারের ওপর জোর দেয়, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (PMUY)-এর অধীনে।
- ২০২৪ সালের মধ্যে ১৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আনুষ্ঠানিকভাবে “কেরোসিন-মুক্ত” ঘোষণা করা হয়েছে, যা জ্বালানি নীতিতে একটি বড় পরিবর্তন।
- কেরোসিনের তুলনায় এলপিগিজ-র ক্যালোরিফিক মান (Calorific Value) অনেক বেশি, যার ফলে রান্না দ্রুত, পরিচ্ছন্ন এবং সাশ্রয়ী হয় এবং নারীদের সময়ের অপচয় হ্রাস পায়।

৩. রাষ্ট্রের পরিবর্তিত ভূমিকা

- আগে রাষ্ট্র সরাসরি জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ করত (কেরোসিন)।
- এখন এলপিগিজ-র ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সরাসরি মজুদ নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে এসে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা (Subsidy Management) এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ হয়েছে।
- এর ফলে বড় আকারের মজুদ বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভৌত দায়বদ্ধতা (Physical Responsibility) হ্রাস পেয়েছে, যা সাধারণ পরিবারগুলোকে বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহের সংকটের মুখে অরক্ষিত করে তুলেছে।

ভারতের বর্তমান LPG সংকট: আমদানি বৃদ্ধি, সরবরাহ বিঘ্ন এবং মজুদের অভাব

১. আমদানিনির্ভরতা বৃদ্ধি

- ভারতের বার্ষিক এলপিগিজ (LPG) ভোগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩১-৩৩ মিলিয়ন টনে।
- মোট চাহিদার প্রায় ৬০-৬৫% আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয় (২০১৫ সালে যা ছিল ৪৭%)।
- গত এক দশকে আমদানি তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২০ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে।

২. পশ্চিম এশিয়া ও হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরতা

- ভারতের এলপিগিজ আমদানির প্রায় ৯০% আসে পশ্চিম এশিয়া (সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সৌদি আরব ও কুয়েত) থেকে।
- এই আমদানির সিংহভাগই হরমুজ প্রণালী (Strait of Hormuz) নামক সংকীর্ণ ও যুদ্ধবিস্কুল জলপথ দিয়ে আসে।
- পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ বা অবরোধ তৈরি হলে ভারতের অর্ধেক সরবরাহ শৃঙ্খল সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. মজুদের ঘাটতি ও কৌশলগত ভারসাম্যহীনতা

- ভারতে দৈনিক প্রায় ৮০,০০০ টন এলপিগিজ প্রয়োজন, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরেজ ক্ষমতা মাত্র ১.৪ লক্ষ টন।

- এই মজুদ জাতীয় চাহিদার দুই দিনেরও কম সময়ের জন্য যথেষ্ট।
- বিপরীতে, ভারতের কৌশলগত অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) মজুদ প্রায় ৬০ দিনের জন্য সংরক্ষিত, যা জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে।

৪. সংকটের স্বল্পমেয়াদী প্রভাব

- ২০২৬ সালের মার্চের প্রথমার্ধে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় এলপিগি ভোগ প্রায় ১৭-১৮% হ্রাস পেয়েছে।
- সরকার উজ্জ্বলা (PMUY) গ্রাহকদের সুরক্ষা দিতে বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতের বরাদ্দ কমিয়ে গৃহস্থালির সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

LPG, LNG এবং PNG-এর ধারণা

১. এলপিগি (LPG) – গৃহস্থালির রান্নার গ্যাস

- উপাদান: প্রোপেন ও বিউটেনের মিশ্রণ।
- অবস্থা ও মজুদ: সাধারণ তাপমাত্রায় মাঝারি চাপে তরল করে স্টিল সিলিন্ডারে রাখা হয়; এটি গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় পরিবহনের জন্য আদর্শ।
- উৎস: প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ এবং তেল শোধনাগারের উপজাত।

২. এলএনজি (LNG) – শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতের জ্বালানি

- উপাদান: মূলত মিথেন (CH_4)।
- অবস্থা ও মজুদ: প্রাকৃতিক গ্যাসকে -162° সেলসিয়াসে (Cryogenic state) শীতল করা হয়, যা এর আয়তন ৬০০ গুণ কমিয়ে সমুদ্রপথে দূরপাল্লার পরিবহনে সাহায্য করে।
- লজিস্টিকস: এটি ব্যবহারের জন্য বিশেষায়িত জাহাজ এবং রিগ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল (যেমন দাহেজ, কোচি) প্রয়োজন।

৩. পিএনজি (PNG) – শহরের পাইপলাইন গ্যাস

- উপাদান: মূলত মিথেন (CH_4)।
- বন্টন: এটি পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসীয় অবস্থায় সরাসরি গ্রাহকের কাছে পৌঁছায়।
- লজিস্টিকস: এর জন্য ঘন পাইপলাইন নেটওয়ার্ক প্রয়োজন, তাই এটি মূলত শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ।
- ব্যবহার: নিরবচ্ছিন্ন রান্নার কাজ এবং ছোট আকারের শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি ও জনকল্যাণের গুরুত্ব

১. বিস্তার এবং পরিধি

- ভারতে মোট ঘরোয়া এলপিগি (LPG) সংযোগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৩ কোটিতে, যা গত এক দশকে দ্বিগুণেরও বেশি।
- শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (PMUY)-এর মাধ্যমেই দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা (BPL) এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মহিলাদের ১০.৩৩ কোটিরও বেশি সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
- এর ফলে ভারত বর্তমানে আমেরিকার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এলপিগি ব্যবহারকারী দেশে পরিণত হয়েছে।

২. স্বাস্থ্য এবং সময় সাশ্রয়

- বিভিন্ন গবেষণা (যেমন IISD) অনুযায়ী, কাঠ বা ঘুঁটের পরিবর্তে এলপিগি ব্যবহার করায় জ্বালানি সংগ্রহ ও রান্নার ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় ১ ঘণ্টা সময় সাশ্রয় হয়।
- এলপিগি ব্যবহারে অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ হ্রাস পায়, যা শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, চোখের সমস্যা এবং কম ওজনের শিশু জন্মের ঝুঁকির সাথে সরাসরি যুক্ত।

- তথ্য-প্রমাণ অনুযায়ী, এর ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, কারণ তাঁরা দিনের বেশিরভাগ সময় ঘরের ভেতরে কাটান।

৩. সামাজিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব

- এই প্রকল্পটি একটি দৃশ্যমান সরকারি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত; সিলিভারের গায়ে সরকারি লোগো থাকে এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT)-এর মাধ্যমে ভর্তুকির টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়।
- এটি পারিবারিক জ্বালানি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে নারীদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করেছে এবং দূষণকারী জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও গ্যাস-ভিত্তিক শক্তির জন্য সরকারি প্রকল্প

১. প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (PMUY)

- ২০১৬ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মহিলাদের বিনামূল্যে এলপিগ্যাস সংযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি চালু হয়।
- সাফল্য: ২০২২ সালের মধ্যে ১০ কোটির বেশি সংযোগ এবং বর্তমানে PMUY 1.0, 2.0 ও 3.0 মিলিয়ে সংযোগ সংখ্যা ১০.৩৩ কোটি ছাড়িয়েছে।
- সহায়তা: সিলিভার, রেগুলেটর এবং সুরক্ষা সরঞ্জামের জন্য নগদ সহায়তা এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি রিফিলে প্রায় ৩০০ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়।

২. গোবর্ধন প্রকল্প

- পুরো নাম: Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan।
- উদ্দেশ্য: গবাদি পশুর বর্জ্য এবং জৈব আবর্জনাকে বায়োগ্যাস (Biogas) ও সারে রূপান্তরিত করা, যাতে এলপিগ্যাস-র ওপর নির্ভরতা কমে এবং গ্রামীণ পরিচ্ছন্নতা বাড়ে।
- মূল ধারণা: প্রতিটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট একটি গ্রামের ক্লাস্টারে ৫-১০টি পরিবারকে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে।
- তবে রক্ষণাবেক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার অভাবে অনেক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বর্তমানে নিষ্ক্রিয় (Dormant) অবস্থায় রয়েছে।

৩. কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ

- আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের আকস্মিক ধাক্কা সামলাতে ভারতের কাছে প্রায় ৬০ দিনের অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) মজুদ রয়েছে।
- কিন্তু এলপিগ্যাস-র জন্য এ ধরনের বড় মাপের কোনো কৌশলগত মজুদ নেই। ম্যাঙ্গালোর এবং বিশাখাপত্তনমের আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবার্ন (Underground Caverns) বা ভূগর্ভস্থ গহ্বরগুলিতে মাত্র ১.৪ লক্ষ টন মজুদ ক্ষমতা রয়েছে—যা দুই দিনেরও কম সরবরাহের সমান।

নিচে আপনার দেওয়া বিষয়বস্তুটির একটি সংক্ষিপ্ত এবং নির্ভুল বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি বোল্ড (Bold) করে চিহ্নিত করা হয়েছে:

ভারতের LPG-ভিত্তিক জনকল্যাণ ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ ও কাঠামোগত ঘাটতি

১. রিফিল করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধা

- প্রাথমিক সংযোগ বিনামূল্যে হলেও, একটি সিলিভার রিফিল করার খরচ অনেক সময় ৮০০-১,০০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়।
- উজ্জ্বলা (PMUY) গ্রাহকদের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন স্বাভাবিক সময়েও রিফিল করার সামর্থ্য রাখেন না, ফলে সংযোগ থাকলেও ব্যবহার হয় না।
- গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য সরকারি ভর্তুকি পর্যাপ্ত নয়।

২. লজিস্টিক ও সরবরাহ শৃঙ্খলের ঘাটতি

- গ্রামীণ এলাকায় সিলিভার বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ৪৫ দিন বা তার বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়।
- সরবরাহ কমে গেলে অপেক্ষার সময় আরও বেড়ে যায় এবং দরিদ্র এলাকা থেকে সিলিভার অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হতে পারে।
- গ্রামে **পাইপলাইন (PNG)** অবকাঠামো না থাকায় তারা সম্পূর্ণভাবে সিলিভারের ওপর নির্ভরশীল, যা সড়ক ও রেল পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল।

৩. সামাজিক অসমতা ও প্রবেশাধিকারের সমস্যা

- বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী, গ্রাম পর্যায়ে গ্যাস বন্টন ব্যবস্থায় **জাতপাত ও সামাজিক আধিপত্য** প্রভাব ফেলে।
- তফসিলি জাতি ও উপজাতি (SC/ST)** পরিবারগুলো সিলিভার বরাদ্দে কম অগ্রাধিকার এবং বুকিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানায়।
- মহিলারা নামমাত্র সুবিধাভোগী হলেও, গ্যাসের দাম, বুকিং বা ডেলিভারির ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না; এগুলো ডিলার ও মধ্যস্থত্বভোগীদের হাতে থাকে।

৪. সংকটের সময় মহিলাদের ওপর বর্ধিত চাপ

- এলপিগিজ দুস্প্রাপ্য বা মহার্ঘ হয়ে পড়লে মহিলারা পুনরায় **জৈব জ্বালানি (কাঠ, ঘুঁটে)** ব্যবহারে বাধ্য হন।
- এর ফলে তাঁদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি ও শারীরিক পরিশ্রম বেড়ে যায়, যা উজ্জ্বলা যোজনার সাফল্যকে হুমকি দেয়।
- খরাপ্রবণ এবং বনসংলগ্ন দুর্গম এলাকাগুলোতে **জ্বালানি রূপান্তর (Energy Transition)** আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

৫. নীতিগত লক্ষ্য ও অবকাঠামোর মধ্যে অমিল

- সবার কাছে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য থাকলেও, সেই তুলনায় **মজুদ ক্ষমতা (Storage)** বা বিকল্প জ্বালানির অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি।
- রাষ্ট্র এলপিগিজ-কে কেবল একটি **"ভর্তুকি প্রকল্প"** হিসেবে দেখেছে, কিন্তু একে একটি পূর্ণাঙ্গ **"জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা"** হিসেবে গড়ে তোলার অগ্রাধিকার দেয়নি।
- এর ফলে **"নিরাপত্তাহীন জনকল্যাণ"**-এর ফাঁদ তৈরি হয়েছে: রাষ্ট্র সংযোগ দিতে পারলেও বৈশ্বিক সংকটের সময় সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: বিকল্প ব্যবস্থা ও স্থিতিস্থাপকতা তৈরি

১. এলপিগিজ-র কৌশলগত মজুদ (Strategic Storage) বৃদ্ধি

- অপরিশোধিত তেলের মতো এলপিগিজ-র ক্ষেত্রেও অন্তত **৪৫-৬০ দিনের** ব্যবহারযোগ্য **কৌশলগত মজুদ (Strategic Buffer)** গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- ভূগর্ভস্থ মজুদের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ:
 - রাজস্থানের **সল্ট ক্যাভার্ন** (বিকানের-বার্মার অঞ্চল): এটি সাশ্রয়ী এবং দ্রুত গ্যাস উত্তোলনের জন্য উপযোগী।
 - পেনিনসুলার **শিল্প**: দক্ষিণ ভারতের স্থিতিশীল গ্রানাইট শিলান্তরে **রক-ক্যাভার্ন** প্রকল্প।
 - পরিমিত **গ্যাস ক্ষেত্র**: কৃষ্ণা-গোদাবরী (KG) বেসিন ও ক্যান্স-র খালি গ্যাস ক্ষেত্রগুলোকে বড় আকারের মজুদে ব্যবহার করা।

২. সরবরাহ উৎস ও পথের বৈচিত্র্যকরণ

- শুধুমাত্র পশ্চিম এশিয়ার ওপর নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ। **আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা** (যেমন অ্যাঙ্গোলা)-র সাথে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে এই অতিনির্ভরতা কমাতে হবে।
- এলপিগিজ আমদানির একটি নির্দিষ্ট অংশ **হরমুজ প্রণালী** ব্যতীত বিকল্প সামুদ্রিক পথে (যেমন ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়ে) আনা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৩. বৈশ্বিক সর্বোত্তম পদ্ধতির অনুসরণ

- ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো ভারতকেও শীতকাল বা উৎসবের মরসুমের (দীপাবলি, বিয়ে) আগে এলপিগিজ মজুদের ৯০% পূর্ণ রাখার নিয়ম চালু করতে হবে।
- সংকটের সময় গৃহস্থালি ও হাসপাতালকে অগ্রাধিকার দেওয়ার স্পষ্ট নীতিমালা জনসমক্ষে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৪. বিকল্প জ্বালানির পুনরুজ্জীবন

- গোবর্ধন (GOBARDHAN) প্রকল্পের মাধ্যমে বায়োগ্যাস ব্যবস্থার বিস্তার:
 - প্রায় ৫০ লক্ষ নিষ্ক্রিয় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সংস্কারের জন্য প্রতি ইউনিটে ১০,০০০ টাকা পুনরুজ্জীবন ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে।
- যেসব এলাকায় এলপিগিজ পৌঁছানো কঠিন, সেখানে উন্নত ও ধোঁয়াহীন উনুন (Improved Biomass Stoves) প্রচার করা।

৫. পিএনজি (PNG) ও সিটি-গ্যাস অবকাঠামো ত্বরান্বিত করা

- শহরাঞ্চলে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস (PNG) সরবরাহ বাড়ালে সিলিভারের ওপর চাপ কমবে।
- PNGRB-কে ২০২৭ সালের মধ্যে ১০০টিরও বেশি শহরে সিটি গ্যাস নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্য নিতে হবে।

৬. সংকটকালীন ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন

- জরুরি অবস্থায় জ্বালানি বন্টনের জন্য "ট্রায়াজ রুল" (Triage Rules) বা অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা:
 - প্রথম অগ্রাধিকার: গৃহস্থালি (বিশেষ করে মহিলা পরিচালিত এবং SC/ST পরিবার)।
 - দ্বিতীয় অগ্রাধিকার: হাসপাতাল ও স্কুল।
 - নিম্ন অগ্রাধিকার: বড় বাণিজ্যিক ব্যবহারকারী ও রপ্তানি শিল্প।
- জেলা ও রাজ্য স্তরে রিয়েল-টাইম মনিটরিং ড্যাশবোর্ড তৈরি করা।

উপসংহার

ভারতের এলপিগিজ-চালিত জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেও বৈশ্বিক বাজার ও দুর্বল মজুদের কারণে এটি এখনও ঝুঁকিপূর্ণ। এই ব্যবস্থাকে টেকসই করতে হলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই আমদানি বৈচিত্র্যকরণ, বড় আকারের মজুদ, শক্তিশালী পিএনজি নেটওয়ার্ক এবং স্থানীয় বিকল্প জ্বালানি গড়ে তোলার মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তবেই আন্তর্জাতিক সংকট দরিদ্রতম মানুষদের পুনরায় ধোঁয়াযুক্ত উনুনের দিকে ঠেলে দিতে পারবে না।

Q. Critically examine how India's clean cooking push under PMUY has exposed vulnerabilities in energy supply chains amid global disruptions. Suggest a resilient way forward. 15 Marks

3.1.3. ভারতের টেক্সটাইল খাতের অগ্রগতিতে তাপপ্রবাহের সংকট

ভূমিকা

- বাংলাদেশ সহ অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা ভারতের দিকে ঝুঁকছেন। ফলে ভারতের টেক্সটাইল খাতে বর্তমানে একটি ঐতিহাসিক উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' (Make in India) উদ্যোগের অধীনে ভারত বিশ্বের অন্যতম পছন্দের উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে।



- তবে এই জোয়ার এখন এক কঠোর জৈবিক ও যান্ত্রিক বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে: তা হলো চরম তাপজনিত চাপ (Heat Stress)। এই সংকট নীরবে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা, কারখানার আউটপুট এবং দীর্ঘমেয়াদী শিল্প প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

ভারতের টেক্সটাইল শিল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র

ভারতের টেক্সটাইল খাত অর্থনীতির একটি অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর, যা কৃষি এবং শিল্পায়নের মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। নিচে দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে এই খাতের ব্যাপ্তি বোঝা সম্ভব:

- **অর্থনৈতিক অবদান এবং জিডিপি-তে অংশ:**
 - এই শিল্প ভারতের জিডিপি (GDP)-তে প্রায় ২.৩% অবদান রাখে, মোট শিল্প উৎপাদনের ১৩% দখল করে এবং জাতীয় রপ্তানির ১২% জোগান দেয়।
 - ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারত ৩৪.৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানি করেছে, যার মধ্যে ৪২% ছিল তৈরি পোশাক বা অ্যাপারেল (Apparel)।
- **বিশ্ব দরবারে অবস্থান এবং উৎপাদন ক্ষমতা:**
 - ভারত বর্তমানে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম টেক্সটাইল ও পোশাক রপ্তানিকারক এবং তুলা ও রেশম উৎপাদনে ও ব্যবহারে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।
 - ভারত বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে চার ধরনের বাণিজ্যিক রেশম (মালবেরি, তসর, মুগা এবং এরি) উৎপাদিত হয়। ২০২৩-২৪ সালে মোট ৩৮,৯১৩ মেট্রিক টন রেশম উৎপাদিত হয়েছে।
- **কর্মসংস্থান এবং বাজারের পরিধি:**
 - কৃষির পর এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত, যা ৪৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের সরাসরি জীবিকা নির্বাহ করে। এর মধ্যে একটি বড় অংশ হলো নারী এবং গ্রামীণ জনসংখ্যা।
 - বর্তমান ১৭৪ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাজারের আকার ৩৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) ভূমিকা:**
 - এই শিল্পের মোট ক্ষমতার প্রায় ৮০% অংশই ছড়িয়ে রয়েছে এমএসএমই (MSME) ক্লাস্টারগুলোতে, যা এই খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতিকে (Inclusive Nature) প্রতিফলিত করে।
- **বিশ্বব্যাপী প্রদর্শনী:**
 - ভারত টেক্স (Bharat Tex) ২০২৪-এর মতো আয়োজনগুলো ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছে। ১২০টিরও বেশি দেশ থেকে ১,২০,০০০-এর বেশি দর্শনার্থী এতে অংশ নেন, যেখানে ‘খামার থেকে ফ্যাশন’ (Farm to Fashion) পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইন প্রদর্শিত হয়েছে।

ভারতের টেক্সটাইল শিল্পের গুরুত্ব

টেক্সটাইল শিল্প কেবল একটি বাণিজ্যিক খাত নয়, বরং ভারতের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার:

- **কর্মসংস্থানের চালিকাশক্তি:** টেক্সটাইল শিল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে। এটি গ্রামীণ যুবক, নারী এবং এমএসএমই (MSME) খাতের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। পাশাপাশি তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মতো রাজ্যগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়।
- **রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা:** এটি ভারতের রপ্তানি ঝুড়িতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য খাতকে (External Sector) শক্তিশালী করে।

- MSME-এর মাধ্যমে **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি**: এই শিল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) আধিপত্য শিল্পায়নের আঞ্চলিক বিস্তার এবং সুসম উন্নয়ন নিশ্চিত করে।
- **কৃষির সাথে সংযোগ**: এটি তুলা, রেশম এবং পাট উৎপাদনের সাথে যুক্ত কৃষকদের সহায়তা করে এবং তাদের **আয়ের বৈচিত্র্য** নিশ্চিত করে।
- **বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে কৌশলগত ভূমিকা**: ভারত বিশ্বজুড়ে একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, যা দেশের **ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব** বৃদ্ধি করছে।
- **জাতীয় মিশনের সাথে সংহতি**: এই খাতটি "মেক ইন ইন্ডিয়া," "স্কিল ইন্ডিয়া" এবং "অটল ইনোভেশন" মিশনের সাথে নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা দেশীয় উৎপাদন উৎকর্ষের একটি পরীক্ষাগার হিসেবে কাজ করছে।

ভারতের টেক্সটাইল শিল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা সত্ত্বেও, একটি "যান্ত্রিক এবং জৈবিক বাস্তবতা" ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলোকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের মতো অস্থির কেন্দ্রগুলো থেকে সরে আসা আন্তর্জাতিক অর্ডারের জোয়ার এখন **চরম তাপপ্রবাহের** বাধার মুখে পড়ছে।

১. তাপজনিত চাপ এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস (মূল সমস্যা):

- চরম তাপ মানবশ্রমের সক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে, যা সরাসরি **উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতাকে** প্রভাবিত করছে।
- বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অনুসারে, তাপমাত্রা **৩৩-৩৪°C** পৌঁছালে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা প্রায় **৫০% হ্রাস** পায়, কারণ শরীরকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে বাঁচাতে মানুষ শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে দেয়।
- ভারতের অনেক টেক্সটাইল ইউনিটে ইনডোর তাপমাত্রা প্রায়ই **৩৫-৪০°C** ছাড়িয়ে যায়, যা নিরাপদ কর্মপরিবেশের সীমার অনেক উপরে।
- **আর্থিক ক্ষতি**: ২০০১-২০২০ সালের মধ্যে তাপজনিত চাপের কারণে ভারত বার্ষিক প্রায় **২৫৯ বিলিয়ন কর্মঘণ্টা** হারিয়েছে, যার আর্থিক মূল্য বছরে প্রায় **৬০০ বিলিয়ন ডলার**।
- ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত তার মোট কর্মঘণ্টার **৫.৮%** হারাতে পারে, যা **৩৪ মিলিয়ন পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের** সমান।

২. শ্রমিকদের ওপর প্রভাব (মানবিক মূল্য):

- অনানুষ্ঠানিক ও স্বল্প আয়ের শ্রমিকরা এই তাপের বোঝা সরাসরি বহন করে। এর ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা কমার সাথে সাথে **মজুরি হ্রাস** পায়।
- শীতলীকরণ বিরতি (Cooling breaks), সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি বা সামাজিক নিরাপত্তার অভাব তাদের আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
- **স্বাস্থ্য ঝুঁকি**: হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি এবং কিডনিজনিত জটিল রোগের ঝুঁকি প্রবল। এটি মূলত দরিদ্রদের ওপর একটি **"বৈষম্যমূলক কর" (Regressive Tax)** হিসেবে কাজ করে।

৩. শিল্প ও উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়া:

- চরম তাপের কারণে উৎপাদন ক্ষমতা **৫০% পর্যন্ত হ্রাস** পেতে পারে এবং অনিরাপদ পরিবেশের কারণে কাজের সময় দৈনিক মাত্র **৪-৫ ঘণ্টায়** নেমে আসে।
- অতিরিক্ত তাপের কারণে **যন্ত্রপাতি বিকল** হওয়া এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটি উৎপাদন চক্রকে ব্যাহত করে, ফলে আন্তর্জাতিক ডেলিভারি সময়মতো সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. সরবরাহ শৃঙ্খলের চাপ এবং বৈশ্বিক বৈষম্য:

- আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো সময়মতো পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ হলে কারখানা মালিকদের ওপর **ভারী জরিমানা** আরোপ করে।

- মালিকরা তখন বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের শারীরিক সীমার বাইরে কাজ করান অথবা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো অনেক সময় ঝুঁকি এড়াতে অর্ডার ভিয়েতনাম বা মেক্সিকোতে সরিয়ে নেয়, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন খরচ (Adaptation cost) ভাগ করে নিতে চায় না।

৫. জলবায়ু পরিবর্তন: একটি কাঠামোগত অর্থনৈতিক ঝুঁকি:

- তাপজনিত চাপ এখন আর কোনও সাময়িক সমস্যা নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত বাধা। একে "থার্মোডাইনামিক বটলেনেক" বা তাপগতিবিদ্যার বাধা বলা হচ্ছে।
- গবেষণা দেখায় যে, তাপমাত্রা প্রতি ১°C বৃদ্ধিতে বার্ষিক অর্থনৈতিক উৎপাদন ২% হ্রাস পায়।

৬. আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা:

- বিশেষ করে এমএসএমই (MSME) গুলোর শীতলীকরণ পরিকাঠামো বা তাপ-প্রতিরোধী প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার মতো মূলধনের অভাব রয়েছে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ দেওয়ার সময় জলবায়ু ঝুঁকিকে সঠিকভাবে বিবেচনা করে না, যা এই খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে সীমিত করেছে।

৭. শ্রম ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ঘাটতি:

- ভারতের বর্তমান শ্রম আইন তাপজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত নয়। কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সীমা, বাধ্যতামূলক বিরতি এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের গ্যারান্টিযুক্ত আইনি বিধানের অভাব রয়েছে।

টেক্সটাইল আধুনিকায়নে প্রধান সরকারি উদ্যোগসমূহ

ভারত সরকার টেক্সটাইল খাতের আধুনিকীকরণ এবং এর কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প চালু করেছে:

- PM MITRA (মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়ন অ্যান্ড অ্যাপারেল) পার্ক: ৪,৪৪৫ কোটি টাকা বাজেটের এই প্রকল্পের অধীনে সাতটি পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো সমন্বিত শিল্প পরিকাঠামো প্রদান করা, লজিস্টিক খরচ কমানো এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি করা।
- উৎপাদন ভিত্তিক প্রণোদনা (PLI) স্কিম: ১০,৬৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দের এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ম্যান-মেড ফাইবার (MMF) এবং টেকনিক্যাল টেক্সটাইল উৎপাদনে ভারতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- প্রযুক্তি এবং দক্ষতা উন্নয়ন:
 - ATUFS (অ্যাডভান্সড টেকনোলজি আপগ্রেডেশন ফান্ড স্কিম): ১৭,৮২২ কোটি টাকার এই বাজেট এমএসএমই (MSME) খাতের প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণে মূলধনী বিনিয়োগে সহায়তা করে।
 - সমর্থ (Samarth) স্কিম: এটি দক্ষতা প্রশিক্ষণের ওপর আলোকপাত করে। ইতিমধ্যে ৩.৮২ লাখেরও বেশি মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এর কর্মসংস্থানের হার (Placement rate) প্রায় ৭৭%।
- খাত-ভিত্তিক মিশনসমূহ:
 - জাতীয় টেকনিক্যাল টেক্সটাইল মিশন (NTTM): ১,৪৮০ কোটি টাকার এই মিশনের লক্ষ্য ভারতকে হাই-টেক স্পেশালিটি ফাইবারে বিশ্বসেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
 - কস্তুরী কটন ভারত: ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় তুলার ব্র্যান্ডিং এবং এর উৎস চিহ্নিতকরণ (Traceability) নিশ্চিত করার একটি প্রোগ্রাম।

- **সিঙ্ক সমগ্র এবং জুট-আইসিআরই (Jute-ICARE):** গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে রেশম ও পাটের গুণমান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নিবেদিত প্রকল্প।
- **বাণিজ্য চুক্তি:** অতিরিক্ত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে RoSCTL (রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর এবং শুল্ক মকুব) সুবিধা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে ১৪টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), যা ভারতীয় বস্ত্রের জন্য শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।
- **বাজেট বরাদ্দ:** ২০২৫-২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে টেক্সটাইল মন্ত্রকের জন্য ৫,২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে (১৯% বৃদ্ধি)। এতে শাটল-লেস লুমের ওপর শুল্ক ছাড় এবং সস্তা আমদানি রুখতে নিটেড কাপড়ের ওপর কাস্টমস শুল্ক বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশিকা: জলবায়ু-স্মার্ট সরবরাহ শৃঙ্খলে রূপান্তর

দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে ভারতকে শ্রম-শোষণকারী উৎপাদন মডেল থেকে সরে এসে একটি **জলবায়ু-সহনশীল (Climate-resilient)** এবং **শ্রমিক-কেন্দ্রিক** মডেল গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য একটি পদ্ধতিগত রূপান্তর প্রয়োজন:

- **তাপজনিত চাপকে অর্থনৈতিক ঝুঁকি হিসেবে স্বীকৃতি:** তাপজনিত চাপকে একটি প্রধান অর্থনৈতিক এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং একে **শিল্প নীতি** ও রপ্তানি কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে।
- **বাধ্যতামূলক হিট অ্যাকশন প্ল্যান:** শিল্প ইউনিটগুলোতে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সীমা (প্রায় ৩০°C), শীতলীকরণ বিরতি এবং নমনীয় শিফট চালু করতে হবে। এটি রিয়েল-টাইম হিট মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত।
- **জলবায়ু-সংবেদনশীল অর্থায়ন:** ব্যাংকগুলোর উচিত ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তে জলবায়ু ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করা। সরকারকে শীতলীকরণ পরিকাঠামো এবং জল-ব্যবস্থাপনার জন্য ভর্তুকিযুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **শ্রম সুরক্ষা কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** শ্রম আইনে তাপজনিত চাপের স্পষ্ট বিধান থাকতে হবে, যাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পানীয় জলের সুবিধা এবং বাধ্যতামূলক বিশ্রামের বিরতি নিশ্চিত করা যায়।
- **প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রচার:** বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত **পরিধানযোগ্য শীতলীকরণ ডিভাইস (Wearable cooling devices)**, শক্তি-সংশয়ী কারখানার নকশা এবং তাপ-প্রতিরোধী তুলার জাতের উদ্ভাবন।
- **বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর দায়বদ্ধতা:** আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের উচিত ন্যায্য মূল্য প্রদান করা এবং ডেলিভারি সময়সীমার ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া, যাতে তারা জলবায়ু অভিযোজনের খরচ ভাগ করে নেয়।
- **জলবায়ু-সহনশীল শিল্প পরিকল্পনা:** টেকসই শিল্প প্রবৃদ্ধির জন্য **সবুজ টেক্সটাইল ক্লাস্টার (Green textile clusters)** তৈরি এবং উন্নত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
- **উপাত্ত, গবেষণা এবং সহযোগিতা:** রিয়েল-টাইম তথ্য এবং গবেষণার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। সরকার, শিল্প এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে।

উপসংহার

ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্পের ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত হওয়ার পথটি অবশ্যই **জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামো** এবং **শক্তিশালী শ্রম সুরক্ষার** ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক দায়বদ্ধতাকে এর প্রবৃদ্ধি কৌশলের সাথে একীভূত করার মাধ্যমে ভারত যেমন **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি** নিশ্চিত করতে পারবে, তেমনি সুরক্ষিত করতে পারবে সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মঙ্গল যারা এই টেক্সটাইল স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করছেন।

Q. Climate change is emerging as a structural constraint on labor-intensive industries in India. Examine this statement in the context of the India's textile industry. 15 Marks

3.1.4. ভারতের ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত শ্রেণি: প্রকৃত গতিশীলতা ছাড়াই প্রবৃদ্ধি

ভূমিকা

- ভারত দারিদ্র্য বিমোচনে চিত্তাকর্ষক উন্নতি করেছে এবং বিভিন্ন লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের (Targeted Welfare Schemes) মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রচলিত দারিদ্র্যসীমার (Poverty Lines) উপরে তুলে এনেছে। তবে এই অগ্রগতির আড়ালে একটি বড় সমস্যা রয়ে গেছে—অনেকেই একটি 'ভঙ্গুর মধ্যবর্তী' (Vulnerable Middle) অবস্থানে আটকে আছেন, যারা স্বল্প আয়, চাকরির অস্থিরতা এবং সীমাবদ্ধ উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার সম্মুখীন।
- বিশ্বব্যাংকের (World Bank) সাম্প্রতিক একটি গবেষণা পত্রে শুধুমাত্র দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা গণনার পরিবর্তে, একটি শোভন জীবনযাত্রার মান (Decent Standard of Living) থেকে মানুষের দূরত্ব পরিমাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যা গভীরতর অর্থনৈতিক ফাটলগুলোকে প্রকাশ্যে আনে।



প্রেক্ষাপট: দারিদ্র্য-ভিত্তিক পরিমাপের সীমাবদ্ধতা

বিশ্বব্যাংকের নিম্ন মধ্যম-আয়ের দারিদ্র্যসীমার (Lower Middle-Income Poverty Line) নিচে থাকা ভারতীয়দের হার এক দশক আগের ৫০%-এর বেশি থেকে কমে বর্তমানে প্রায় ৩০%-এ দাঁড়িয়েছে। ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT) এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (Financial Inclusion) মতো কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো এতে সহায়তা করেছে। তবে, দারিদ্র্যসীমা প্রকৃত পরিস্থিতির কেবল একটি আংশিক চিত্র তুলে ধরে।

- দারিদ্র্যসীমা শুধুমাত্র এটি নির্দেশ করে যে ব্যক্তি ন্যূনতম বেঁচে থাকার সীমা (Minimum Survival Threshold) অতিক্রম করেছে কিনা, কিন্তু এটি সেই সীমার উপরে থাকা মানুষের জীবনযাত্রার মান প্রকাশ করে না। দারিদ্র্যসীমার ঠিক উপরে থাকা অনেক পরিবারই এখনও আয়ের অস্থিরতা, স্বল্প সঞ্চয় এবং উচ্চমাত্রার ঝুঁকির (Vulnerability) মধ্যে রয়েছে, যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে অত্যন্ত ভঙ্গুর করে তুলেছে।
- বিশ্বব্যাংকের নতুন কাঠামো: এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে বিশ্বব্যাংক গতানুগতিক "দরিদ্র বনাম অ-দরিদ্র" (Poor vs Non-poor) শ্রেণিবিভাগের বাইরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। তারা একটি পর্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Spectrum-based Approach) প্রস্তাব করেছে, যেখানে কল্যাণ পরিমাপ করা হবে একজন ব্যক্তি একটি যুক্তিসঙ্গত জীবনযাত্রার মান থেকে কতটা দূরে রয়েছেন তার ওপর ভিত্তি করে। এর ফলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ভঙ্গুরতার বিভিন্ন স্তরগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle-Income Class - MIC) সম্পর্কে

ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি (MIC)-এর কোনও একক সংজ্ঞা নেই, তবে সাধারণভাবে এটিকে এমন একটি সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ গোষ্ঠী হিসেবে ধরা হয় যাদের দারিদ্র্য পতনের ঝুঁকি কম।

- Organisation for Economic Co-operation and Development অনুযায়ী, যাদের দৈনিক আয় \$10-\$100, তারা মধ্যবিত্ত।
- People Research on India's Consumer Economy (PRICE) অনুযায়ী, যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ₹৫ লাখ-₹৩০ লাখ (২০২০-২১), তারা MIC-এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্রেণিভিত্তিক বৈশিষ্ট্য

- নিম্ন মধ্যবিত্ত (Lower Middle Class): এরা তাদের আয়ের বড় অংশ ব্যয় করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ভোগ্যপণ্য, যানবাহন ও গৃহস্থালী সামগ্রীতে, ফলে সঞ্চয়ের সুযোগ কম থাকে।
- উচ্চ মধ্যবিত্ত (Upper Middle Class): এরা বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যে (যেমন কম্পিউটার, এয়ার কন্ডিশনার) ব্যয় করতে সক্ষম এবং তাদের আর্থিক নমনীয়তা বেশি।

- **বাস্তবিক দুর্বলতা (Vulnerability):** e-Shram portal-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৯৪.১১% অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকের আয় ₹১০,০০০-এর নিচে, যা অস্থিতিশীল আয় ও সীমিত জীবনমান উন্নতি নির্দেশ করে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবর্তনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব

ক. অর্থনীতির ওপর প্রভাব

- **ভোগব্যয় বৃদ্ধির ইঞ্জিন:** ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তের আয় ভারতের ভোক্তা বাজারের (Consumer Landscape) ধরন বদলে দিচ্ছে। এটি পোশাক, যোগাযোগ এবং জীবনযাত্রার পণ্যের পেছনে ব্যয় বৃদ্ধি করছে। PRICE-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো প্রায় ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত ভোগব্যয় পরিচালনা করবে।
- **নতুন বাজার সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা:** শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেশীয় ও বৈশ্বিক ব্যবসার জন্য একটি বিশাল আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক বাজার (Aspirational Market) হিসেবে কাজ করছে। এটি স্টার্ট-আপ এবং ডিজিটাল পরিষেবাগুলোর চাহিদা বাড়িয়ে উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি:** একটি স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করে, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়—যা দীর্ঘমেয়াদী **অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের (Inclusive Development)** জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক পুঁজি তৈরি করে।

খ. নগর পরিকাঠামো ও নগর উন্নয়ন

- **টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলোর বিকাশ:** মধ্যবিত্তের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতা ছোট শহরগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কেন্দ্রে পরিণত করছে, যা বড় মেগাসিটির বাইরেও রিটেইল এবং রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে।
- **আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক শহুরে স্থানের উত্থান:** মধ্যবিত্তের ভোগব্যয়ের ধরন ছোট শহরগুলোতে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স এবং ক্যাফে কালচারের বিস্তার ঘটিয়েছে, যা ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র বদলে দিচ্ছে।
- **আবাসিক জীবনযাত্রার লোকতন্ত্রীকরণ:** এক সময়ের অভিজাত 'গেটেড কমিউনিটি' সংস্কৃতি এখন টিয়ার-২ শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ছে, যা মধ্যবিত্তের আবাসন সংক্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

গ. সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব

- **প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ:** গবেষণায় দেখা গেছে যে, বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, উন্নত সুশাসন এবং জাতীয় স্তরে উন্নত আর্থ-সামাজিক ফলাফলের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।
- **সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন:** ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মধ্যবিত্ত সমাজ গণতান্ত্রিক আদর্শ, বাক-স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারকে প্রাধান্য দেয়। তারা পরিবেশ সচেতনতা প্রদর্শন করে এবং নাগরিক জীবনে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি **প্রগতিশীল সামাজিক ধারা (Progressive Social Feedback Loop)** তৈরি করে।

ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক. অর্থনৈতিক ও আর্থিক চাপ

- **মুদ্রাস্ফীতির চাপ:** বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ **ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income)** কমিয়ে দিচ্ছে। একটি বড় চিকিৎসা সংকট কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারকে পুনরায় দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
- **ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা:** গৃহস্থালীর আর্থিক সঞ্চয় জিডিপি ৫%-এ নেমে এসেছে, বিপরীতে **অসুরক্ষিত ঋণ (Unsecured Borrowing)** বাড়ছে। সম্পদ তৈরির বদলে এখন সাধারণ ভোগব্যয়ের জন্য ক্রেডিট বা ঋণ ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **সুবিধা ছাড়া কর প্রদান:** মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রধান **করদাতা (Taxpayer)** হওয়া সত্ত্বেও তারা সরাসরি কোনো সামাজিক নিরাপত্তা বা বিশেষ প্রণোদনা পায় না, যা নিম্নবিত্তেরা লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

খ. কাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত বাধা

- **অটোমেশনের ফলে কর্মচ্যুতি:** এআই (AI) এবং অটোমেশন ব্যাংকিং, আইটি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মধ্যবর্তী স্তরের পেশাদার চাকরিগুলোকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

- **বেকারত্ব সংকট:** যুব বেকারত্ব (প্রায় ৪৫%) এবং স্নাতক পাস করাদের বেকারত্বের হার (প্রায় ২৯%) নির্দেশ করে যে, শিক্ষা এখন আর **উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার (Upward Mobility)** গ্যারান্টি নয়।
- **কৃষিতে বিপরীত অভিবাসন (Reverse Migration):** ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে স্থবিরতার কারণে ২০১৬-২০২১ সালের মধ্যে ২.৪ কোটি চাকরি বিলুপ্ত হয়েছে, ফলে অনেক কর্মী পুনরায় **স্বল্প-উৎপাদনশীল কৃষি কাজে** ফিরে যাচ্ছে।

গ. সামাজিক চ্যালেঞ্জ

- **মানব উন্নয়ন ঘাটতি:** ভারতে শিশুদের **শীর্ণতা (Child Wasting)** এবং **খর্বতা (Stunting)**-এর উচ্চ হার ভবিষ্যতে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর উন্নতির সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে।
- **সামাজিক সীমাবদ্ধতা:** পিতৃতান্ত্রিক প্রথা এখনও মধ্যবিত্ত নারীদের পেশাগত অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে, যা পারিবারিক আয়ের ভিত্তি সংকুচিত করে।

মধ্যবিত্তের প্রতি নীতিগত অবহেলার কারণসমূহ

- **স্বনির্ভরতার মিথ:** নীতিনির্ধারকরা মনে করেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিস্থাপক এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এটি একটি **ভুল ধারণা (Misconception)** যা পরোক্ষ কর ও মুদ্রাস্ফীতির চাপকে উপেক্ষা করে।
- **বৈচিত্র্যময় গঠন:** মধ্যবিত্ত শ্রেণি সরকারি চাকুরিজীবী থেকে শুরু করে **গিগ ওয়ার্কার** ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় এদের জন্য নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করা কঠিন।
- **রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরের অভাব:** মধ্যবিত্তরা সাধারণত সংগঠিত **চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group)** হিসেবে কাজ করে না এবং তাদের ভোটদানের হারও তুলনামূলকভাবে কম।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থতা:** প্রতি বছর ১.২ কোটি যুবক শ্রমবাজারে প্রবেশ করলেও পর্যাপ্ত চাকরির অভাবে তারা কৃষিতে ফিরে যাচ্ছে, যা জাতীয় উৎপাদনে (Output) মাত্র ১৮% অবদান রাখে।
- **শীর্ষে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া:** ভারতের শীর্ষ ১% মানুষ জাতীয় আয়ের ২২%-এর বেশি দখল করে রেখেছে, যা মধ্যবিত্তের উদ্বেগের প্রতি **রাজনৈতিক মনোযোগ** কমিয়ে দিচ্ছে।
- **নীতি কাঠামোতে কম প্রতিনিধিত্ব:** নীতি নির্ধারণী সংস্থাগুলো মূলত বড় ব্যবসায়ী লবি এবং গ্রামীণ নির্বাচনী স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়, ফলে মধ্যবিত্তের সমস্যাগুলো **প্রান্তিক (Marginalised)** থেকে যায়।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: প্রবৃদ্ধি ও গতিশীলতার মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপন

মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে একটি স্থায়ী **"ভঙ্গুর স্তরে" (Vulnerable Layer)** পরিণত হওয়া থেকে আটকাতে নীতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন:

- **উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** সরকারকে **Make in India** এবং **PLI (Production Linked Incentive)** প্রকল্পের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে প্রতি বছর শ্রমবাজারে আসা ১.২ কোটি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একইসাথে ন্যূনতম মজুরি সংশোধন ও খাত-ভিত্তিক প্রণোদনার মাধ্যমে মজুরি ও উৎপাদনশীলতার সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- **আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান জোরদার:** বর্তমানে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ১০%-এর কম, যা বাড়াতে হবে। এর জন্য **লেবার কোড (Labour Codes)** ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রম আইন সহজ করা, **MSME** খাতের প্রসার এবং **e-Shram** পোর্টালে নিবন্ধিত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য **EPF, ESI** ও স্বাস্থ্য বিমার মতো **সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security)** নিশ্চিত করতে হবে।
- **মধ্যবিত্তের জন্য বিশেষ নীতি প্রণোদনা:** শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয়ের ওপর **মধ্যবিত্ত-নির্দিষ্ট ট্যাক্স রিবেট** চালু করা, **PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana)**-এর মাধ্যমে **সাশ্রয়ী আবাসনে** ভর্তুকি দেওয়া এবং সরাসরি সুবিধা নিশ্চিত করতে শ্রমবাজারের সংস্কার প্রয়োজন।
- **উন্নত কল্যাণ পরিমাপক গ্রহণ:** **NITI Aayog** এবং **অর্থনৈতিক সমীক্ষায় (Economic Survey)** বিশ্বব্যাংকের **'ওয়েল-বিইং স্পেকট্রাম' (Well-being Spectrum)** মডেল গ্রহণ করতে হবে। গতানুগতিক দারিদ্র্যসীমার বাইরে গিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক গতিশীলতা (**Mobility**) পরিমাপ করতে হবে।

- **অটোমেশন ও দক্ষতার ঘাটতি মোকাবেলা:** আইটি, ব্যাংকিং ও ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মতো অটোমেশন-ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলোর জন্য Skill India ও PMKVY-এর অধীনে দেশজুড়ে রিস্কিলিং (Reskilling) প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। বিশেষ নজর দিতে হবে এআই (AI) এবং গ্রিন টেকের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলোতে।
- **ঋণ হ্রাস ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি:** RBI-এর প্রচারণার মাধ্যমে আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy) বাড়ানো, অসুরক্ষিত ঋণের লাগাম টানা এবং দীর্ঘমেয়াদী আমানতের ওপর কর ছাড় দিয়ে সঞ্চয় উৎসাহিত করতে হবে, যাতে জিডিপির ৩৮% পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া গৃহস্থালী ঋণ কমানো যায়।

উপসংহার

ভারতের উন্নয়নকে এখন কেবল দারিদ্র্য বিমোচনের গণ্ডি পেরিয়ে একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle-income Class) গঠনে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার (Upward Mobility) মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপন করা একটি ভঙ্গুর মধ্যবিত্তের উত্থান রোধে এবং প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) জন্য অপরিহার্য।

Q. India's growth story has reduced poverty but failed to ensure upward mobility. Examine in the context of the emerging 'vulnerable middle class'. 15 Marks

3.1.5. ভারতের শহরের অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তি

শহরের অনানুষ্ঠানিক খাত (Urban Informal Sector) কী?

শহরের অনানুষ্ঠানিক খাত বলতে শহরের অর্থনীতির সেই অংশকে বোঝায় যেখানে ক্ষুদ্রায়তন ও অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীরা কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানূনের বাইরে কাজ করেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—আইনি স্বীকৃতির অভাব, অনিয়মিত আয় এবং কোনো সামাজিক সুরক্ষা বা বীমার সুবিধা না থাকা।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **আইনি মর্যাদা (Legal Status):** এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত "অনিবন্ধিত" হয়। অর্থাৎ, এগুলি কোম্পানি আইন বা জিএসটি (GST)-র মতো কোনো আনুষ্ঠানিক ট্যাক্স কাঠামোর অধীনে নিবন্ধিত থাকে না।
- **চাকরির প্রকৃতি (Employment Nature):** নিয়োগকর্তা ও কর্মীর সম্পর্ক কোনো লিখিত চুক্তির বদলে সাধারণত মৌখিক বা সাময়িক সম্মতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
- **শ্রমশক্তি (Workforce):** এতে স্বনির্ভর কর্মী (যেমন- হকার, রিকশাচালক) এবং ছোট কারখানার (যেমন- পোশাক তৈরি বা নির্মাণ কাজ) দিনমজুর—উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।
- **পুঁজি ও প্রযুক্তি (Capital & Tech):** এই খাতের কাজগুলো সাধারণত অধিক শ্রমনির্ভর হয়। এখানে মূলধন বা পুঁজির বিনিয়োগ খুব কম এবং সাধারণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।



ভারতের শহরের অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব

১. অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও জিডিপি-তে অবদান

- **৫০% স্তম্ভ:** কোনো আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন না থাকা সত্ত্বেও, এই খাত ভারতের মোট জিডিপি (GDP)-র প্রায় অর্ধেক জোগান দেয়।
- **অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা:** অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে (যেমন- ২০২০ পরবর্তী সময়), এই খাতটি "শক অ্যাবজরবার" হিসেবে কাজ করে। আনুষ্ঠানিক খাত থেকে কাজ হারানো কর্মীদের এটি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়।
- **সাশ্রয়ী দক্ষতা:** এটি আনুষ্ঠানিক শিল্পের খরচ কমাতে সস্তায় বিভিন্ন পণ্য ও সেবা (যেমন- লজিস্টিকস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মেরামত) সরবরাহ করে।

২. কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন

- **বিপুল কর্মসংস্থান:** শহরের মোট শ্রমশক্তির ৯০%-এরও বেশি এই খাতে নিয়োজিত। গ্রাম থেকে শহরে আসা লক্ষ লক্ষ অভিবাসীর জন্য এটিই হলো কাজের প্রথম সুযোগ।
- **দারিদ্র্যের রক্ষাকবচ:** হকারি বা নির্মাণ কাজের মতো সহজলভ্য কাজের সুযোগ তৈরি করে এটি শহরের বিপুল সংখ্যক মানুষকে চরম দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করে।

৩. সামাজিক ও নাগরিক উপযোগিতা

- **অপরিহার্য সেবা প্রদানকারী:** অনানুষ্ঠানিক কর্মী ছাড়া শহরের জীবন থমকে যাবে। তারা যা পরিচালনা করেন:
 - **শহরের লজিস্টিকস:** ডেলিভারি পার্টনার এবং রিকশাচালক।
 - **পরিচ্ছন্নতা:** অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রাহকরা শহরের আবর্জনা পুনর্ব্যবহারযোগ্য (Recycle) করতে বড় ভূমিকা রাখেন।
 - **খাদ্য নিরাপত্তা:** রাস্তার হকাররা শহরের গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে সস্তায় পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেন।
- **সামাজিক মর্যাদা:** এটি পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (SC/ST/OBC) এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

৪. আনুষ্ঠানিক পরিকাঠামোকে সহায়তা করা

- **পারস্পরিক যোগসূত্র:** আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বড় কোম্পানিগুলো তাদের খরচ কমাতে অনেক কাজ (যেমন- প্যাকেজিং, ডেলিভারি, অ্যাসেম্বলি) অনানুষ্ঠানিক ইউনিটগুলোকে দিয়ে করিয়ে নেয়।

৫. 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর জন্য কৌশলগত গুরুত্ব

- **স্থানীয় উৎপাদন:** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (MSMEs) আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং স্বনির্ভরতা অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **ডিজিটাল রূপান্তর:** হকারদের মধ্যে ইউপিআই (UPI) এবং ডিজিটাল লেনদেনের দ্রুত ব্যবহার (যেমন- প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের সাফল্য) ভারতকে একটি 'নগদবিহীন' বা 'লেস-ক্যাশ' অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের অনানুষ্ঠানিক খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. কাঠামোগত ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

- **"বামনত্ব" বা ছোট হয়ে থাকার ফাঁদ (Dwarfism Trap):** অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ৬০%-এরও বেশি মাত্র একজন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত। এই "বামন" প্রতিষ্ঠানগুলো বড় হতে পারে না, কারণ তাদের কাছে মাঝারি আকারের আনুষ্ঠানিক কোম্পানিতে রূপান্তর করার মতো পর্যাপ্ত মূলধন বা পুঁজি নেই।
- **স্থবির উৎপাদনশীলতা:** গত বছর এই খাতে ৭৪.৫ লক্ষ নতুন কাজ যুক্ত হলেও, কর্মীপ্রতি উৎপাদন ক্ষমতা (GVA) বেড়েছে মাত্র ৪.৫%। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, এই খাতটি উচ্চমানের কাজ তৈরির বদলে মূলত বাড়তি শ্রমিকদের কোনোমতে টিকিয়ে রাখছে।
- **"মাঝারি স্তরের অভাব" (Missing Middle):** মাঝারি মাপের প্রতিষ্ঠানের অভাবে বড় আকারের উৎপাদন সম্ভব হয় না। ফলে একদিকে হাতেগোনা কিছু বিশাল বড় কোম্পানি এবং অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র ও অনানুষ্ঠানিক ইউনিটের এক অসম চিত্র দেখা যায়।

২. শ্রমিক ও সামাজিক দুর্বলতা

- **সামাজিক সুরক্ষার অভাব:** ই-শ্রম (e-Shram) পোর্টালে ৩১ কোটি নিবন্ধন থাকা সত্ত্বেও, বাস্তব ক্ষেত্রে বীমা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং পেনশনের সুবিধা পাওয়ার হার অত্যন্ত কম। এর প্রধান কারণ হলো বাস্তবায়নের ত্রুটি এবং মালিকপক্ষের অবদানের অভাব।

- **পেশাগত ঝুঁকি:** নির্মাণ কাজ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ঘরে বসে পণ্য তৈরির কাজে যুক্ত কর্মীরা প্রায়ই সুরক্ষা সরঞ্জাম বা স্বাস্থ্য বীমা ছাড়াই বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করেন।

৩. নতুন 'ডিজিটাল' চ্যালেঞ্জ (গিগ ইকোনমি)

- **লুকানো খরচ:** গিগ ওয়ার্কাররা (যেমন- ডেলিভারি বয়) তাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (বাইক, ফোন, জ্বালানি) নিজেরা বহন করেন। অথচ "স্বাধীন ঠিকাদার" হিসেবে গণ্য হওয়ায় তারা শ্রমিকের আইনি অধিকারগুলো পান না।
- **ডিজিটাল বিভাজন ও লিঙ্গ বৈষম্য:** অনানুষ্ঠানিক খাতের মহিলারা ডিজিটাল সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বেশি বাধার সম্মুখীন হন, যার ফলে তারা কম আয়ের সাধারণ গৃহস্থালি কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেন।

৪. আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক বাধা

- **ঋণের অভাব:** অনানুষ্ঠানিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) মাত্র ১৪% আনুষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা পায়। বাকিরা মহাজনদের ওপর নির্ভর করে, যেখানে বার্ষিক সুদের হার ৩০-৫০% পর্যন্ত হয়।
- **আইন পালনের বোঝা:** জিএসটি (GST) বা উদ্যম (Udyam) পোর্টাল থাকা সত্ত্বেও, ছোট ইউনিটের জন্য হিসাবরক্ষক রাখা বা ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করার খরচ অনেক সময় ব্যবসার লাভের চেয়েও বেশি হয়ে যায়।

শহরের অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য সরকারি উদ্যোগ

- **ই-শ্রম পোর্টাল ২.০ (e-Shram Portal):** এটি অসংগঠিত শ্রমিকদের একটি **জাতীয় ডেটাবেস**। এটি বর্তমানে একটি "ওয়ান-স্টপ সলিউশন" হিসেবে কাজ করে, যা ১৪টিরও বেশি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পেতে একটি পোর্টেবল ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN) প্রদান করে।
- **প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প (PM SVANidhi):** এটি শহরের হকারদের **জামানত-বিহীন ঋণ** প্রদান করে। ২০৩০ সালের মার্চ পর্যন্ত এর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দিতে এতে বিশেষ সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।
- **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহুরে ২.০ (PMAY-U):** এটি পরিযায়ী শ্রমিক এবং শহরের দরিদ্রদের কর্মস্থলের কাছে মর্যাদাপূর্ণভাবে থাকার জন্য **সাশ্রয়ী ভাড়া আবাসন (ARHCs)** তৈরির ওপর জোর দেয়।
- **সামাজিক সুরক্ষা কোড (২০২০/২০২৫):** এটি প্রথমবারের মতো **গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের** আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্য, অক্ষমতা ও মাতৃত্বকালীন সুবিধার জন্য একটি বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা তহবিল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে।
- **প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প:** এটি প্রথাগত শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ, আধুনিক সরঞ্জাম এবং ঋণের সুবিধা দিয়ে তাদের বিশ্ববাজারের সাথে যুক্ত করতে **সব ধরনের সহায়তা** প্রদান করে।
- **দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা (NULM):** এটি দক্ষতা প্রশিক্ষণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs) গঠন এবং 'সিটি লাইভলিহুড সেন্টার'-এর মাধ্যমে শহরের মানুষের **দারিদ্র্য দূরীকরণে** কাজ করে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা:** ই-শ্রম কার্ডের (UAN) মাধ্যমে স্বাস্থ্য (আয়ুস্মান ভারত) এবং পেনশনের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পরিযায়ী শ্রমিকরা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গেলেও তাদের প্রাপ্য সুবিধা পান।
- **ডিজিটাল ডেটা-ভিত্তিক ঋণ:** ইউপিআই (UPI) লেনদেনের ইতিহাস ব্যবহার করে কোনো সম্পদ বন্ধক ছাড়াই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।
- **অ্যালাগরিদম ভিত্তিক স্বচ্ছতা:** গিগ ওয়ার্কারদের অ্যাপ বা প্ল্যাটফর্মের খেয়ালখুশি মতো সিদ্ধান্ত থেকে বাঁচাতে হবে এবং তাদের জন্য একটি স্বচ্ছ **"ন্যূনতম মজুরি"** নিশ্চিত করতে হবে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা:** শহরের নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে আইনিভাবে **হকার জোন** তৈরি করতে হবে এবং কর্মীদের যাতায়াত খরচ কমাতে কর্মস্থলের কাছে সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আনুষ্ঠানিকীকরণ: অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রাহকদের পুরস্কার কাজের সাথে যুক্ত করতে হবে, যাতে তাদের কাজ নিরাপদ এবং সম্মানজনক "সবুজ কর্মসংস্থান" (Green Jobs) হিসেবে স্বীকৃত পায়।
- নারী-বান্ধব পরিকাঠামো: কর্মজীবী মায়েদের সহায়তার জন্য শিল্পাঞ্চল ও বাজারের কাছে নিরাপদ গণপরিবহন এবং কমিউনিটি ক্রেশ (শিশুদের রাখার জায়গা) তৈরি করে শহরের কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

উপসংহার

শহরের অনানুষ্ঠানিক খাত হলো ভারতের অর্থনীতির এক অপরিহার্য স্থিতিশীল শক্তি। টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে ডিজিটাল ঋণ, বহনযোগ্য সামাজিক সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে এই শ্রমশক্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। শুধুমাত্র কোনোমতে টিকে থাকার লড়াই নয়, বরং এই খাতকে উৎপাদনশীল করে তোলাই বর্তমান সময়ের দাবি।

Q. Discuss the structural challenges faced by India's informal urban workforce. Suggest policy measures for achieving "formalisation without exclusion." 15 Marks

3.1.6. গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে উন্নয়নের ধারা: জনকল্যাণ বনাম কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি

প্রেক্ষাপট

সমসাময়িক গণতান্ত্রিক আলোচনায় 'উন্নয়ন' শব্দটি প্রধান নির্বাচনী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ভারতে রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রায়ই স্বল্পমেয়াদী পুনর্বটনমূলক ব্যবস্থা (জনকল্যাণ) এবং দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন (উন্নয়ন)-কে এক করে দেখা হয়। যদিও দৃশ্যমান অবকাঠামো এবং সামাজিক সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই দুটির মধ্যে সীমারেখা ঝাপসা হয়ে যাওয়া রাজস্ব স্থায়িত্ব এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক বিবর্তনের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

জনকল্যাণ বনাম উন্নয়নের পার্থক্য

রাজনৈতিক ইশতেহারে এই দুটি শব্দ প্রায়ই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা:



বৈশিষ্ট্য	জনকল্যাণ (সামাজিক সুরক্ষা)	উন্নয়ন (কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি)
প্রধান লক্ষ্য	দারিদ্র্য বিমোচন এবং তাৎক্ষণিক অসহায়ত্ব দূর করা।	কাঠামোগত পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।
প্রকৃতি	ভোগ-ভিত্তিক এবং সম্পদ পুনর্বটনমূলক।	উৎপাদন-মুখী এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
সময়সীমা	স্বল্পমেয়াদী; তাৎক্ষণিক স্বস্তি প্রদান করে।	দীর্ঘমেয়াদী; কয়েক দশক ধরে বিকশিত হয়।
উদাহরণ	খাদ্য নিরাপত্তা, সরাসরি অর্থ সাহায্য, ঋণ মকুব।	মানব সম্পদ (শিক্ষা/স্বাস্থ্য), গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), অবকাঠামো।

'কল্যাণমূলক জনমোহিনী নীতি' (Welfare Populism)-এর ঝুঁকি সমূহ

১. রাজস্ব অস্থিরতা ও ঋণের ফাঁদ

- রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধি: জনমোহিনী সুযোগ-সুবিধা (যেমন: ঋণ মকুব, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ) প্রদান করতে গিয়ে প্রায়ই সরকারের আয় বা রাজস্বের চেয়ে ব্যয় বেড়ে যায়, যার ফলে রাজস্ব ঘাটতি আকাশচুম্বী হয়।
- ঋণ পরিশোধের খরচ: জনকল্যাণে অর্থের যোগান দিতে গিয়ে উচ্চহারে ঋণ নেওয়ার ফলে সুদের বোঝা বাড়ে, যা ভবিষ্যতে যেকোনো সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় 'আর্থিক ক্ষেত্র' (Fiscal Space) কমিয়ে দেয়।

২. উৎপাদনশীল বিনিয়োগে বাধা (Crowding Out)

- **রাজস্ব ব্যয় বনাম মূলধনী ব্যয়:** বাজেটের বড় অংশ যখন স্বল্পমেয়াদী ভর্তুকি বা ভোগ-ভিত্তিক কাজে (রাজস্ব ব্যয়) খরচ হয়, তখন বাঁধ, গবেষণা (R&D) বা বন্দরের মতো সম্পদ সৃষ্টিকারী অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (মূলধনী ব্যয়) কমে যায়।
- **বেসরকারি খাতে টান:** সরকারের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের ফলে বাজারে সুদের হার বেড়ে যেতে পারে, যা বেসরকারি ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ নেওয়া এবং বিনিয়োগ করা আরও ব্যয়বহুল করে তোলে।

৩. মানব সম্পদ ও জনকল্যাণমূলক সম্পদের অবক্ষয়

- **প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষয়:** দীর্ঘমেয়াদী জনকল্যাণমূলক সম্পদ যেমন—উন্নত স্কুল, জনস্বাস্থ্য এবং আইনের শাসনের পরিবর্তে অনেক সময় সরাসরি নগদ অর্থ হস্তান্তরের দিকে সম্পদ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, কারণ এর 'নির্বাচনী জনপ্রিয়তা' বেশি।
- **নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি:** সরকারি সাহায্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা মানুষের দক্ষতা অর্জন, উদ্যোক্তা হওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে।

৪. অর্থনৈতিক বিকৃতি ও মুদ্রাস্ফীতি

- **চাহিদা-জনিত মুদ্রাস্ফীতি:** বড় আকারে নগদ অর্থ হস্তান্তরের ফলে মানুষের হাতে তাৎক্ষণিক খরচ করার মতো টাকা বেড়ে যায়, কিন্তু সেই তুলনায় পণ্যের যোগান না বাড়লে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যেতে পারে।
- **সম্পদের অপব্যবহার:** বিনামূল্যে বিদ্যুৎ বা সারের মতো ভর্তুকি অনেক সময় পরিবেশের ক্ষতি (যেমন: ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার) এবং অদক্ষ শিল্প ব্যবহারের দিকে ঠেলে দেয়।

৫. গণতান্ত্রিক ভিত্তির দুর্বলতা

- **প্রতিযোগিতামূলক জনমোহিনী নীতি:** রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শাসনব্যবস্থার উন্নতি বা নীতিগত উদ্ভাবনের চেয়ে কে কত বেশি 'বিনামূল্যে উপহার' (Freebies) দিতে পারে, তা নিয়ে এক ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়।
- **'দৃশ্যমানতা'র ওপর গুরুত্ব:** শিশু মৃত্যুর হার কমানো বা প্রাথমিক শিক্ষার মতো 'অদৃশ্য' কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির চেয়ে স্বল্পমেয়াদী এবং দৃশ্যমান প্রকল্পগুলোর (যেমন: রাস্তা বা স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন) ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।

সক্ষমতা পদ্ধতি বা ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ (অমর্ত্য সেন)

১. মূল দর্শন

- **আয়ের উর্ধ্ব:** এটি যুক্তি দেয় যে দারিদ্র্য কেবল অর্থের অভাব নয়, বরং মৌলিক **সক্ষমতার অভাব** (যেমন: সুস্থ থাকা, শিক্ষিত হওয়া এবং পুষ্টি পাওয়া)।
- **এজেন্সি বা সক্রিয়তা:** এটি ব্যক্তিদের কেবল সরকারি সুবিধার 'নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা' হিসেবে নয়, বরং পরিবর্তনের **সক্রিয় প্রতিনিধি** হিসেবে দেখে।

২. মূল ধারণা: "কার্যকারিতা" (Functionings) বনাম "সক্ষমতা" (Capabilities)

ধারণা	সংজ্ঞা	উদাহরণ
কার্যকারিতা (Functionings)	একজন ব্যক্তি বাস্তবে যা অর্জন করে বা যা হয়ে ওঠে।	সুস্থ থাকা, চাকরি করা, ভ্রমণ করা।
সক্ষমতা (Capabilities)	সেই কার্যকারিতাগুলো অর্জনের জন্য একজন ব্যক্তির প্রকৃত সুযোগ বা স্বাধীনতা।	সুস্থ থাকার (কার্যকারিতা) জন্য চিকিৎসাকেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ থাকা (সক্ষমতা)।

৩. "মানবিক স্বাধীনতা"র ওপর গুরুত্ব

অমর্ত্য সেন পাঁচ ধরনের 'সহায়ক স্বাধীনতা' চিহ্নিত করেছেন যা একে অপরকে সমর্থন করে:

১. **রাজনৈতিক স্বাধীনতা:** বাকস্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন।

2. **অর্থনৈতিক সুবিধা:** ঋণ পাওয়ার সুযোগ এবং উন্মুক্ত বাজার।
3. **সামাজিক সুযোগ:** স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার সুযোগ।
4. **স্বচ্ছতার গ্যারান্টি:** দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সরকারের ওপর আস্থা।
5. **প্রতিরক্ষামূলক নিরাপত্তা:** অসহায়দের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা (যেমন: বেকারত্ব বীমা)।

জনকল্যাণমূলক সম্পদের (Public Goods) গুরুত্ব

১. **উচ্চ ইতিবাচক বাহ্যিক প্রভাব (Positive Externalities):** "বিনামূল্যে উপহারের" বিপরীতে, জনকল্যাণমূলক সম্পদ পুরো সমাজের উপকার করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সুশিক্ষিত জনশক্তি (মানব সম্পদ) বিনিয়োগ আকর্ষণ করে, উদ্ভাবন বাড়ায় এবং দেশের ক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
২. **অ-বর্জনীয় এবং অ-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক:** আয়ের স্তর নির্বিশেষে এই সম্পদ সবার জন্য উন্মুক্ত। এটি **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি** নিশ্চিত করে, কারণ দরিদ্রতম নাগরিকরাও ধনীদের মতো একই মানের অবকাঠামো বা আইনি সুরক্ষা পায়, যা "সুযোগের ব্যবধান" কমায়।
৩. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ, উচ্চ-গতির রেল এবং ডিজিটাল সংযোগের মতো জনকল্যাণমূলক সম্পদগুলো ব্যবসা করার খরচ কমিয়ে দেয়। এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং বিশ্বব্যাপী **প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা** বাড়ায়।
৪. **টেকসই এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাব:** জনমোহিনী নীতিগুলো তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিলেও জনকল্যাণমূলক সম্পদগুলো দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ। আজ একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনিয়োগ করলে তা আগামী কয়েক দশক ধরে রোগের বোঝা কমায় এবং **শ্রমের উৎপাদনশীলতা** বাড়ায়।
৫. **সক্ষমতা তৈরির ভিত্তি:** অমর্ত্য সেনের মডেল অনুযায়ী, জনকল্যাণমূলক সম্পদ হলো সেই "সহায়ক স্বাধীনতা" যা একজন মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে প্রকৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাফল্যে রূপান্তর করতে প্রয়োজন।

সামনের পথ

১. **ভর্তুকি থেকে সক্ষমতায় রূপান্তর:** "ভোগ-ভিত্তিক উপহার" থেকে "বিনামূল্যে বিনিয়োগ-ভিত্তিক কল্যাণ"-এর দিকে নজর দিন। এমন পরিকল্পনাগুলোকে অগ্রাধিকার দিন যা কেবল সামাজিক সুরক্ষা নয়, বরং উন্নতির সিঁড়ি (Springboard) হিসেবে কাজ করে (যেমন: দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পুষ্টি)।
২. **খরচের চেয়ে ফলাফলের ওপর গুরুত্ব:** 'আউটকাম বেসড বাজেটিং' বা ফলাফল-ভিত্তিক বাজেটিং ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সরকারি ব্যয় কেবল কাগজে-কলমে না থেকে বাস্তবে কতটা প্রভাব ফেলছে তা নিশ্চিত করতে **সোশ্যাল অডিট** বা সামাজিক নিরীক্ষা এবং কঠোর তদারকি ব্যবহার করুন।
৩. **বিকেন্দ্রীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা:** জনকল্যাণমূলক সম্পদের প্রান্তিক পর্যায়ে (Last Mile) সরবরাহ নিশ্চিত করতে **পঞ্চায়েত** এবং **পৌরসভাগুলোকে** শক্তিশালী করুন। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে প্রশাসনিক জটিলতা কমে এবং সঠিক মানুষের কাছে সুবিধা পৌঁছায়।
৪. **আর্থিক শৃঙ্খলা:** জনকল্যাণমূলক ব্যয় যেন উৎপাদনশীল পুঁজি বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত না করে, সেজন্য **FRBM লক্ষ্যমাত্রা** মেনে চলুন। নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলোর জন্য 'আর্থিক প্রভাব বিবৃতি' (Fiscal Impact Statement) বাধ্যতামূলক করলে রাজনৈতিক জনমোহিনী নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
৫. **উচ্চ-প্রভাবশালী অবকাঠামো:** গবেষণা (R&D), ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সবুজ শক্তির মতো উচ্চ ইতিবাচক প্রভাব সম্পন্ন জনকল্যাণমূলক সম্পদগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে নাগরিকরা তাদের "যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতা" প্রয়োগ করে দেশের প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে।

উপসংহার

টেকসই উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী জনমোহিনী নীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে একটি **সক্ষমতা-ভিত্তিক কাঠামো** প্রয়োজন। আর্থিক শৃঙ্খলার সাথে জনকল্যাণমূলক সম্পদে বিনিয়োগের ভারসাম্য রক্ষা করে ভারত জনকল্যাণকে কেবল একটি সুরক্ষা কবচ থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির সোপানে রূপান্তর করতে পারে।

Q. In democratic politics, the conflation of welfare and development often leads to policy distortions. Critically examine the differences between welfare and development and discuss how a balanced approach can ensure sustainable and inclusive growth in India. 15 Marks

3.1.7. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের খরচ: ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা

ভূমিকা: মূল্য স্থিতিশীলতার অসম মূল্য

মহামারী-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্ন, বিশাল আর্থিক প্রণোদনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সুদের হার বাড়িয়ে কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণ করে।



২০২৫ সালের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন দেশে কমে আসে। তবে, এই মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনার অর্থনৈতিক খরচ সব দেশে সমান ছিল না। এটি মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যকার ভারসাম্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে।

স্যাক্রিফাইস রেশিও (Sacrifice Ratio) বা 'ত্যাগের অনুপাত' বোঝা

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের খরচ পরিমাপ করার প্রধান উপায় হলো **স্যাক্রিফাইস রেশিও**। এটি মূলত মুদ্রাস্ফীতি ১ শতাংশ কমাতে গিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনের (জিডিপি) কতটা ক্ষতি হলো বা বেকারত্ব কতটা বাড়ল, তা পরিমাপ করে।

উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রাস্ফীতি ১% কমাতে গিয়ে যদি জিডিপির ক্ষতি ২% হয়, তবে স্যাক্রিফাইস রেশিও হবে ২। এটি নীতি-নির্ধারকদের বুঝতে সাহায্য করে যে মুদ্রাস্ফীতি কমানো একটি অর্থনীতির জন্য কতটা বেদনাদায়ক।

- **নিম্ন স্যাক্রিফাইস রেশিও:** এর অর্থ হলো অর্থনীতিতে বড় কোনো ক্ষতি ছাড়াই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
- **উচ্চ স্যাক্রিফাইস রেশিও:** এর অর্থ হলো মুদ্রাস্ফীতি কমাতে গিয়ে জিডিপির বড় ক্ষতি হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিয়েছে।

আধুনিক মুদ্রানীতির মূল সংকট হলো—কোনো কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। দাম স্থিতিশীল করার প্রতিটি প্রচেষ্টায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। নীতি-নির্ধারকদের লক্ষ্য কেবল মুদ্রাস্ফীতি কমানো নয়, বরং অর্থনীতির জন্য **ন্যূনতম খরচ** তা অর্জন করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা: একটি বিরল 'সফট ল্যান্ডিং'

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ২০২২ সালের শুরু থেকে সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি থেকে বাড়িয়ে ২০২৩ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ৫.২৫-৫.৫০% করে। ১১ বার সুদের হার বাড়ানো সত্ত্বেও মার্কিন অর্থনীতি বড় কোনো মন্দা ছাড়াই টিকে যায়, যা অনেকের কাছেই প্রত্যাশিত ছিল না।

সাফল্যের কারণসমূহ:

- **সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট দ্রুত সমাধান:** শিপিং, লজিস্টিকস এবং উৎপাদনের সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে। বন্দরগুলো সচল হওয়ায় পণ্য পরিবহনের খরচ কমে যায় এবং বাজারে পণ্যের জোগান বাড়ে। এতে চাহিদা কমিয়ে আনার আগেই সরবরাহ বাড়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি কমাতে শুরু করে।
- **বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম হ্রাস:** অপরিশোধিত তেল এবং গ্যাসের দাম কমায় পরিবহন ও উৎপাদন খরচ কমে যায়। যেহেতু জ্বালানি প্রায় সব পণ্যের সাথেই যুক্ত, তাই এটি মুদ্রাস্ফীতি কমাতে বড় ভূমিকা রাখে।

- **শক্তিশালী শ্রমবাজার এবং ভোক্তা চাহিদা:** বেকারত্বের হার কম থাকা এবং আয়ের ধারাবাহিকতা বজায় থাকায় মানুষের কেনাকাটার ক্ষমতা কমেনি। ফলে মুদ্রাস্ফীতি কমলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল এবং মন্দা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ফলাফল: উৎপাদনের বড় কোনো ক্ষতি ছাড়াই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর অর্থ হলো মার্কিন অর্থনীতি মন্দা বা ব্যাপক বেকারত্বের সম্মুখীন হয়নি। একে "সফট ল্যান্ডিং" বলা হয়, যেখানে প্রবৃদ্ধির ক্ষতি না করেই মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা হয়েছে। তবে মুদ্রাস্ফীতি কমলেও জিনিসের দাম আগের জায়গায় ফিরে যায়নি, বরং একটি উচ্চ স্তরে স্থির হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষকে খাদ্য ও জ্বালানির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য বর্ধিত খরচ বহন করতে হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতা: মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের চড়া মূল্য

ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকেই সক্রিয় হয়ে সুদের হার ০.১% থেকে বাড়িয়ে ২০২৩ সালের অগাস্টে ৫.২৫% করে। তবে এত কঠোর ব্যবস্থার পরেও মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ রয়ে যায়।

কাঠামোগত বাধাগুলো ছিল প্রধান কারণ:

- যুক্তরাজ্য জ্বালানির জন্য আমদানির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হওয়ায় বিশ্ববাজারে গ্যাস ও তেলের দাম বাড়লে তারা বড় ধাক্কা খায়।
- ইউরোপীয় গ্যাস সংকটের কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ ও শিল্পের উৎপাদন ব্যয় আকাশছোঁয়া হয়ে যায়।
- একই সময়ে শ্রমিকের অভাবে মজুরি বেড়ে যায়, যা সেবামূলক খাতে মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উসকে দেয়।

ফলাফল:

- ২০২৩ সালের শেষের দিকে অর্থনীতি মন্দার কবলে পড়ে।
- ব্যবসায়িক মন্দার কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।
- এত কিছু সত্ত্বেও ২০২৬ সাল পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যের উপরে ছিল।

অর্থাৎ, যুক্তরাজ্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জিডিপি বড় ক্ষতি হয়েছে, তাই এখানে স্যাক্রিফাইস রেশিও অনেক বেশি ছিল।

ভারতের অবস্থান: একটি পরিমিত ভারসাম্য

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে রেপো রেট ৪% থেকে বাড়িয়ে ৬.৫% করে। এরপর তারা পরিস্থিতি বুঝে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ফলাফল:

- **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** প্রবৃদ্ধি ৮% থেকে কমে প্রায় ৬.৫% হয়েছে, যা একটি ধীরগতি নির্দেশ করে কিন্তু সংকোচন বা মন্দা নয়।
- **মুদ্রাস্ফীতি:** ২০২৫ সালের মাঝামাঝি নাগাদ মুদ্রাস্ফীতি কমে প্রায় ২% এর কাছাকাছি চলে আসে।
- ভারত মন্দা এড়িয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

কেন স্যাক্রিফাইস রেশিও কম মনে হচ্ছে:

- **ধীরগতির আর্থিক সঞ্চালন (Monetary Transmission):** সুদের হারের পরিবর্তন ভারতের সাধারণ মানুষের ঋণ বা বিনিয়োগের ওপর প্রভাব ফেলতে উন্নত দেশের তুলনায় বেশি সময় নেয়।
- **খাদ্যপণ্যের উচ্চ প্রভাব (CPI ~৪৬%):** ভারতের মুদ্রাস্ফীতির বড় অংশই নির্ভর করে বর্ষা, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (MSP) ওপর, যা কেবল সুদের হার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।
- **সরকারি হস্তক্ষেপ:** বাফার স্টক বজায় রাখা, ভর্তুকি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

স্যাক্রিফাইস রেশিও বা 'ত্যাগের অনুপাত'-এর সীমাবদ্ধতা

ম্যাক্রো-ইকোনমিক্স বা সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্যাক্রিফাইস রেশিও একটি দরকারী হাতিয়ার হলেও এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

১. **ঘটনার পরে অনুমান করা হয় (ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না):** স্যাক্রিফাইস রেশিও সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি কমে যাওয়ার পরে ঐতিহাসিক তথ্য (জিডিপি র ক্ষতি এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ডেটা) ব্যবহার করে গণনা করা হয়। নীতি-নির্ধারকরা আগে থেকে এর সঠিক মান জানতে পারেন না, ফলে রিয়েল-টাইম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি নিখুঁত নির্দেশিকা হতে পারে না।
২. **মুদ্রাস্ফীতি ও উৎপাদনের স্থিতিশীল সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল:** এটি ধরে নেয় যে মুদ্রাস্ফীতি এবং উৎপাদনের মধ্যে একটি অনুমানযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে (যা প্রায়ই ফিলিপস কার্ভ থেকে নেওয়া হয়)। তবে কাঠামোগত পরিবর্তন, বিশ্বায়ন বা সরবরাহের সংকটের কারণে এই সম্পর্ক বদলে যেতে পারে, যার ফলে এই অনুপাতটি অস্থির হয়ে পড়ে।
৩. **বণ্টনমূলক প্রভাবকে উপেক্ষা করে:** এই অনুপাতটি মোট উৎপাদনের ক্ষতি পরিমাপ করে ঠিকই, কিন্তু এই ক্ষতির বোঝা আসলে কার ওপর পড়ছে তা স্পষ্ট করে না। বাস্তবে এই বোঝা সমানভাবে বন্টিত হয় না—শ্রমিকরা বেকারত্বের মুখে পড়তে পারেন, ছোট প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং নির্দিষ্ট কিছু খাত (যেমন- নির্মাণ শিল্প বা MSME) অন্যদের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মুদ্রানীতির চ্যালেঞ্জ এবং উদীয়মান চাপসমূহ

১. **সরবরাহ সংকটের বিরুদ্ধে সীমিত কার্যকারিতা:** সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির একটি বড় অংশ সরবরাহ-জনিত কারণে ঘটেছে (যেমন- জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা)। সুদের হার বৃদ্ধি মূলত চাহিদাকে কমিয়ে দেয়, কিন্তু এটি সরাসরি সরবরাহের সমস্যা সমাধান করতে পারে না। ফলে এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি কম কার্যকর হয়।
২. **প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্যকার অসম ভারসাম্য:** সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাব বিভিন্ন দেশে ভিন্নভাবে দেখা গেছে:
 - **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** একটি 'সফট ল্যান্ডিং' নিশ্চিত করতে পেরেছে, অর্থাৎ মন্দা ছাড়াই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।
 - **যুক্তরাজ্য:** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে মন্দা এবং বেকারত্বের মতো চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।
 - **ভারত:** একটি ভারসাম্যপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছে—প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা কমলেও মুদ্রাস্ফীতি কমেছে এবং বড় কোনো ক্ষতি হয়নি।
৩. **ভারতের মুদ্রার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ:** ভারত বর্তমানে বিনিময় হারের অবমূল্যায়নের সম্মুখীন হচ্ছে, অর্থাৎ টাকার মান কমে যাচ্ছে। এর ফলে আমদানির খরচ (বিশেষ করে অপরিশোধিত তেল) বেড়ে যাচ্ছে, যা 'আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি' এবং বহিঃবাণিজ্য খাতে ঝুঁকি তৈরি করছে।
৪. **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (RBI) নীতিগত উভয়সংকট:** আরবিআই বর্তমানে একটি জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আছে:
 - সুদের হার কমালে প্রবৃদ্ধি বাড়তে পারে, কিন্তু টাকার মান আরও কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
 - সুদের হার বাড়ালে মুদ্রার মান স্থিতিশীল হতে পারে, কিন্তু প্রবৃদ্ধির গতি কমে যেতে পারে।
 - কোনো পরিবর্তন না করলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিলম্বিত হতে পারে।
৫. **মুদ্রানীতির কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা:** ভারতে মুদ্রাস্ফীতির প্রায় অর্ধেকই নির্ভর করে খাদ্যপণ্যের দামের ওপর। এটি মূলত বর্ষা, সরবরাহের অবস্থা এবং সরকারি নীতির ওপর নির্ভরশীল, যা কেবল সুদের হার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি কাঠামোর দিকে

১. **সরবরাহ-ভিত্তিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** ভারতের মতো দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রায়ই অতিরিক্ত চাহিদার বদলে সরবরাহের সংকটের কারণে হয়। তাই কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা (গুদামজাতকরণ, লজিস্টিকস, কোল্ড চেইন) উন্নত করলে খাদ্যের দাম স্থিতিশীল থাকবে। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ালে আমদানিকৃত তেলের ওপর নির্ভরতা কমবে।
২. **মুদ্রানীতির সঞ্চালন (Monetary Transmission) বৃদ্ধি:** রিজার্ভ ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন যাতে দ্রুত বাজারে কার্যকর হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য শক্তিশালী আর্থিক বাজার এবং দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে সুদের হারের সুবিধা সাধারণ ব্যবসা এবং গ্রাহকদের কাছে সময়মতো পৌঁছায়।

৩. **সমন্বিত নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি:** কেবল মুদ্রানীতি দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এর সাথে **রাজস্ব নীতিকেও (Fiscal Policy)** যুক্ত করতে হবে (যেমন- নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর ট্যাক্স কমানো)। ঢালাও সুযোগ-সুবিধার বদলে লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি প্রদান করা উচিত যাতে দরিদ্র মানুষ সুরক্ষিত থাকে।
৪. **বৈদেশিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** বিশ্ববাজারের ধাক্কা সামলাতে দেশগুলোকে পর্যাপ্ত **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ** গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।
৫. **নমনীয় মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা (Flexible Inflation Targeting):** মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতের মতো দেশে যেখানে খাদ্যপণ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি, সেখানে কঠোর লক্ষ্যমাত্রা প্রবৃদ্ধির ক্ষতি করতে পারে। তাই প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি নমনীয় পদ্ধতি প্রয়োজন।

উপসংহার: ভিন্ন পথ, ভিন্ন খরচ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ভারতের অভিজ্ঞতা দেখায় যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ একটি সাধারণ লক্ষ্য হলেও এটি অর্জনের খরচ দেশভেদে ভিন্ন হয়। কাঠামোগত কারণ এবং সঠিক নীতি নির্ধারণের ওপরই এর সাফল্য নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নমনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে, কারণ মূল্য স্থিতিশীলতার পথ সবার জন্য এক নয় এবং এটি সবসময় বিনাশর্তে আসে না।

Q. The cost of disinflation varies significantly across economies depending on structural and policy factors. Discuss this statement using the experiences of India, the United States, and the United Kingdom. 15 Marks

3.2. পরিবেশ

3.2.1. ভারতের জলবায়ু অঙ্গীকার

ভূমিকা

"প্রকৃতি রক্ষা রক্ষিতঃ" (প্রকৃতিকে রক্ষা করলে প্রকৃতিও আমাদের রক্ষা করে)

ভারতের ২০৩৫ সালের জলবায়ু অঙ্গীকারগুলি কেবল আধুনিক কোনো নীতি নয়, বরং এটি আমাদের প্রাচীন আদর্শের একটি সম্প্রসারণ, যা পরিবেশগত রক্ষণাবেক্ষণকে একটি মৌলিক কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে।



ভারতের জলবায়ু অঙ্গীকারের বিবর্তন

ভারতের জলবায়ু যাত্রা "প্রত্যাহার চেয়েও বেশি অর্জন" দ্বারা চিহ্নিত। ২০১৫ সালের (COP21) অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক দশক আগেই পূরণ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য	২০১৫ NDC (২০৩০ সালের জন্য)	২০২২ হালনাগাদ NDC (২০৩০ সালের জন্য)	২০২৬ সংশোধিত NDC (২০৩৫ সালের জন্য)
নির্গমন তীব্রতা (Emissions Intensity)	৩৩-৩৫% হ্রাস	৪৫% হ্রাস	৪৭% হ্রাস
অ-জীবাশ্ম শক্তি (Non-Fossil Power)	৪০% ক্ষমতা	৫০% ক্ষমতা	৬০% ক্ষমতা
কার্বন সিঙ্ক (Carbon Sink)	২.৫-৩ বিলিয়ন টন CO ₂	২০২২-এ অপরিবর্তিত	৩.৫-৪.০ বিলিয়ন টন \$CO_2\$

২০৩৫ সালের Nationally Determined Contributions (NDCs)-এর মূল স্তম্ভ

২০২৬ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ২০৩১-২০৩৫ সময়ের জন্য ভারতের হালনাগাদ NDC-এর মূল স্তম্ভগুলি নিচে পাঁচটি মূল পয়েন্টে সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

১. নির্গমন তীব্রতা হ্রাস (দক্ষতার লক্ষ্যমাত্রা):

ভারত ২০৩৫ সালের মধ্যে তার জিডিপি-র নির্গমন তীব্রতা ২০০৫ সালের স্তরের তুলনায় ৪৭% হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটি ২০৩০ সালের ৪৫% লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় একটি বৃদ্ধি। এটি নির্গমন কমিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং জ্বালানি দক্ষতা ও স্বল্প-কার্বন শিল্পায়নের ওপর জোর দেয়।

২. অ-জীবাশ্ম জ্বালানি শক্তি সক্ষমতা (জ্বালানি রূপান্তর):

মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক শক্তির লক্ষ্যমাত্রা ২০৩৫ সালের মধ্যে বাড়িয়ে ৬০% করা হয়েছে। ২০২৬ সালের শুরুতেই ভারত ইতিমধ্যে ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা (৫০%) অতিক্রম করে প্রায় ৫২.৬% অর্জন করেছে। এই স্তম্ভটি সৌর, বায়ু, পারমাণবিক এবং জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক প্রসারের ওপর গুরুত্ব দেয়।

৩. উন্নত কার্বন সিঙ্ক (শোষণ লক্ষ্যমাত্রা):

ভারত ২০৩৫ সালের মধ্যে বন এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৩.৫ থেকে ৪.০ বিলিয়ন টন \$CO_2\$ সমপরিমাণ কার্বন শোষণ বা 'কার্বন সিঙ্ক' তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এটি পূর্বের ২.৫-৩.০ বিলিয়ন টনের লক্ষ্যমাত্রা থেকে একটি বড় পদক্ষেপ, যা মূলত বনায়ন, গ্রিন ক্রেডিট প্রোগ্রাম এবং বড় আকারের ভূমি পুনরুদ্ধারের ওপর নির্ভর করে।

৪. অভিযোজন এবং স্থিতিস্থাপকতা (সুরক্ষা ব্যবস্থা):

২০৩৫ সালের রূপরেখায় জলবায়ু অভিযোজনের (Adaptation) ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই স্তম্ভটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ক্ষেত্রগুলোকে রক্ষার ওপর জোর দেয়, যেমন:

- ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার (MISHTI প্রকল্প)।
- জলবায়ু-সহনশীল কৃষি এবং জল নিরাপত্তা (জল জীবন মিশন)।
- মেঘভাঙা বৃষ্টি ও সাইক্লোনের মতো চরম আবহাওয়া মোকাবিলায় দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ।

৫. LiFE – পরিবেশের জন্য জীবনধারা (আচরণগত পরিবর্তন):

NDC-তে আনুষ্ঠানিকভাবে LiFE আন্দোলনকে একটি মূল স্তম্ভ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য হলো জলবায়ু পদক্ষেপকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করা। এটি "অবিবেচনাপ্রসূত ভোগের" পরিবর্তে "সচেতন ব্যবহার" প্রচার করে এবং বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) ও বিশ্বব্যাপী আচরণগত পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়।

ভারতের ২০৩৫ NDC-তে নতুন কাঠামো

১. ইন্ডিয়ান কার্বন মার্কেট (ICM): এটি কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিম (CCTS)-এর অধীনে পরিচালিত হয়, যা স্বেচ্ছাসেবী থেকে বাধ্যতামূলকের (compliance-based) দিকে মোড় নিয়েছে। এটি ইস্পাত এবং সিমেন্টের মতো নয়টি উচ্চ-নির্গমনকারী খাতের ৪৯০টি সংস্থাকে কার্বন নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে বা ক্রেডিট কিনতে বাধ্য করে।
২. গ্রিন ক্রেডিট প্রোগ্রাম (GCP): এটি কার্বনের বাইরে পরিবেশবান্ধব কাজকে উৎসাহিত করার জন্য প্রথম বাজার-ভিত্তিক ব্যবস্থা। এটি বনায়ন এবং জল সংরক্ষণের জন্য একটি 'ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' তৈরি করে এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য বাণিজ্যযোগ্য ক্রেডিট প্রদান করে।
৩. পুরো-অর্থনীতির সমন্বয় (Whole-of-Economy Integration): জলবায়ু লক্ষ্যগুলি এখন শিল্পনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। PLI স্কিম-এর মাধ্যমে গ্রিন হাইড্রোজেন, উন্নত কেমিস্ট্রি সেল (ACC) এবং সোলার মডিউল উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা ২০৪৭ সালের "বিকশিত ভারত" লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. **দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো কাঠামো:** CDRI-এর নেতৃত্বে ভারত তার অবকাঠামোকে জলবায়ু-সুরক্ষিত (Climate-proof) করার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করেছে, বিশেষ করে হিমালয় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে, যাতে সাইক্লোন বা হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণের (GLOF) মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়।
৫. **ট্রিপল-লিঙ্ক অভিযোজন মডেল:** এটি কৃষি, জল এবং স্বাস্থ্যকে সংযুক্ত করার একটি নতুন অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা। এটি 'পার ড্রপ মোর ড্রপ' (প্রতি ফোঁটায় অধিক ফসল) এর মতো মিশনের সাথে স্বাস্থ্য পরিকল্পনাগুলোকে যুক্ত করে একটি শক্তিশালী সুরক্ষা বলয় তৈরি করে।

ভারতের ২০৩৫ NDC-এর তাৎপর্য

১. **বিশ্ব নেতৃত্ব এবং ধারাবাহিকতা:** ভারত প্রথম বড় অর্থনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম যারা তাদের NDC 3.0 জমা দিয়েছে। এটি প্যারিস চুক্তির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকে এমন এক সময়ে পুনর্নিশ্চিত করে যখন অনেক উন্নত দেশ তাদের জলবায়ু নীতি থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে।
২. **নির্ভরযোগ্য নেট-জিরো পথ:** ২০৩৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা (৪৭% নির্গমন তীব্রতা হ্রাস) ভারতের দীর্ঘমেয়াদী ২০৭০ সালের নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রাকে বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী সেতু হিসেবে কাজ করে।
৩. **কৌশলগত জ্বালানি স্বাধীনতা:** ৬০% অ-জীবাশ্ম ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে ভারত আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করেছে, যা জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং ভূ-রাজনৈতিক সংকট থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করে।
৪. **কার্বন থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করা:** নির্গমন তীব্রতা ৪৭% হ্রাস করা প্রমাণ করে যে ভারত তার পরিবেশগত দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধিও (২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের লক্ষ্য) বজায় রাখতে সক্ষম।
৫. **জলবায়ু ন্যায়বিচারের ওপর গুরুত্ব:** CBDR-RC (সাধারণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব) নীতির ওপর ভিত্তি করে ভারতের এই লক্ষ্যমাত্রা উন্নত দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে তারা প্রয়োজনীয় জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance) প্রদান করে।

ভারতের ২০৩৫ সালের Nationally Determined Contributions (NDCs)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অর্থায়নের ঘাটতি:** ধারণা করা হচ্ছে যে, শুধুমাত্র ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ভারতের ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রদানে ব্যর্থতা প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এই লক্ষ্যমাত্রা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
২. **সঞ্চয় ও গ্রিড স্থিতিশীলতা:** ৬০% অ-জীবাশ্ম ক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS) এবং পাম্পড হাইড্রো প্রকল্পে বিশাল বিনিয়োগ প্রয়োজন। সাশ্রয়ী সঞ্চয় ব্যবস্থা না থাকলে, সৌর ও বায়ু শক্তির অনিয়মিত সরবরাহের কারণে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড বুকির মুখে থাকবে।
৩. **কার্বন কমানো কঠিন এমন খাতসমূহ (Hard-to-Abate Sectors):** বিদ্যুৎ খাতে কার্বন নিঃসরণ কমলেও ইস্পাত, সিমেন্ট এবং ভারী পরিবহন খাতের প্রযুক্তি সবুজ বা পরিবেশবান্ধব করা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়বহুল। এই খাতগুলোতে সামগ্রিক নিঃসরণ এখনও বেড়েই চলেছে।
৪. **কয়লার ওপর নির্ভরতা:** সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও, ভারতের প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৭০% এখনও কয়লা থেকে আসে। সময়ের আগেই কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিলে বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং ব্যাংকিং ও বিদ্যুৎ খাতে "স্ট্র্যাণ্ডেড অ্যাসেট" বা অকেজো সম্পদের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
৫. **ভূমি ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা:** ৩.৫-৪.০ বিলিয়ন টন কার্বন শোষণ কেন্দ্র বা কার্বন সিঙ্ক তৈরির জন্য বিশাল পরিমাণ জমির প্রয়োজন, যা কৃষি জমির প্রয়োজন এবং উপজাতিদের অধিকারের সাথে সংঘর্ষ তৈরি করতে পারে। এছাড়া, এই রূপান্তরটি লিথিয়াম ও কোবাল্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলোর ওপর নির্ভরশীল, যা বর্তমানে বৈশ্বিক একচেটিয়া বাজারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ভারতের ২০৩৫ NDC-এর জন্য ভবিষ্যৎ পথ

১. **সক্ষমতা থেকে উৎপাদনে রূপান্তর:** কেবল নবায়নযোগ্য শক্তি স্থাপনের ওপর জোর না দিয়ে প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। এর জন্য সৌর ও বায়ু শক্তির অনিয়মিত সরবরাহ মোকাবিলায় ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (BESS) এবং পাম্পড হাইড্রোতে বিশাল বিনিয়োগ প্রয়োজন।
২. **কঠিন খাতগুলোর কার্বন হ্রাস:** ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনকে ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বাধ্যতামূলক ইন্ডিয়ান কার্বন মার্কেট-এর মাধ্যমে ইস্পাত, সিমেন্ট ও রাসায়নিক শিল্পে কম-কার্বন প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।
৩. **জলবায়ু অর্থায়ন শক্তিশালী করা:** উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে একটি নতুন সম্মিলিত লক্ষ্যমাত্রা (NCQG) আদায়ের জন্য গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতৃত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি, বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে দেশের অভ্যন্তরে "গ্রিন বন্ড" এবং গ্রিন ক্রেডিট প্রোগ্রাম-কে কাজে লাগাতে হবে।
৪. **প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান ও সিল্ক-এর মান:** বনায়নের পরিমাণের চেয়ে এর মানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে অবক্ষয়িত জমি পুনরুদ্ধার এবং 'এক পেড মা কে নাম' ও MISHTI প্রকল্পের অধীনে বৃক্ষরোপণ যাতে একজাতীয় বনের বদলে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায় তা নিশ্চিত করা।
৫. **উপ-জাতীয় জলবায়ু পদক্ষেপ:** জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর রাজ্যভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (SAPCC) বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলোকে ক্ষমতায়ন করে লক্ষ্যমাত্রাগুলো বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। তাপপ্রবাহ এবং বন্যা থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে নগর পরিকল্পনায় জলবায়ু সহনশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।

উপসংহার

ভারতের ২০৩৫ সালের NDC লক্ষ্যমাত্রা ২০৭০ সালের নেট-জিরো অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র, যা ভারতকে একটি পরিবেশবান্ধব বা সবুজ পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। শিল্পোন্নয়নের সাথে আমূল স্থায়িত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে ভারত গ্লোবাল সাউথ-এর জন্য একটি স্থিতিস্থাপক ও স্বল্প-কার্বন নির্গমনের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে।

Q. Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution (NDC) intended by India been updated in 2022? 15 Marks

3.2.2. তাপপ্রবাহ এবং আরবান হিট আইল্যান্ড

ভূমিকা

তাপপ্রবাহ (Heat Wave) হলো বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘসময় ধরে চলা চরম গরম আবহাওয়া। অন্যদিকে, **আরবান হিট আইল্যান্ড (Urban Heat Island)** তখন তৈরি হয় যখন শহরগুলো সেই তাপকে আটকে ফেলে, যার ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহরাঞ্চলে তাপমাত্রা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়।

তাপপ্রবাহ

গ্রীষ্মকালে যখন তাপমাত্রা স্বাভাবিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তখন সেই সময়কালকে **তাপপ্রবাহ** বলা হয়।

আইএমডি (IMD) অনুযায়ী তাপপ্রবাহের মানদণ্ড

ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) তাপপ্রবাহকে দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ভাগ করে: **স্বাভাবিক তাপমাত্রার বিচ্যুতি** এবং **প্রকৃত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা**।



১. স্বাভাবিক তাপমাত্রার বিচ্যুতির ওপর ভিত্তি করে:

- তাপপ্রবাহ: যখন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 8.5° সেলসিয়াস থেকে 6.8° সেলসিয়াস বেশি হয়।
- তীব্র তাপপ্রবাহ: যখন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 6.8° সেলসিয়াসের বেশি হয়।

২. প্রকৃত সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে:

- তাপপ্রবাহ: যখন প্রকৃত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 85° সেলসিয়াস বা তার বেশি হয়।
- তীব্র তাপপ্রবাহ: যখন প্রকৃত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 89° সেলসিয়াস বা তার বেশি হয়।

৩. ঘোষণার প্রাথমিক সীমা একটি তাপপ্রবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার জন্য তাপমাত্রা অন্তত এই পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে:

- সমতল অঞ্চল: 80° সেলসিয়াস
- পার্বত্য অঞ্চল: 70° সেলসিয়াস
- উপকূলীয় অঞ্চল: 79° সেলসিয়াস

দ্রষ্টব্য: যদি কোনো আবহাওয়া উপবিভাগের অন্তত দুটি স্টেশনে টানা দুই দিন এই তাপমাত্রা বজায় থাকে, তবেই তাপপ্রবাহ ঘোষণা করা হয়।

তাপপ্রবাহের মূল কারণসমূহ

- **অ্যান্টি-সাইক্লোনিক সিস্টেম (উচ্চ-চাপ বলয়):** এটি তাপপ্রবাহের প্রধান কারণ। উচ্চ-চাপ বলয়ের কারণে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের বাতাস নিচের দিকে নেমে আসে এবং সংকুচিত হয়ে গরম হয়ে যায় (অ্যাডিয়াব্যাটিক হিটিং)। এই ভারী বাতাস মাটির কাছের গরম বাতাসকে ওপরে উঠতে বাধা দেয়, যা অনেকটা হাঁড়ির ঢাকনার মতো তাপকে আটকে রাখে।
- **জেট স্ট্রিম পরিবর্তন (হিট ডোম):** বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের দ্রুতগামী বাতাস বা **জেট স্ট্রিম** যখন স্থির হয়ে যায়, তখন এটি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর উচ্চ-চাপ বলয়কে দীর্ঘসময় আটকে রাখতে পারে। একেই 'ব্লকিং প্যাটার্ন' বা 'হিট ডোম' বলা হয়।
- **উষ্ণ বায়ু প্রবাহ (Warm Air Advection):** গরম ও শুষ্ক বায়ুর অনুভূমিক চলাচল। ভারতে এর অন্যতম উদাহরণ হলো 'লু' (Loo)—যা উত্তর-পশ্চিমের মরুভূমি অঞ্চল থেকে প্রবাহিত হয়ে সমতল ভূমির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।
- **মাটির আর্দ্রতা কমে যাওয়া:** সাধারণত সূর্যের তাপ মাটি ও গাছপালার জল বাষ্পীভূত করতে ব্যবহৃত হয়, যা বাতাসকে শীতল রাখে। কিন্তু খরা বা শুষ্ক সময়ে সূর্যের শক্তি সরাসরি মাটি ও বাতাসকে উত্তপ্ত করে, ফলে গরম আরও বেড়ে যায়।
- **জলবায়ু পরিবর্তন:** বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে তাপপ্রবাহ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘনঘন, দীর্ঘস্থায়ী এবং তীব্র হচ্ছে।
- **সামুদ্রিক প্রভাব (এল নিনো):** প্রশান্ত মহাসাগরের জল গরম হওয়ার ফলে বিশ্বব্যাপী বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় কম বৃষ্টিপাত এবং অতিরিক্ত গরমের সৃষ্টি করে।

আরবান হিট আইল্যান্ড (UHI) প্রভাব

আরবান হিট আইল্যান্ড (UHI) বা **শহরে তাপীয় দ্বীপ** হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে শহরাঞ্চলের তাপমাত্রা তার চারপাশের গ্রামীণ বা আধা-শহরে এলাকার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে।

শহরে তাপীয় দ্বীপ (UHI) তৈরির কারণসমূহ

- **নিম্ন অ্যালবেডো (তাপ শোষণ):** শহরের পিচ ঢালা রাস্তা এবং কংক্রিটের দালানগুলো গাঢ় রঙের হয়, যা প্রাকৃতিকভাবে প্রতিফলিত হওয়ার বদলে সূর্যের তাপকে অনেক বেশি শোষণ করে।
- **তাপীয় সঞ্চয় (Thermal Storage):** ইট ও কংক্রিটের মতো ঘন উপাদানের তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। এগুলো দিনের বেলা তাপ সঞ্চয় করে এবং রাতে তা ধীরে ধীরে ছাড়ে, ফলে রাতেও শহর শীতল হতে পারে না।

- **বাষ্পীভবনের অভাব:** শহরে গাছপালা এবং জলাশয়ের পরিবর্তে কংক্রিটের আচ্ছাদন থাকে। ফলে গাছপালা এবং মাটির আর্দ্রতা থেকে যে স্বাভাবিক শীতলীকরণ (Evapotranspiration) হওয়ার কথা, তা ঘটে না।
- **শহরে জ্যামিতি (আরবান ক্যানিয়ন):** উঁচু ভবনগুলো দীর্ঘ তরঙ্গ বিকিরণকে (Heat radiation) নিজেদের মধ্যে আটকে ফেলে এবং বাতাসের চলাচল কমিয়ে দেয়, ফলে তাপ সহজে বের হতে পারে না।
- **মনুষ্যসৃষ্ট তাপ:** এসি (Air Conditioners), যানবাহনের ধোঁয়া এবং শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য তাপ সরাসরি শহরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

প্রধান পার্থক্য: তাপপ্রবাহ (Heat Wave) বনাম আরবান হিট আইল্যান্ড (UHI)

বৈশিষ্ট্য	তাপপ্রবাহ (Heat Wave)	আরবান হিট আইল্যান্ড (UHI)
প্রকৃতি	এটি একটি আঞ্চলিক আবহাওয়াগত ঘটনা যেখানে তাপমাত্রা সাময়িকভাবে খুব বেড়ে যায়।	এটি একটি কাঠামোগত ঘটনা যেখানে একটি শহর তার চারপাশের তুলনায় ক্রমাগত বেশি গরম থাকে।
ব্যাপ্তি	বিশাল এলাকা (Macro-scale): বড় অঞ্চল, রাজ্য বা একাধিক দেশ জুড়ে হতে পারে।	ক্ষুদ্র এলাকা (Micro-scale): নির্দিষ্ট শহরে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
মূল কারণ	বায়ুমণ্ডলীয় কারণ: উচ্চ-চাপ বলয়, জেট স্ট্রিমের পরিবর্তন এবং উষ্ণ বায়ু প্রবাহ।	ভূমি ব্যবহারের কারণ: কংক্রিটের ব্যবহার, নিম্ন অ্যালবেডো (তাপ প্রতিফলন ক্ষমতা কম) এবং গাছপালার অভাব।
স্থায়িত্ব	সাময়িক: কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।	স্থায়ী: সারা বছরই বিদ্যমান থাকে, তবে ঋতুভেদে তীব্রতা কম-বেশি হয়।
দৈনিক চক্র	বিকেলের দিকে যখন সূর্যের বিকিরণ সবচেয়ে বেশি থাকে, তখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হয়।	রাতে সবচেয়ে বেশি তীব্র হয়, কারণ দালানগুলো দিনের বেলা ধরে রাখা তাপ রাতে ছাড়ে।

তাপপ্রবাহ এবং আরবান হিট আইল্যান্ডের প্রভাব

১. জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রভাব

- **তাপজনিত অসুস্থতা:** হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন (জলশূন্যতা) এবং চরম ক্লান্তির ঝুঁকি বেড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ গরমে থাকা মারাত্মক হতে পারে, বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ এবং যারা বাইরে কাজ করেন তাদের জন্য।
- **অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি:** অতিরিক্ত গরমে হৃদরোগ এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যাগুলো আরও বেড়ে যায়। UHI-এর কারণে রাতে শহর শীতল হতে পারে না, ফলে মানুষের শরীর দিনের তাপ থেকে সেরে ওঠার সুযোগ পায় না।
- **শ্রম উৎপাদনশীলতা:** বিশেষ করে নির্মাণ এবং কৃষি খাতে কাজের সময়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অতিরিক্ত গরমে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা এবং শারীরিক শক্তি কমে যায়।
- **সামাজিক অসমতা:** বস্তি বা ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাসকারী মানুষ, যাদের ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস বা শীতল করার ব্যবস্থা নেই, তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. পরিবেশ ও বাতাসের গুণমানের ওপর প্রভাব

- **ওজোন স্তরের ক্ষতি:** উচ্চ তাপমাত্রা এবং সূর্যালোকের প্রভাবে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং অন্যান্য জৈব যৌগ বিক্রিয়া করে মাটির কাছাকাছি ক্ষতিকারক ওজোন (smog) তৈরি করে।
- **জল সংকট:** জলাশয়ের জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয় এবং ভূগর্ভস্থ জলের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়ভাবে জল সংকট দেখা দেয়।
- **জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি:** অতিরিক্ত গরমে শহরের গাছপালা এবং পশুপাখির ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অনেক সময় পানিশূন্যতার কারণে শহরের পাখি ও ছোট প্রাণীদের মৃত্যু ঘটে।

৩. অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোর ওপর প্রভাব

- **বিদ্যুৎ সংকট:** এসি ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যায়, যা ইলেকট্রিক গ্রিডের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় ট্রান্সফরমার পুড়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে।
- **পরিকাঠামোর ক্ষতি:** অতিরিক্ত গরমে রেললাইন বেঁকে যেতে পারে এবং রাস্তার পিচ গলে নরম হয়ে যায়, যা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাড়িয়ে দেয়।
- **কৃষিজ ক্ষতি:** যদিও UHI একটি স্থানীয় সমস্যা, তবে আঞ্চলিক তাপপ্রবাহ গম বা অন্যান্য খাদ্যশস্যের ব্যাপক ক্ষতি করে, যা বাজারে খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

১. জাতীয় পর্যায়ে পরিকাঠামো

- **হিট অ্যাকশন প্ল্যান (HAPs):** NDMA (জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ) ২৩টিরও বেশি রাজ্য এবং ১০০টির বেশি শহরের সাথে মিলে স্থানীয়ভাবে গরম মোকাবিলার কৌশল তৈরি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আগাম সতর্কতা এবং পাবলিক 'কুলিং সেন্টার' তৈরি করা।
- **ইন্ডিয়া কুলিং অ্যাকশন প্ল্যান (ICAP):** ২০৩৮ সালের মধ্যে শীতলীকরণের চাহিদা ২০-২৫% কমিয়ে আনার একটি ২০ বছরের লক্ষ্যমাত্রা।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAPCC):** এর আওতায় টেকসই নগর পরিকল্পনা এবং ভবন নির্মাণে শক্তির সাশ্রয় করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২. শহুরে ও কাঠামোগত উদ্যোগ

- **কুল রুফ (Cool Roof) নীতি:** তেলেঙ্গানা প্রথম রাজ্য হিসেবে এটি চালু করেছে। এর লক্ষ্য হলো বাড়ির ছাদে প্রতিফলক রং ব্যবহার করা যাতে ঘরের তাপমাত্রা ২-৪° সেলসিয়াস কমানো যায়। **তামিলনাড়ুও** নতুন ভবনের জন্য এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করেছে।
- **প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (NbS):** মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের মতো শহরগুলোতে **মিয়াবাকি (Miyawaki)** পদ্ধতিতে ঘন বন তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও 'অমৃত সরোবর' প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের জলাশয়গুলো সংস্কার করা হচ্ছে।
- **PMAY (প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা):** নতুন সাশ্রয়ী ঘর তৈরিতে আধুনিক তাপ-সহনশীল সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. নজরদারি ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা

- **IMD-র সতর্কতা:** আবহাওয়া দপ্তর এখন হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red) রঙের মাধ্যমে তাপপ্রবাহের আগাম সতর্কতা জারি করে।
- **SACHET পোর্টাল:** NDMA-র একটি পোর্টাল যা সরাসরি মানুষের স্মার্টফোনে রিয়েল-টাইম সতর্কতা পাঠায়।
- **SATARK অ্যাপ:** ওড়িশার মতো রাজ্যে ব্লক-স্তরে সতর্কতা দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

প্রশমন কৌশল

১. দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত কৌশল

- **কুল রুফ এবং রাস্তা:** ছাদে সাদা বা প্রতিফলক রং ব্যবহার করা এবং রাস্তায় এমন উপাদান ব্যবহার করা যা তাপ শোষণ করবে না।
- **সবুজ পরিকাঠামো:** শহর জুড়ে প্রচুর গাছ লাগানো এবং বাড়ির ছাদে বা দেয়ালে বাগান (Vertical Gardens) তৈরি করা।
- **নীল পরিকাঠামো:** শহরের পুকুর, খাল ও জলাভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করা। এগুলো তাপ শোষক হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশ শীতল রাখে।

- **প্যাসিভ কুলিং আর্কিটেকচার:** এমনভাবে ভবন তৈরি করা যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং এসির প্রয়োজন কম হয়।

২. মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা ও নীতি

- **ভেন্টিলেশন করিডোর:** উঁচু ভবনগুলোর মাঝে এমন ফাঁকা জায়গা রাখা যাতে বাতাস চলাচলের মাধ্যমে জমে থাকা তাপ বের হয়ে যেতে পারে।
- **শ্রম নিয়ন্ত্রণ:** গরমের সময় (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা) বাইরে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক বিরতি এবং কাজের সময় পরিবর্তন করা।

৩. স্বল্পমেয়াদী ও জরুরি ব্যবস্থা

- **পাবলিক কুলিং সেন্টার:** সাধারণ মানুষের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা শীতল জনসমাগমস্থল তৈরি করা।
- **স্বাস্থ্য প্রস্তুতি:** সরকারি হাসপাতালগুলোতে 'হিট স্ট্রোক রুম', আইস প্যাক এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা।

উপসংহার

তাপপ্রবাহ এবং আরবান হিট আইল্যান্ড বর্তমান সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। এগুলো মোকাবিলা করতে হলে কেবল জরুরি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে টেকসই নগর পরিকল্পনা, সবুজায়ন এবং জলাশয় সংরক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এটিই জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একমাত্র পথ।

Q. Bring out the causes for the formation of heat islands in the urban habitat of the world. 5 Marks

3.3. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

3.3.1. ভারতে নকশালবাদ

বর্তমান প্রেক্ষাপট

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০২৬ সালের ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে ভারত থেকে নকশালবাদ সম্পূর্ণ নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (MHA, 2025) তথ্য অনুযায়ী, "সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলার" সংখ্যা ২০১৪ সালের ৩৬টি থেকে কমে ২০২৫ সালে মাত্র ৩টিতে (ছত্তিশগড়ের বিজাপুর, সুকমা এবং নারায়ণপুর) দাঁড়িয়েছে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত জেলার সংখ্যা ১২৬ থেকে কমে মাত্র ১১-তে নেমে এসেছে।



নকশালবাদ কী?

নকশালবাদ বা বামপন্থী চরমপন্থা (LWE) হলো মাওবাদী আদর্শ (বিশেষ করে "দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ" বা Protracted People's War) দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ।

- **উদ্দেশ্য:** সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্রকে উৎখাত করা এবং একটি "জনগণের সরকার" প্রতিষ্ঠা করা।
- **পদ্ধতি:** গেরিলা যুদ্ধ, "মুক্ত অঞ্চল" (liberated zones) তৈরি করা এবং "শ্রেণি শত্রু" (জমিদার ও রাষ্ট্র)-এর বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে (আদিবাসী ও ভূমিহীন শ্রমিক) সংগঠিত করা।

ভারতে নকশালবাদের পটভূমি

- **নকশালবাড়ি বিদ্রোহ (১৯৬৭):** এটি পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রামে চারু মজুমদার, কানু স্যান্যাল এবং জঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে শুরু হয়। এটি ছিল শোষক জমিদারদের (জোতদার) বিরুদ্ধে একটি কৃষক বিদ্রোহ।

- **আদর্শগত বিভাজন:** এই আন্দোলনের ফলে CPI(M) ভেঙে ১৯৬৯ সালে CPI (Marxist-Leninist) গঠিত হয়।
- **CPI (Maoist) গঠন:** ২০০৪ সালে 'পিপলস ওয়ার গ্রুপ' (PWG) এবং 'মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার অফ ইন্ডিয়া' (MCCI) একীভূত হয়ে বর্তমানের শক্তিশালী গোষ্ঠী CPI (Maoist) গঠন করে।

ভারতে নকশালবাদের বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম পর্যায়: নকশালবাড়ি পর্ব (১৯৬৭ – ১৯৭৫)

- **ফোকাস:** রোমান্টিক "কৃষক বিপ্লব"।
- **বৈশিষ্ট্য:** এটি মূলত সামন্তবাদ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে একটি আদর্শিক আন্দোলন ছিল।
- **ফলাফল:** ১৯৭২ সালে 'অপারেশন স্টিপলচেজ' এবং চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর এটি ব্যাপকভাবে দমন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: খণ্ডবিখণ্ড ও টিকে থাকা (১৯৭৫ – ২০০৪)

- **ফোকাস:** আঞ্চলিক সুসংহতকরণ।
- **বৈশিষ্ট্য:** আন্দোলনটি অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। দুটি প্রধান দল উঠে আসে: অন্ধ্রপ্রদেশের 'পিপলস ওয়ার গ্রুপ' (PWG) এবং বিহার-ঝাড়খণ্ডের 'মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার' (MCC)।
- **ফলাফল:** আন্দোলনটি সমতল থেকে গভীর অরণ্য অঞ্চলে সরে যায় এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার দিকে মনোযোগ দেয়।

তৃতীয় পর্যায়: চরম সীমা ও "রেড করিডোর" (২০০৪ – ২০১৪)

- **ফোকাস:** সামরিকীকরণ ও বিস্তার।
- **বৈশিষ্ট্য:** ২০০৪ সালে PWG এবং MCC একীভূত হয়ে CPI (Maoist) গঠন করে, যা আন্দোলনকে একটি একক কমান্ডের অধীনে আনে।
- **রেড করিডোর:** নেপাল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত একটি বিশাল অঞ্চল এই আন্দোলনের প্রভাবে আসে।
- **ফলাফল:** ২০১০ সালের দান্তেওয়াড়া হামলার মতো বড় মাপের সহিংসতা ঘটে। সরকার এটিকে ভারতের "একক বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকি" হিসেবে ঘোষণা করে।

চতুর্থ পর্যায়: পতন ও নির্মূলকরণ (২০১৪ – বর্তমান)

- **ফোকাস:** প্রভাব হ্রাস এবং সম্পূর্ণ নির্মূল।
- **বৈশিষ্ট্য:** SAMADHAN কৌশলের প্রয়োগ এবং "নিরাপত্তা ও উন্নয়ন"-এর ওপর জোর দেওয়া।
- **বর্তমান অবস্থা:** ২০২৬ সালের মার্চ নাগাদ আন্দোলনটি ছত্তিশগড়ের কয়েকটি পকেটে সীমাবদ্ধ। সরকার এ বছরের মধ্যে "নকশাল-মুক্ত ভারত" গড়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ভারতে নকশালবাদের কারণ

১. **ভূমি বিচ্যুতি:** "লাঙ্গল যার জমি তার" নীতি বা ভূমি সংস্কার সঠিকভাবে না হওয়ায় জমি ধনীদের হাতে থেকে যায় এবং আদিবাসীরা ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়।
২. **খনন ও উন্নয়নমূলক সংকট:** আদিবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন ছাড়াই খনিজ উত্তোলনের জন্য তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি করেছে।
৩. **বনজ অধিকার লঙ্ঘন:** ২০০৬ সালের বন অধিকার আইন (Forest Rights Act) ধীরগতিতে বাস্তবায়ন হওয়া এবং আদিবাসীদের চিরাচরিত বনজ সম্পদের অধিকার কেড়ে নেওয়া তাদের বিদ্রোহী হতে বাধ্য করেছে।
৪. **শাসনের অভাব:** দুর্গম এলাকায় সরকারি পরিষেবা (স্কুল, হাসপাতাল) না থাকায় মাওবাদীরা সেখানে জন আদালত (People's Courts)-এর মতো সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তোলে।

৫. **আর্থ-সামাজিক অবহেলা:** চরম দারিদ্র্য, অপুষ্টি এবং বেকারত্ব যুবসমাজকে মাওবাদী আদর্শের দিকে ঠেলে দেয়।
৬. **মধ্যস্থত্বভোগীদের শোষণ:** মহাজন ও ঠিকাদারদের শোষণ এবং **বন্ধকী শ্রম** (bonded labour) থেকে বাঁচতে অনেকে নকশালদের কাছে "তাৎক্ষণিক বিচার" চায়।
৭. **যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা:** বস্তার ও অবুজমাদের মতো এলাকায় রাস্তাঘাট ও মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় রাষ্ট্র সেখানে পৌঁছাতে পারেনি, যা নকশালদের নিরাপদ আশ্রয় দেয়।

নকশালবাদ মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগ

সরকার একটি **বহুমুখী কৌশল** অনুসরণ করে:

১. নিরাপত্তা ব্যবস্থা

- **SAMADHAN কৌশল (২০১৭):** (S- স্মার্ট নেতৃত্ব; A- আত্মসী কৌশল; M- প্রেরণা ও প্রশিক্ষণ; A- কর্মযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য; D- ড্যাশবোর্ড ভিত্তিক অগ্রগতি; H- প্রযুক্তির ব্যবহার; A- প্রতিটি অঞ্চলের জন্য কর্মপরিকল্পনা; N- অর্থায়ন বন্ধ করা)।
- **বিশেষ বাহিনী:** CRPF-এর CoBRA ব্যাটালিয়ন, অন্ধ্রপ্রদেশের Greyhounds এবং ছত্তিশগড়ের DRG (District Reserve Guard) মোতায়েন।
- **নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যয় (SRE) প্রকল্প:** রাজ্যগুলোকে নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনাল খরচ ও বীমার জন্য ১০০% কেন্দ্রীয় অর্থ প্রদান।
- **সুরক্ষিত থানা:** নকশাল হামলা ঠেকাতে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ৬৫৬টিরও বেশি সুরক্ষিত থানা নির্মাণ করা হয়েছে।
- **অর্থায়ন বন্ধ:** NIA এবং ED-এর মাধ্যমে নকশালদের চাঁদাবাজি ও আয়ের উৎসগুলো বন্ধ করা।

২. উন্নয়নমূলক উদ্যোগ

- **বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা (SCA):** সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে রাস্তা, ছোট সেতু এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির জন্য সরাসরি তহবিল প্রদান।
- **পরিকাঠামো সংযোগ:** রাস্তা তৈরির প্রকল্প (RRP) এবং **মোবাইল টাওয়ার প্রকল্প** (৯২০০+ টাওয়ার) এর মাধ্যমে 'শ্যাডো জোন' দূর করা।
- **শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন:** আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য **একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল (EMRS)** এবং প্রতিটি জেলায় ITI/Skill Development Centre স্থাপন।
- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** পিছিয়ে পড়া এলাকায় ৬০০০টি ডাকঘর এবং ১৮০০টির বেশি ব্যাংক শাখা/ATM স্থাপন।

৩. অধিকার ও পাওনা

- **বন অধিকার আইন (২০০৬):** আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত বনজ অধিকার দ্রুত নিষ্পত্তি করা।
- **নিয়াদ নেম্বানার প্রকল্প (ছত্তিশগড়):** এর অর্থ "আপনার সুন্দর গ্রাম"। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বস্তার অঞ্চলের গ্রামগুলোতে ২৫টিরও বেশি অত্যাবশ্যকীয় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

৪. আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি

- **আর্থিক সহায়তা:** আত্মসমর্পণকারী উচ্চপদস্থ ক্যাডারদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং অন্যদের জন্য ২.৫ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান।
- **মূল স্রোতে ফেরানো:** বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ৩ বছরের জন্য মাসিক ভাতা এবং জমি/বাড়ি প্রদান।

৫. জনমত গঠন

- **নাগরিক সুরক্ষা কর্মসূচি (CAP):** নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন এবং খেলাধুলার (যেমন: **vastar অলিম্পিক** ২০২৫-২৬) আয়োজন করে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন।

- **উপজাতীয় যুব বিনিময় কর্মসূচি:** আদিবাসী যুবকদের দেশের অন্যান্য অংশের উন্নয়ন দেখানো যাতে তারা বিচ্ছিন্ন বোধ না করে।

নকশালবাদ মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জসমূহ

১. ভৌগোলিক এবং কৌশলগত চ্যালেঞ্জ

- **দুর্গম ভূখণ্ড:** ছত্তিশগড়ের আবুজমাড়-এর মতো প্রধান "মুক্ত অঞ্চলগুলো" প্রায় ৪,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই অঞ্চলগুলো ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে ঘেরা এবং এখানকার কোনো মানচিত্র বা জরিপ নেই, যা আকাশপথে নজরদারি এবং বাহিনীর চলাচলের জন্য অত্যন্ত কঠিন।
- **অসম যুদ্ধ (Asymmetric Warfare):** নকশালরা "হিট-এন্ড-রান" (আক্রমণ করে পালিয়ে যাওয়া) গেরিলা কৌশল এবং IED (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) ব্যবহার করে, যার ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যার আধিক্যও অনেক সময় কার্যকর হয় না।
- **আন্তঃরাজ্য সংযোগস্থলে নিরাপদ আশ্রয়:** বিদ্রোহীরা রাজ্যগুলোর সীমান্তের "ত্রি-সংগম" (যেমন- ছত্তিশগড়-ওড়িশা-তেলেঙ্গানা) এলাকাগুলোকে ব্যবহার করে। এক রাজ্যের পুলিশ তাড়া করলে তারা সহজেই অন্য রাজ্যের সীমানায় পালিয়ে যায়।

২. গোয়েন্দা এবং অপারেশনাল ঘাটতি

- **মানবিক গোয়েন্দা তথ্যের অভাব (HUMINT Deficit):** নকশালদের "জন আদালত"-এর নৃশংস প্রতিশোধের ভয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রায়ই নিরাপত্তা বাহিনীকে তথ্য দিতে অস্বীকার করে।
- **প্রযুক্তি বনাম অরণ্য:** বনের উপরিভাগের ঘন পাতার আবরণ বা ক্যানোপি-র কারণে উচ্চমানের ড্রোন বা স্যাটেলাইট ইমেজারি ছোট ছোট গেরিলা দলগুলোকে ট্র্যাক করতে ব্যর্থ হয়।
- **IED-এর ব্যাপক বিস্তার:** প্রেসার-কুকার বোমা এবং উন্নত ল্যান্ডমাইন ব্যবহারের ফলে সাধারণ টহলের ক্ষেত্রেও প্রাণের ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে, যা স্থলবাহিনীর জন্য সবচেয়ে বড় বাধা।

৩. শাসন এবং উন্নয়নমূলক বাধা

- **"আস্থার সংকট":** দশকের পর দশক ধরে অবহেলা এবং প্রশাসনের কঠোর আচরণের কারণে মানুষের "মন জয় করা" এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়েছে।
- **পরিকাঠামো নির্মাণে বিলম্ব:** মাওবাদী দুর্গগুলোতে রাস্তাঘাট নির্মাণ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলে, কারণ ঠিকাদারদের লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং প্রায়ই নির্মাণ সরঞ্জাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
- **অকার্যকর স্থানীয় সংস্থা:** অনেক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় PESA আইন এবং পঞ্চম তফসিল-এর সঠিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে যে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা তৈরি হয়, নকশালরা তার দখল নেয়।

৪. আদর্শগত এবং সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ

- **শহরে নকশালবাদ/ওভারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক:** শহরে বসে নকশালদের আইনি সহায়তা, নিয়োগ এবং প্রচার চালানো এক ধরনের "অদৃশ্য" বহুমুখী যুদ্ধ তৈরি করেছে।
- **তোলাবাজি অর্থনীতি:** নকশালরা খনি কোম্পানি, পূর্ত ঠিকাদার এবং তেন্দু পাতা সংগ্রাহকদের ওপর কর বসিয়ে কোটি কোটি টাকার একটি "তোলাবাজি চক্র" চালায়। এর ফলে নোটবন্দি বা আর্থিক কড়াকড়ি সত্ত্বেও তারা সবসময় আর্থিকভাবে শক্তিশালী থাকে।
- **যুবকদের মৌলবাদীকরণ:** বেকারত্ব এবং উচ্ছেদের মতো স্থানীয় সমস্যাগুলোকে কাজে লাগিয়ে তারা পরবর্তী প্রজন্মের "পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি" (PLGA) ক্যাডার নিয়োগ করে।

৫. আইনি এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

- **পার্শ্বীয় ক্ষতি (Collateral Damage):** কোনো অভিযানের সময় ভুলবশত সাধারণ নাগরিক হতাহত হলে নকশালরা সেই প্রপাগান্ডাকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে।
- **আইনি দীর্ঘসূত্রিতা:** শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতাদের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়ার ধীরগতি অনেক সময় তাদের কারাগার থেকে বা জামিনে থেকে পুনরায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ করে দেয়।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. "শাসন-কেন্দ্রিক" সংহতির দিকে রূপান্তর

- **'ক্রিয়ার-হোল্ড' থেকে 'ডেভেলপ' (উন্নয়ন):** কেবল সামরিক অভিযানের বদলে এখন "উন্নয়ন" স্তরে মনোযোগ দিতে হবে। মাওবাদীরা পিছু হটলে সেখানে যে প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি হয়, তা কেবল সেনাশিবির দিয়ে নয়, বরং সিভিল কর্মকর্তাদের দিয়ে দ্রুত পূরণ করতে হবে।
- **সার্বজনীন পরিষেবা প্রদান:** সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় "নিয়াদ নেপ্পানার" (আপনার সুন্দর গ্রাম) মডেলটি ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিদ্যুতের সুবিধা ১০০% মানুষের কাছে পৌঁছায়।

২. আদিবাসী অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

- **PESA এবং বন অধিকার:** গ্রামসভাকে শক্তিশালী করতে PESA আইন (১৯৯৬) এবং বন অধিকার আইন (২০০৬) অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এর ফলে আদিবাসীরা বনজ সম্পদ এবং জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ পাবে, যা তাদের "বিচ্ছিন্নতাবোধ" দূর করবে।
- **ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশন:** রেড করিডোর এলাকায় ভূমি রেকর্ডের আধুনিকীকরণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে মধ্যস্থত্বভোগীরা আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিতে না পারে।

৩. কৌশলগত "বিদ্রোহ-পরবর্তী" নিরাপত্তা

- **মাইন অপসারণ অভিযান:** হাজার হাজার লুকিয়ে রাখা IED অপসারণের জন্য NSG এবং CRPF-কে নিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর একটি বিশাল মাইন মুক্তকরণ অভিযান শুরু করতে হবে।
- **স্থানীয় পুলিশকে শক্তিশালী করা:** ঝুঁকি কমার সাথে সাথে ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় বাহিনী (CAPF) প্রত্যাহার করতে হবে। এর বদলে DRG বা Greyhounds-এর মতো স্থানীয় রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে নিরাপত্তার দায়িত্ব দিতে হবে, যাদের স্থানীয় ভাষা এবং ভূখণ্ড সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে।

৪. "শহরে মাওবাদ" এবং আদর্শের মোকাবিলা

- **ইতিবাচক প্রচার:** আত্মসমর্পণকারী ক্যাডারদের (যারা এখন "শান্তি দূত") সাফল্যের কাহিনী এবং "বাতার অলিম্পিক"-এর মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাওবাদী হিংসার আদর্শের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
- **আর্থিক গোয়েন্দাগিরি:** NIA এবং ED-এর মাধ্যমে নকশালদের "তোলাবাজি অর্থনীতি" এবং তাদের শহরে সাহায্যকারীদের নেটওয়ার্ক পুরোপুরি ধ্বংস করতে হবে।

৫. অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণ

- **টেকসই জীবিকা:** বনজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্প, ইকো-ট্যুরিজম (যেমন- বস্তার সার্কিট) এবং দুগ্ধ সমবায়কে উৎসাহিত করতে হবে যাতে যুবসমাজের সামনে উপার্জনের বিকল্প পথ থাকে।
- **পরিকাঠামো বজায় রাখা:** "৩-সি সংযোগ" বা ৩-সি কানেক্টিভিটি (রাস্তা, মোবাইল এবং ব্যাংক) যাতে সচল থাকে এবং কোনোভাবেই যাতে চরমপন্থীরা তা নষ্ট করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

২০২৬ সালের মার্চের লক্ষ্যমাত্রাটি সশস্ত্র সংঘাত থেকে সমন্বিত উন্নয়নের দিকে উত্তরণকে চিহ্নিত করে। ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ভর করছে আদিবাসীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে "রেড করিডোর"-কে একটি প্রাণবন্ত আর্থ-সামাজিক অঞ্চলে রূপান্তর করার ওপর।

Q. Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues gest a multilayered strategy to tackle the menace of Naxalism. 15 Marks

3.4. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

3.4.1. আর্টেমিস ২ মিশন (ARTEMIS II MISSION)

প্রেক্ষাপট

আর্টেমিস ২ হলো নাসার (NASA) আর্টেমিস প্রোগ্রামের প্রথম মানববাহী অভিযান। এর মাধ্যমে ৫০ বছরেরও বেশি সময় পর (১৯৭২ সালে অ্যাপোলো ১৭-এর পর) মানুষ পুনরায় চন্দ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি ফিরে যাচ্ছে।

আর্টেমিস ২ মিশন সম্পর্কে

- উৎক্ষেপণের তারিখ: ১ এপ্রিল, ২০২৬ (ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে)।
- অভিযানের প্রকৃতি: একটি মানববাহী লুনার ফ্লাইবাই বা চন্দ্র-পরিক্রমা (এই অভিযানে নভোচারীরা চাঁদে অবতরণ করবেন না)।
- সময়সীমা: প্রায় ১০ দিন।
- মহাকাশযান: ওরিয়ন (Orion) মাল্টি-পারপাস ড্রু ভেহিকেল, যা ইউরোপীয় সার্ভিস মডিউল (ESM) দ্বারা চালিত।
- উৎক্ষেপণ যান (রকেট): স্পেস লঞ্চ সিস্টেম (SLS)—এটি ইতিহাসের সবথেকে শক্তিশালী কার্যকর রকেট, যা ৮.৮ মিলিয়ন পাউন্ড থ্রাস্ট উৎপন্ন করতে সক্ষম।



নভোচারী দলের ঐতিহাসিক "প্রথম" সাফল্যসমূহ

এই চার সদস্যের দলটি গভীর মহাকাশ গবেষণায় অন্তর্ভুক্তি (Inclusivity) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি নতুন অধ্যায় তুলে ধরে:

- রিড ওয়াইজম্যান (কমান্ডার): নাসার অভিজ্ঞ নভোচারী।
- ভিক্টর গ্লোভার (পাইলট): পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথ (LEO) অতিক্রমকারী প্রথম অশ্বেত ব্যক্তি।
- ক্রিস্টিনা কোচ (মিশন স্পেশালিস্ট): চাঁদের কাছাকাছি ভ্রমণকারী প্রথম নারী।
- জেরেমি হ্যানসেন (মিশন স্পেশালিস্ট): চাঁদে পাড়ি দেওয়া প্রথম অ-মার্কিন নাগরিক (কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সি)।

আর্টেমিস মিশনের রোডম্যাপ

মিশন	বর্তমান অবস্থা/তারিখ	মহাকাশযান ও রকেট	প্রধান লক্ষ্য
আর্টেমিস ১	সম্পন্ন (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২)	SLS ব্লক ১ এবং ওরিয়ন (মানবহীন)	সিস্টেম ভ্যালিডেশন: লুনার কক্ষপথ থেকে দ্রুতগতিতে পৃথিবীতে ফেরার সময় SLS রকেট এবং ওরিয়নের হিট শিল্ড পরীক্ষা করা।

আর্টেমিস ২	চলমান (১ এপ্রিল ২০২৬-এ উৎক্ষেপণ)	SLS ব্লক ১ এবং ওরিয়ন (মানববাহী)	হিউম্যান অ্যালিডেশন: গভীর মহাকাশে ১০ দিনব্যাপী জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা (ECLSS) এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা পরীক্ষা করা।
আর্টেমিস ৩	নির্ধারিত (২০২৭-এর মাঝামাঝি)	SLS, ওরিয়ন এবং স্পেসএক্স স্টারশিপ HLS	পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে স্টারশিপ HLS, ব্লু মুন ল্যান্ডার এবং নতুন অ্যাক্সিওম (Axiom) স্পেস স্যুট পরীক্ষা করা (চাঁদে অবতরণ হবে না)।
আর্টেমিস ৪	নির্ধারিত (২০২৮-এর শুরুতে)	SLS ব্লক ১বি এবং ওরিয়ন	এই প্রোগ্রামের প্রথম চন্দ্র অবতরণ। নভোচারীরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করবেন।
আর্টেমিস ৫	নির্ধারিত (২০২৮-এর শেষ দিকে)	SLS ব্লক ১বি এবং ব্লু অরিজিন ল্যান্ডার	দ্বিতীয় চন্দ্র অবতরণ; চন্দ্রপৃষ্ঠে লুনার বেস ক্যাম্প নির্মাণের সূচনা।

আর্টেমিস প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্যসমূহ

আর্টেমিস ২ মিশনটি মূলত মানবহীন আর্টেমিস ১ এবং অবতরণ মিশন আর্টেমিস ৩-এর মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

- **মানুষ ও যন্ত্রের সমন্বয় (Human-System Integration):** ওরিয়ন মহাকাশযানের পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ এবং জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা (ECLSS) যাচাই করা, যাতে এটি ১০ দিনের জন্য চারজন নভোচারীর অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণ, \$CO_2\$ অপসারণ এবং তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে।
- **ম্যানুয়াল ম্যানুভারিং এবং প্রক্সিমিটি অপারেশন:** পাইলট যখন ওরিয়ন মহাকাশযানটিকে ICPS-এর (রকেটের উপরের অংশ) কাছাকাছি হাতে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, তখন ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং এবং ডকিং সেন্সরগুলো পরীক্ষা করা।
- **গভীর মহাকাশ নেভিগেশন ও যোগাযোগ:** উচ্চ-গতির অপটিক্যাল (লেজার) যোগাযোগ এবং ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক পরীক্ষা করা, যাতে পৃথিবী থেকে ৪,০০,০০০ কিমি দূরেও নিরবচ্ছিন্ন হাই-ব্যান্ডউইথ ডেটা এবং ভিডিও সংযোগ নিশ্চিত করা যায়।
- **বিকিরণ এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন:** নভোচারীরা যখন পৃথিবীর ভ্যান অ্যালেন বেল্টের সুরক্ষা বলয় ছেড়ে বাইরে যাবেন, তখন উচ্চ-শক্তির সৌর ও মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা, যা দীর্ঘমেয়াদী বসবাসের জন্য তথ্য প্রদান করবে।
- **পুনঃপ্রবেশ এবং পুনরুদ্ধার যাচাইকরণ:** পৃথিবীতে ফেরার সময় ওরিয়নের উচ্চ-গতির পুনঃপ্রবেশ (প্রায় ৪০,০০০ কিমি/ঘণ্টা) এবং প্রশান্ত মহাসাগরে নভোচারীসহ নিখুঁতভাবে অবতরণ বা স্প্যাশডাউন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করা। আর্টেমিস প্রোগ্রামের তাৎপর্য
 ১. **টেকসই আবাসনের পথে যাত্রা:** অ্যাপোলো অভিযানের "পতাকা উত্তোলন এবং পদচিহ্ন রেখে আসা" (flags and footprints) পদ্ধতির বিপরীতে, আর্টেমিস চাঁদে দীর্ঘমেয়াদী উপস্থিতির ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি ইন-সিটু রিসোর্স ইউটিলাইজেশন (ISRU) বা স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের ওপর জোর দেয়, বিশেষ করে জীবন রক্ষা এবং রকেট জ্বালানির (\$LH_2/LOX\$) জন্য চাঁদের দক্ষিণ মেরু থেকে বরফ-জল আহরণ করা।
 ২. **"চাঁদ থেকে মঙ্গল" অভিযানের পরীক্ষাগার:** ২০৩০-এর দশকে মঙ্গল অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় গভীর মহাকাশ প্রযুক্তিগুলোর জন্য চাঁদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগার হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে নিউক্লিয়ার থার্মাল প্রপালশন, উন্নত বিকিরণ সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং ক্লোজড-লুপ লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম।
 ৩. **মহাকাশ ভূ-রাজনীতি এবং নিয়ম-ভিত্তিক ব্যবস্থা:** আর্টেমিস অ্যাকর্ডস (যেটিতে ভারত স্বাক্ষর করেছে) এর মাধ্যমে এই মিশনটি স্বচ্ছ এবং শান্তিপূর্ণ মহাকাশ গবেষণার জন্য একটি মার্কিন-নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক কাঠামো তৈরি করে। এটি চীন-রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক লুনার রিসার্চ স্টেশন (ILRS)-এর একটি কৌশলগত পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।
 ৪. **সিসলুনার অর্থনীতি (Cislunar Economy):** আর্টেমিস বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (যেমন- SpaceX, Blue Origin) সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি "নিউ স্পেস" অর্থনীতি গড়ে তুলছে। এটি বাণিজ্যিক চন্দ্র খনি খনন, স্যাটেলাইট রিফুয়েলিং হাব এবং পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথের (LEO) সাথে চন্দ্র মহাকাশের অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে।

৫. **অন্তর্ভুক্তি এবং বিজ্ঞান কূটনীতি:** আর্টেমিস ২ মিশনে প্রথমবারের মতো একজন নারী, একজন অশ্বেতাজ্ঞ ব্যক্তি এবং একজন অ-মার্কিন নাগরিককে (কানাডিয়ান) অন্তর্ভুক্ত করে ঐতিহাসিক বাধাগুলো ভেঙে দিয়েছে। এটি শীতল যুদ্ধের সময়কার জাতীয়তাবাদী প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক ও **অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব বিজ্ঞান কূটনীতি**র প্রতিফলন ঘটায়।
৬. **ভারতের জন্য কৌশলগত গুরুত্ব:** এই প্রোগ্রামে ভারতের অংশগ্রহণ ইসরোর (ISRO) 'ভিশন ২০৪০' (চাঁদে ভারতীয় পাঠানো)-এর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি **গগনযান মিশন** এবং ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত তথ্য প্রদান করে এবং নাসা-ইসরো প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ বাড়ায়।

আর্টেমিস প্রোগ্রামের কঠিন চ্যালেঞ্জসমূহ

- **প্রযুক্তিগত নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা:** আর্টেমিস ১ মিশনে ওরিয়ন মহাকাশযানের **হিট শিল্ডে** ফাটল ও ক্ষয় হওয়ার সমস্যা দেখা গিয়েছিল। মহাকাশযানটি যখন **২,৭৬০°সে.** তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে, তখন নভোচারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ।
- **ব্যয়বহুল স্থায়িত্ব:** প্রতিটি SLS রকেট উৎক্ষেপণে প্রায় **২ বিলিয়ন ডলার** খরচ হয়, যা এর "আর্থিক স্থায়িত্ব" নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বেসরকারি পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেটের (যেমন- SpaceX Starship) তুলনায় SLS একটি ব্যয়বহুল মডেল।
- **গভীর মহাকাশ বিকিরণ:** পৃথিবীর ভ্যান অ্যালেন বেল্টের বাইরে নভোচারীরা উচ্চ-শক্তির **গ্যালাকটিক কসমিক রশ্মি (GCRs)** এবং সৌর কণা ঘটনার (SPEs) সম্মুখীন হন। দীর্ঘমেয়াদী মিশনের জন্য হালকা অথচ কার্যকর সুরক্ষা বর্ম তৈরি করা একটি বড় জীববৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ।
- **চন্দ্র ধূলিকণার (Regolith) বিষাক্ততা:** চাঁদের ধূলিকণা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ক্ষয়কারী এবং স্থির বিদ্যুৎযুক্ত। এটি মানুষের মধ্যে "**লুনার হে ফিভার**" সৃষ্টি করতে পারে এবং দীর্ঘ মেয়াদে স্পেস স্যুট ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ক্ষতি করতে পারে।
- **ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন:** মহাকাশে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী—**আর্টেমিস অ্যাকর্ডস** (যুক্তরাষ্ট্র/ভারত নেতৃত্বাধীন) এবং **ILRS** (চীন/রাশিয়া নেতৃত্বাধীন)—তৈরি হওয়ায় মহাকাশে এক ধরনের "**শীতল যুদ্ধ ২.০**" শুরু হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল নিয়ে বিরোধ তৈরি করতে পারে।
- **অবতরণের জটিলতা (দক্ষিণ মেরু):** চাঁদের দক্ষিণ মেরুর ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত বন্ধুর, যেখানে গভীর গর্ত এবং স্থায়ীভাবে ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চল (PSRs) রয়েছে। এই অঞ্চলে প্রচণ্ড অন্ধকার এবং অতি-শীতল তাপমাত্রার মধ্যে নিখুঁতভাবে অবতরণ করা অত্যন্ত কঠিন।

আর্টেমিস প্রোগ্রামের আগামী পথ

- **পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তির ব্যবহার:** আর্থিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে নাসাকে ব্যয়বহুল SLS মডেল থেকে সরে এসে **সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ভারী রকেটের** (যেমন- স্পেসএক্স-এর স্টারশিপ) দিকে ঝুঁকতে হবে। এতে চন্দ্রপৃষ্ঠে মালামাল পাঠানোর খরচ অনেক কমে আসবে।
- **মহাকাশ কূটনীতি শক্তিশালী করা:** প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাত এড়াতে জাতিসংঘ মহাকাশ বিষয়ক দপ্তরের (UNOOSA) অধীনে একটি **সার্বজনীন আইনি কাঠামো** প্রয়োজন। এটি সম্পদের ওপর একক আধিপত্য রোধ করবে এবং "**নিরাপত্তা অঞ্চলসমূহ**" শুধুমাত্র বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
- **ইন-সিটু রিসোর্স ইউটিলাইজেশন (ISRU) উন্নয়ন:** ফোকাস হতে হবে পৃথিবী থেকে রসদ নিয়ে যাওয়ার বদলে "**চাঁদের সম্পদ ব্যবহার করে বেঁচে থাকা**" ওপর। চাঁদের মাটি থেকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আহরণের প্রযুক্তি নিখুঁত করতে পারলেই চাঁদকে মঙ্গল অভিযানের একটি সফল "**পিট-স্টপ**" বা যাত্রাবিরতি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মডেল:** শুধুমাত্র যাতায়াত নয়, বরং চন্দ্র যোগাযোগ (যেমন- নোকিয়ার ৪জি লুনার নেটওয়ার্ক) এবং খনি খননের ক্ষেত্রেও বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ বাড়তে হবে। এটি উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করবে এবং সরকারের ওপর আর্থিক চাপ কমাতে।

- **ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** ভারতের উচিত আর্টেমিস অ্যাকর্ডসকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের "ভিশন ২০৪০" দ্রুত বাস্তবায়ন করা। এর মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতে কোনো চন্দ্র মিশনে ইসরোর নভোচারীর আসন নিশ্চিত করা এবং ভারী রকেট ও লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করা।
- **গ্রহের সুরক্ষা ও বিজ্ঞান:** চাঁদের "অন্ধকার দিক" (Far Side)-কে গভীর মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য রেডিও-শান্ত অঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটাতে পারে।

উপসংহার

আর্টেমিস প্রোগ্রাম মহাকাশ গবেষণাকে কেবল ভ্রমণের গণ্ডি থেকে বের করে টেকসই আবাসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতের জন্য এটি ভিশন ২০৪০-কে ত্বরান্বিত করার একটি বড় মাধ্যম, যা বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং একটি নতুন চন্দ্র-অর্থনীতি গড়ে তোলার পাশাপাশি গভীর মহাকাশ শাসনে ভারতের কৌশলগত নেতৃত্ব নিশ্চিত করবে।

Q. Examine how the Artemis Program, particularly Artemis II, reflects emerging trends in global space geopolitics and international cooperation. 15 Marks

3.4.2. ভারতের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচি

প্রেক্ষিত:

ভারত বর্তমানে তার পারমাণবিক শক্তি নীতিতে একটি আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এটি রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এখন "বাণিজ্যিক অংশগ্রহণ" মডেলে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ভারতের লক্ষ্য হলো ২০৪৭ সালের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮.৮ গিগাওয়াট (GW) থেকে বাড়িয়ে ১০০ গিগাওয়াটে নিয়ে যাওয়া, যা 'বিকশিত ভারত' এবং ২০৭০ সালের মধ্যে 'নেট-জিরো' (কার্বন নিঃসরণ শূন্য করা) লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।



ভারতের জন্য পারমাণবিক শক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১. নির্ভরযোগ্য বেসলোড পাওয়ার:

সৌর বা বায়ু শক্তির মতো উৎসগুলো সব সময় বিদ্যুৎ দিতে পারে না, কিন্তু পারমাণবিক শক্তি দিনে ২৪ ঘণ্টা টানা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। ২০২৪ সালে নবায়নযোগ্য শক্তি মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৫০% হলেও, প্রকৃত উৎপাদনের মাত্র ২২% ছিল। পারমাণবিক শক্তি কোনো বড় ব্যাটারি স্টোরেজ খরচ ছাড়াই গ্রিডের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

২. ভূমির সঠিক ব্যবহার:

ভারত একটি জনবহুল দেশ যেখানে জমির অভাব রয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সৌর বা বায়ু খামারের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ কম জমিতে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এটি ১০০ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ কৃষি ও বনভূমি রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

৩. পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা থেকে সুরক্ষা:

মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমাগত অস্থিরতার কারণে জ্বালানি সরবরাহে বাধা এবং মূল্যবৃদ্ধির জোড়া বিপদ তৈরি হয়। ভারত তার অপরিশোধিত তেলের ৮০%-এর বেশি আমদানি করে। একটি শক্তিশালী পারমাণবিক কর্মসূচি এই অস্থির অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভারতের অর্থনীতিকে নিরাপত্তা কবচ প্রদান করবে।

৪. থরিয়াম ভাণ্ডারের ব্যবহার:

বিশ্বের মোট থরিয়াম ভাণ্ডারের ২৫% ভারতে রয়েছে। AHWR এবং HALEU প্রযুক্তিতে সফল হলে ভারত শক্তি আমদানিকারক দেশ থেকে শক্তি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হতে পারে, যা আমাদের কয়েক শতাব্দী ধরে স্বনির্ভর রাখবে।

৫. কঠিন শিল্পগুলোর কার্বন মুক্তি (Decarbonizing Hard-to-Abate Industry):

ইস্পাত, সিমেন্ট এবং পেট্রোকেমিক্যালের মতো ভারী শিল্পগুলোতে প্রচুর তাপের প্রয়োজন হয়, যা কেবল সৌর শক্তি দিয়ে সম্ভব নয়। স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMRs) বা ছোট পারমাণবিক চুল্লিগুলো এই শিল্পগুলোর জন্য একটি স্থানীয় এবং কার্বন-মুক্ত তাপের উৎস হিসেবে কাজ করবে।

৬. কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং রপ্তানি সম্ভাবনা:

শান্তি (SHANTI) আইন ২০২৫ ভারতকে প্রযুক্তির অনুসারী থেকে বিশ্বব্যাপী রপ্তানিকারক হিসেবে গড়ে তুলবে। ভারতের নিজস্ব ২২০ মেগাওয়াট এবং ৭০০ মেগাওয়াট PHWR মডেলগুলো এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য সাশ্রয়ী সমাধান হিসেবে পরিচিত হচ্ছে, যা ভারতের "সফট পাওয়ার" বৃদ্ধি করবে।

শান্তি আইন (SHANTI Act) ২০২৫: একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ

১. মূল বিধান এবং কাঠামোগত পরিবর্তন:

- **পুরানো আইন বাতিল:** এটি ১৯৬২ সালের পরমাণু শক্তি আইন এবং ২০১০ সালের সিভিল লায়াবিলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট (CLNDA)-কে প্রতিস্থাপন করে একটি আধুনিক কাঠামো তৈরি করেছে।
- **বেসরকারি ও বিদেশি অংশগ্রহণ:** ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে (দেশি ও বিদেশি) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মালিকানা এবং পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- **AERB-এর সংবিধিবদ্ধ মর্যাদা:** পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক সংস্থা (AERB) এখন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয়েছে।
- **দায়বদ্ধতা কাঠামোর সংস্কার:** সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের ওপর দায়বদ্ধতার নিয়মগুলো সহজ করা হয়েছে, যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতে আসতে উৎসাহ পায়।

২. ভারতের ঐতিহ্যবাহী তিন-স্তরের পারমাণবিক কর্মসূচি

১৯৫০-এর দশকে ডক্টর হোমি ভাবা এই কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন যাতে ভারতের সীমিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে বিপুল থরিয়াম ভাণ্ডারকে কাজে লাগানো যায়।

স্তর (Stage)	প্রযুক্তি / চুল্লির ধরন	জ্বালানি চক্র	লক্ষ্য ও বর্তমান অবস্থা
প্রথম স্তর	PHWR (প্রেসারাইজড হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর)	প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম (জ্বালানি) + ভারী জল (মডারেটর)	লক্ষ্য: বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং উপজাত হিসেবে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ তৈরি করা। অবস্থা: এটি বর্তমানে পূর্ণ সফল; ১৫টির বেশি ইউনিট সচল।
দ্বিতীয় স্তর	PFBR (ফ্রাটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর)	প্লুটোনিয়াম-২৩৯ (মিক্সড অক্সাইড জ্বালানি) + ইউরেনিয়াম-২৩৮	লক্ষ্য: ব্যবহৃত জ্বালানির চেয়ে বেশি জ্বালানি তৈরি করা। এটি থরিয়াম ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম-২৩৩ তৈরির পথ প্রশস্ত করে। অবস্থা: কালপাক্কাম PFBR প্রকল্পটি বর্তমানে প্রধান অগ্রভাগে রয়েছে।

তৃতীয় স্তর	AHWR (অ্যাডভান্সড হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর)	থরিয়াম-২৩২ + ইউরেনিয়াম-২৩৩	লক্ষ্য: দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য থরিয়ামকে প্রধান জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা। অবস্থা: বর্তমানে গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) স্তরে রয়েছে।
----------------	--	---------------------------------	---

কেন এই তিন-স্তরের কর্মসূচি?

- **সম্পদের সীমাবদ্ধতা (Resource Constraint):** বিশ্বে মোট ইউরেনিয়ামের মাত্র ২% ভারতে আছে, কিন্তু বিশ্বের মোট থরিয়াম ভাণ্ডারের ২৫% ভারতে রয়েছে।
- **থরিয়ামের চ্যালেঞ্জ:** থরিয়াম নিজে থেকে সরাসরি শক্তি উৎপাদন করতে পারে না (এটি "ফিসাইল" বা বিভাজনযোগ্য নয়; এটি "ফার্টাইল")। একে প্রথমে চুল্লিতে ইউরেনিয়াম-২৩৩-এ রূপান্তরিত করতে হয়।
- **পর্যায়ক্রমিক ধাপ (The Sequence):** প্রথম স্তরে প্লুটোনিয়াম জমা করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে সেই প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করে থরিয়ামকে ইউরেনিয়াম-২৩৩-এ "রান্না" বা রূপান্তরিত করা হয়। তৃতীয় স্তরে অবশেষে ইউরেনিয়াম-২৩৩ এবং থরিয়াম পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

বর্তমান প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট এবং নতুন কৌশল

১০০ গিগাওয়াট লক্ষ্য অর্জনে ভারত এখন প্রথাগত তিন-স্তরের পরিকল্পনার বাইরেও বহুমুখী পথ গ্রহণ করছে:

১. **স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMRs):** "প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে" ভবিষ্যৎ ২০২৫-২৬ বাজেটে SMR গবেষণার জন্য ২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
 - **নকশার বৈচিত্র্য:** ভারত পাঁচটি নিজস্ব মডেল তৈরি করছে (৫ মেগাওয়াট, ৫৫ মেগাওয়াট এবং ২০০ মেগাওয়াট)।
 - **শিল্পের সাথে সমন্বয়:** এটি ইস্পাত, সিমেন্ট, পেট্রোকেমিক্যাল এবং ডেটা সেন্টারের মতো ভারী শিল্পগুলোর জন্য তৈরি।
 - **দ্রুত বাস্তবায়ন:** ফ্যাক্টরিতে তৈরি যন্ত্রাংশ ব্যবহারের ফলে নির্মাণ কাজ শুরুর পর মাত্র ৪০ মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।
 - **২২০ মেগাওয়াটের নির্ভরযোগ্য মডেল:** ভারতের নিজস্ব ২২০ মেগাওয়াট PHWR-কে এখন বেসরকারি খাতের ব্যবহারের জন্য নতুনভাবে নকশা করা হচ্ছে।
২. **উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ চুল্লি (The GW Giants)** শিল্পের জন্য SMR থাকলেও, জাতীয় গ্রিডের জন্য ১০০০ মেগাওয়াট+ ক্ষমতার বড় চুল্লি প্রয়োজন।
 - **ফ্লিট মোড অপারেশন:** খরচ কমাতে এবং সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করতে ১০টি ৭০০ মেগাওয়াট PHWR চুল্লির এককালীন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা প্রতি মেগাওয়াট খরচ ২০ লক্ষ ডলারে নামিয়ে আনবে।
 - **বিদেশি প্রযুক্তির দেশীয়করণ:**
 - **জৈতাপুর (ফরাসি EDF):** ১,৬৫০ মেগাওয়াটের ৬টি চুল্লি (EPR নকশা)।
 - **কোভভাদা/মিথি ভির্দি (মার্কিন নকশা):** ওয়েস্টিংহাউস এবং জিই-হিটাচি মডেল।
 - **চ্যালেঞ্জ:** এই বিদেশি নকশাগুলোর খরচ বর্তমানে প্রতি মেগাওয়াটে ৫০ লক্ষ ডলার; ভারতের লক্ষ্য হলো যন্ত্রাংশ দেশেই তৈরি করে এই খরচ ৬০% কমিয়ে ফেলা।
৩. **জ্বালানি প্রযুক্তিতে নতুন উদ্ভাবন**
 - **HALEU (High Assay Low Enriched Uranium):** থরিয়াম ব্যবহারের জন্য HALEU-কে চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা। এর ফলে দ্বিতীয় স্তরের ব্রিডার রিঅ্যাক্টরের অপেক্ষায় না থেকেই ভারত তার থরিয়াম ভাণ্ডার ব্যবহার শুরু করতে পারবে।

- **মোস্টেন-সল্ট রিঅ্যাক্টর (MSR):** তরল জ্বালানি চালিত চুল্লির দিকে ঝুঁকে পড়া, যা অনেক বেশি নিরাপদ (গলে যাওয়ার ভয় নেই) এবং থরিয়াম ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ।

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচির চ্যালেঞ্জসমূহ

১. বিপুল মূলধন এবং অর্থায়ন:

- **খরচের বাধা:** ৯০ গিগাওয়াট ক্ষমতা বাড়াতে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার (১৮ লক্ষ কোটি টাকা) প্রয়োজন।
- **ঝুঁকির বিষয়:** পারমাণবিক প্রকল্পের কাজ শেষ হতে দীর্ঘ সময় (১০-১৫ বছর) লাগে। তাই বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে স্বচ্ছ অর্থায়ন মডেল এবং বিদ্যুতের নির্দিষ্ট দাম (Tariff) ঠিক করা জরুরি।

২. প্রযুক্তির দেশীয়করণ এবং খরচের সমতা:

- **বিদেশি বনাম দেশি:** বিদেশি নকশার খরচ অনেক বেশি। চীনের মতো ভারতকেও সফল হতে হলে বিদেশি চুল্লির যন্ত্রাংশ দেশেই তৈরি করতে হবে যাতে খরচ কমানো যায়।

৩. নিয়ন্ত্রক এবং আইনি জটিলতা:

- **নিয়মকানুন ঘোষণা:** শান্তি (SHANTI) আইন একটি কাঠামো মাত্র; এর সাফল্য নির্ভর করবে জ্বালানির মালিকানা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে দ্রুত নিয়ম জারির ওপর।
- **জমি এবং সুরক্ষা অঞ্চল:** বৃহৎ পারমাণবিক পার্কের নিয়মগুলো পরিবর্তন করতে হবে যাতে ব্যক্তিগত কারখানার ভেতরেও ছোট চুল্লি (SMR) বসানো যায়।

৪. সরবরাহ ব্যবস্থা এবং দক্ষ জনবল:

- **উৎপাদন সক্ষমতা:** বড় পরিসরে কাজ করতে হলে বিশেষায়িত যন্ত্রাংশ তৈরির ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- **দক্ষতার অভাব:** ক্ষমতা ১০ গুণ বাড়াতে হলে সমপরিমাণ দক্ষ পারমাণবিক প্রকৌশলী এবং নিরাপত্তা নিরীক্ষক প্রয়োজন।

৫. জনমত এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে উদ্বেগ:

- **সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা:** নিরাপত্তা এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এখনো ভয় আছে।
- **স্বচ্ছতা:** নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে (AERB) তার নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে হবে যাতে মানুষের আস্থা বজায় থাকে।

৬. জ্বালানি নিরাপত্তা:

- **ইউরেনিয়াম আমদানির ওপর নির্ভরতা:** থরিয়াম থাকলেও প্রাথমিক স্তরে ভারত এখনো ইউরেনিয়ামের ওপর নির্ভরশীল। তাই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর (NSG) সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **দ্রুত নিয়ম জারি:** শান্তি আইনের অধীনে দ্রুত নিয়মকানুন স্পষ্ট করতে হবে যাতে বিনিয়োগকারীরা ভরসা পান।
২. **SMR-এর দ্রুত ব্যবহার:** ভারতের ২২০ মেগাওয়াট চুল্লিকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে শিল্প এলাকায় দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করা।
৩. **বিদেশি নকশার ওপর দক্ষতা অর্জন:** বিদেশি প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ ভারতে তৈরি করে খরচ কমানোর জন্য একটি শক্তিশালী দেশীয় শিল্প গড়ে তোলা।
৪. **থরিয়ামের আগাম ব্যবহার:** HALEU প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০৪৭ সালের মধ্যেই থরিয়াম থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করা।
৫. **নতুন অর্থায়ন মডেল:** সরকারি বাজেটের ওপর নির্ভর না করে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এবং গ্রিন বন্ডের মাধ্যমে টাকা জোগাড় করা।

৬. **নিয়ন্ত্রক সংস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি:** AERB-কে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাতে তারা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপসহীন ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার

শান্তি আইন (২০২৫) ভারতকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বাজার-মুখী পারমাণবিক শক্তির দিকে নিয়ে গেছে। বেসরকারি পুঁজি এবং দেশীয় ছোট চুল্লির (SMR) সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত তার **১০০ গিগাওয়াট** লক্ষ্য এবং **২০৭০ সালের নেট-জিরো** লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

3.4.3. কোয়ান্টাম টেকনোলজি

কোয়ান্টাম টেকনোলজি কী?

কোয়ান্টাম টেকনোলজি হলো এমন এক ধরনের প্রযুক্তি যা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতি ব্যবহার করে কাজ করে। এটি মূলত অতি-ক্ষুদ্র কণা বা উপ-পারমাণবিক কণার (যেমন: পরমাণু, ইলেকট্রন, ফোটন) পদার্থবিজ্ঞান। যেখানে সাধারণ প্রযুক্তি (কম্পিউটার বা মোবাইল) 'বিটস' (০ অথবা ১) এর ওপর ভিত্তি করে চলে, সেখানে কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ব্যবহার করে **কিউবিটস (qubits)**।



কোয়ান্টাম প্রযুক্তির মূল নীতিসমূহ

- **সুপারপজিশন (Superposition):** সাধারণ কম্পিউটিংয়ে একটি বিট হয় ০ অথবা ১ থাকে। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে একটি কিউবিট একই সাথে ০ এবং ১—উভয় অবস্থাতেই থাকতে পারে।
- **এনট্যাঙ্গলমেন্ট (Entanglement):** এটি এমন একটি ঘটনা যেখানে দুটি কণা একে অপরের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে যায় যে, তাদের মধ্যকার দূরত্ব যাই হোক না কেন, একটি কণার অবস্থার পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে অন্যটির ওপর প্রভাব ফেলে। এটি অতি-নিরাপদ যোগাযোগের মূল ভিত্তি।
- **ইন্টারফারেন্স (Interference):** কোয়ান্টাম অবস্থাকে তরঙ্গের মতো বর্ণনা করা যায়। সমুদ্রের তরঙ্গের মতো এরাও একে অপরের সাথে মিশে শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে (কন্সট্রাক্টিভ) অথবা একে অপরকে বাতিল করে দিতে পারে (ডেসট্রাক্টিভ)।

জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন

২০২৩ সালের এপ্রিলে শুরু হওয়া (কার্যকাল ২০২৪-২০৩১) এই **৬,০০০ কোটি টাকার** মিশনের লক্ষ্য হলো ভারতকে **"দ্বিতীয় কোয়ান্টাম বিপ্লবে"** বিশ্বের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী দেশে পরিণত করা।

চারটি প্রধান ক্ষেত্র (T-Hubs)

ভারত এই মিশনের জন্য **'হাব-স্পোক-স্পাইক'** মডেল গ্রহণ করেছে যা চারটি প্রধান ক্ষেত্রের ওপর গুরুত্ব দেয়:

1. **কোয়ান্টাম কম্পিউটিং:** ৫০ থেকে ১০০০ ফিজিক্যাল কিউবিট সম্পন্ন মাঝারি মানের কম্পিউটার তৈরি করা।
2. **কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন:** ২,০০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে একটি প্যান-ইন্ডিয়া নিরাপদ **নেটওয়ার্ক (QKD)** তৈরি করা (যেমন: গ্রাউন্ড স্টেশনের সাথে স্যাটেলাইট-ভিত্তিক যোগাযোগ)।
3. **কোয়ান্টাম সেন্সিং ও মেট্রোলজি:** নিখুঁত সময় এবং দিকনির্ণয়ের জন্য উচ্চ-সংবেদনশীল **ম্যাগনেটোমিটার** এবং **অ্যাটোমিক ক্লক** (পারমাণবিক ঘড়ি) তৈরি করা (যাতে বিদেশের GPS-এর ওপর নির্ভরতা কমে)।
4. **কোয়ান্টাম ম্যাটেরিয়ালস ও ডিভাইস:** কোয়ান্টাম হার্ডওয়্যার তৈরির জন্য **সুপারকন্ডাক্টর** এবং বিশেষ উন্নত পদার্থ সংশ্লেষণ করা।

ক্ষেত্রভিত্তিক কোয়ান্টাম প্রযুক্তির ব্যবহার

১. কৃষি ক্ষেত্র

- **প্রিসিশন ফার্মিং (Precision Farming):** কোয়ান্টাম সেন্সর ব্যবহার করে রিয়েল-টাইমে মাটির স্বাস্থ্য, আর্দ্রতা এবং ফসলের বৃদ্ধির ধরণ বিশ্লেষণ করা।
- **আবহাওয়ার পূর্বাভাস:** বায়ুমণ্ডলের জটিল পরিবর্তনগুলো সিমুলেশন বা কৃত্রিমভাবে তৈরি করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বৃষ্টি, বন্যা বা খরা সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা প্রদান করা।

২. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা

- **ঔষধ আবিষ্কার (Drug Discovery):** আণবিক ও পারমাণবিক স্তরের আচরণ বিশ্লেষণ করে অ্যালঝাইমার বা ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের কার্যকর ঔষধ তৈরি করা।
- **জিনোমিক্স (Genomics):** ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা বা জিন থেরাপির জন্য বিশাল পরিমাণ জিনোম ডেটা দ্রুত বিশ্লেষণ করা।
- **মেডিক্যাল ইমেজিং:** মস্তিষ্ক এবং হৃদপিণ্ডের উচ্চ-মানের ইমেজিংয়ের জন্য কোয়ান্টাম SQUIDS ব্যবহার করা।

৩. অর্থসংস্থান (Finance)

- **অভ্যেদ্য এনক্রিপশন:** ব্যাংকিং লেনদেন এবং সংবেদনশীল আর্থিক তথ্য সাইবার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে কোয়ান্টাম কী ডিস্ট্রিবিউশন (QKD) ব্যবহার করা।
- **হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং:** শেয়ার বাজারের বিশাল পরিমাণ ডেটা একসাথে প্রসেসিং করে দ্রুততম সময়ে লেনদেন সম্পন্ন করা।

৪. প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা

- **সাবমেরিন শনাক্তকরণ:** সাধারণ সোনার (sonar) পদ্ধতি এড়িয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অভিকর্ষজ পরিবর্তন পরিমাপের মাধ্যমে পানির নিচের সাবমেরিন বা যুদ্ধজাহাজ শনাক্ত করা।
- **নিরাপদ যোগাযোগ:** সামরিক নির্দেশের জন্য এমন "কোয়ান্টাম চ্যানেল" তৈরি করা যা আড়িপাতা বা হ্যাক করা অসম্ভব।
- **GPS-বিহীন নেভিগেশন:** যখন স্যাটেলাইট সিগন্যাল জ্যাম করে দেওয়া হয়, তখন নিখুঁতভাবে দিকনির্ণয়ের জন্য উন্নত পারমাণবিক ঘড়ি ও কোয়ান্টাম কম্পাস ব্যবহার করা।

৫. পরিবেশ ও স্থায়িত্ব

- **ব্যাটারি প্রযুক্তি:** ইলেকট্রিক ভেহিকল (EV)-এর জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন এবং দ্রুত চার্জিংযোগ্য সলিড-স্টেট ব্যাটারি তৈরির জন্য নতুন রাসায়নিক কাঠামো নিয়ে গবেষণা করা।
- **গ্রিড ম্যানেজমেন্ট:** অপচয় কমাতে স্মার্ট গ্রিডের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির বন্টন ব্যবস্থা উন্নত করা।

কোয়ান্টাম প্রযুক্তির জন্য সরকারি উদ্যোগ

১. **জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন (NQM):** এটি একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প (৬,০০০ কোটি টাকা), যার মাধ্যমে কম্পিউটিং, যোগাযোগ, সেন্সিং এবং উপাদানের ওপর গবেষণার নেতৃত্ব দিতে প্রধান আইআইটি (IIT) এবং আইআইএসসি (IISc)-তে চারটি থিম্যাটিক হাব (T-Hubs) স্থাপন করা হয়েছে।
২. **কোয়ান্টাম সেফ ইকোসিস্টেম টাস্ক ফোর্স:** ডিএসটি (DST) পরিচালিত এই উদ্যোগটি ভারতের ব্যাংকিং এবং প্রতিরক্ষা তথ্যকে ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম হুমকি থেকে রক্ষা করতে পোস্ট-কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি (PQC)-তে স্থানান্তরের ওপর গুরুত্ব দেয়।
৩. **মিলিটারি কোয়ান্টাম ফ্রেমওয়ার্ক:** সিডিএস (CDS) পরিচালিত একটি নীতি, যা সামরিক ও বেসামরিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটায়। এটি মূলত পানির নিচে সাবমেরিন শনাক্তকরণ, যুদ্ধক্ষেত্রে নিরাপদ যোগাযোগ এবং জিপিএস (GPS)-বিহীন নেভিগেশন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেয়।

৪. **MeitY-AWS কোয়ান্টাম ল্যাব (QCAL):** এটি একটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব যা ক্লাউড-ভিত্তিক কোয়ান্টাম অ্যাক্সেস প্রদান করে। এর ফলে স্টার্টআপগুলো চড়া দামে হার্ডওয়্যার না কিনেই কৃষি ও স্বাস্থ্যসেবার সমাধান তৈরি করতে পারছে।
৫. **আই-হাব কোয়ান্টাম টেকনোলজি ফাউন্ডেশন:** আইআইএসআইআর (IISER) পুনেতে অবস্থিত এই মিশনটি স্টার্টআপ ইনকিউবেশন এবং কোয়ান্টাম ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বিশেষ "চাণক্য ফেলোশিপ" প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে।

কোয়ান্টাম প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ বা বাধাসমূহ

- **পরিবেশগত সংবেদনশীলতা (Decoherence):** কিউবিটস (Qubits) অত্যন্ত নাজুক; তাপ বা কম্পনের মতো সামান্য বাহ্যিক 'শব্দ' এদের কোয়ান্টাম অবস্থা নষ্ট করে দেয়। তাই একটি স্থিতিশীল ও ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা তৈরি করা একটি বিশাল প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ।
- **ক্রায়োজেনিক সীমাবদ্ধতা:** বেশিরভাগ কোয়ান্টাম প্রসেসরের কাজ করার জন্য **পরম শূন্য তাপমাত্রার (~০.০১৫ K)** কাছাকাছি ঠান্ডা প্রয়োজন। ডাইলুশন রেফ্রিজারেটরের মাধ্যমে এই অবস্থা বজায় রাখা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং শিল্প ক্ষেত্রে বড় আকারে এটি ব্যবহার করা কঠিন।
- **"কিউ-ডে" (Q-Day) নিরাপত্তা হুমকি:** আসন্ন "কিউ-ডে"—যখন কোয়ান্টাম কম্পিউটার বর্তমানের আরএসএ/এইএস (RSA/AES) এনক্রিপশন ভেঙে ফেলতে পারবে। এর ফলে "স্টোর নাও, ডিক্রিপ্ট লেটার" (SNDL) আক্রমণ রোধ করতে দ্রুত এবং ব্যয়বহুল উপায়ে **পোস্ট-কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি (PQC)**-তে স্থানান্তর প্রয়োজন।
- **সরবরাহ শৃঙ্খলের ওপর নির্ভরতা:** কোয়ান্টাম হার্ডওয়্যার (যেমন: উচ্চ-বিশুদ্ধতার হীরা, লেজার) তৈরির জন্য ভারতের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। আমদানির ওপর এই নির্ভরতা গভীর প্রযুক্তিতে 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
- **দক্ষ জনশক্তির অভাব:** তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক প্রকৌশলের মধ্যে একটি বড় "কোয়ান্টাম ট্যালেন্ট গ্যাপ" রয়েছে। গবেষণাগারের গবেষণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ভারতের প্রচুর দক্ষ কোয়ান্টাম ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন।
- **শাসন কাঠামো ও নৈতিক ব্যবধান:** বিশ্বব্যাপী কোনো নিয়ন্ত্রক কাঠামো না থাকায় দেশগুলোর মধ্যে একটি "কোয়ান্টাম ডিভাইড" বা বৈষম্য তৈরির ঝুঁকি থাকে। এছাড়া উন্নত অস্ত্র তৈরিতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে নৈতিক উদ্বেগও রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **গবেষণাগার থেকে বাজারজাতকরণ:** সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) শক্তিশালী করা এবং ডিপ-টেক স্টার্টআপগুলোকে উৎসাহিত করা যাতে তারা টি-হাবের (T-Hubs) তাত্ত্বিক গবেষণাকে বাণিজ্যিক হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারে রূপান্তর করতে পারে।
- **নিজস্ব সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি:** কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে ক্রায়োজেনিক সিস্টেম, বিশেষ লেজার এবং উচ্চ-বিশুদ্ধ উপকরণের দেশীয় উৎপাদনের ওপর বিনিয়োগ করে আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো।
- **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কোয়ান্টাম বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা এবং চাণক্য ফেলোশিপ প্রোগ্রামের পরিধি বাড়ানো যাতে প্রকৌশলী ও ডেটা সায়েন্টিস্টদের একটি "কোয়ান্টাম-প্রস্তুত" জনবল তৈরি হয়।
- **কোয়ান্টাম-নিরাপদ স্থিতিশীলতা ত্বরান্বিত করা:** ব্যাংকিং, পাওয়ার গ্রিড এবং আধারের [আধার নম্বরটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি] মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অবকাঠামোকে দ্রুত **পোস্ট-কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি (PQC)**-তে স্থানান্তরিত করা।
- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নৈতিকতা:** বিশ্বব্যাপী "কোয়ান্টাম ডিপ্লোমাসি" বা কূটনীতিতে অংশ নেওয়া যাতে এই প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারের মানদণ্ড নির্ধারণ করা যায় এবং আইসিইটি (iCET)-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারতের অবস্থান নিশ্চিত করা যায়।

উপসংহার

ভারতের 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' রূপকল্পের জন্য কোয়ান্টাম প্রযুক্তি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। এর সাফল্য নির্ভর করছে গবেষণাগার থেকে প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ, ডিজিটাল অবকাঠামো সুরক্ষিত করা এবং দেশীয় হার্ডওয়্যার উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর, যা ভারতের প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

Q. "The National Quantum Mission (NQM) is not merely a scientific pursuit but a strategic necessity for India's technological sovereignty." Critically analyze the statement in light of the 'Second Quantum Revolution'. 15 Marks

3.5. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

3.5.1. ভারতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

ভারত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি প্রতিক্রিয়াশীল (ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নেওয়া) মডেল থেকে সরে এসে একটি প্রো-অ্যাক্টিভ বা অগ্রিম সতর্কতামূলক এবং প্রশমন-কেন্দ্রিক মডেলে রূপান্তরিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫ এবং সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক (Sendai Framework) দ্বারা পরিচালিত এই ব্যবস্থাটি ক্রমবর্ধমান ভূ-তাত্ত্বিক এবং জলবায়ুগত বিপদ মোকাবিলায় একটি জলবায়ু-সহনশীল জাতি গঠনের জন্য প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিকেন্দ্রীকরণকে একত্রিত করে।



প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো

১. সংবিধিবদ্ধ ভিত্তি: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫

- **আদেশ:** এটি "দুর্যোগ"-এর সংজ্ঞা দেয় এবং জাতীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরে বিশেষায়িত সংস্থা গঠনের পথ প্রশস্ত করে।
- **পরিবর্তন:** এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে **ত্রাণ-কেন্দ্রিক** (দুর্যোগ পরবর্তী) পদ্ধতি থেকে একটি **অগ্রিম প্রশমন** (দুর্যোগ পূর্ববর্তী) পদ্ধতিতে নিয়ে গেছে।

২. ত্রি-স্তরীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

স্তর	কর্তৃপক্ষ	প্রধান/চেয়ারপারসন	মূল দায়িত্ব
জাতীয়	NDMA	প্রধানমন্ত্রী	জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা তৈরি করা।
রাজ্য	SDMA	মুখ্যমন্ত্রী	রাজ্য-স্তরের বাস্তবায়ন এবং তহবিলের সমন্বয় করা।
জেলা	DDMA	জেলা শাসক (DM)/কালেক্টর	মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন; জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা।

৩. নির্বাহী ও কার্যকরী শাখা

- **NEC (National Executive Committee):** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে এটি গঠিত; এটি নীতি বাস্তবায়নে NDMA-কে সহায়তা করে।
- **NDRF (National Disaster Response Force):** একটি বিশেষায়িত বহুমুখী বাহিনী যা জরুরি অবস্থায় অগ্রিম মোতায়েনের জন্য কাজ করে।
- **NIDM (National Institute of Disaster Management):** এটি সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রধান সংস্থা।

৪. আর্থিক কাঠামো (১৬তম অর্থ কমিশনের আপডেট)

- **ঝুঁকি অর্থায়ন:** NDRM (National Disaster Risk Management Fund) গঠন করা হয়েছে, যা দুই ভাগে বিভক্ত:
 - **সাড়া দান তহবিল (Response Fund - NDRF/SDRF):** তাৎক্ষণিক ত্রাণের জন্য।
 - **প্রশমন তহবিল (Mitigation Fund - NDMF/SDMF):** দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি হ্রাসের জন্য (যেমন- বাঁধ নির্মাণ)।
- **১৬তম অর্থ কমিশনের (16th FC) পরিবর্তন:** তহবিল এখন শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ব্যয়ের পরিবর্তে **দুর্যোগ ঝুঁকি সূচক (Disaster Risk Index - DRI)**-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

৫. নির্দিষ্ট দুর্যোগের জন্য নোডাল বা প্রধান মন্ত্রণালয়

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MHA)।
- **খরা:** কৃষি মন্ত্রণালয়।
- **রাসায়নিক/শিল্প:** পরিবেশ মন্ত্রণালয় (MoEFCC)।
- **জৈবিক:** স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (MoHFW)।
- **রেল দুর্ঘটনা:** রেল মন্ত্রণালয়।

১৬তম অর্থ কমিশন (২০২৬-৩১) এবং ঝুঁকি অর্থায়ন

১. ঝুঁকি-ভিত্তিক বরাদ্দে রূপান্তর

- **দুর্যোগ ঝুঁকি সূচক (DRI):** প্রথমবারের মতো, শুধুমাত্র অতীতের ব্যয়ের পরিবর্তে একটি রাজ্যের নির্দিষ্ট ঝুঁকি প্রোফাইলের ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **সূত্র (Formula):** বরাদ্দ এখন **বিপদ (তীব্রতা)**, **এক্সপোজার** (বিপদে থাকা জনসংখ্যা/সম্পদ) এবং **ভেদ্যতা বা দুর্বলতা** (সামাজিক-অর্থনৈতিক সক্ষমতা)-কে বিবেচনা করে।
- **উদ্দেশ্য:** ওড়িশা বা হিমাচল প্রদেশের মতো উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকি সম্পন্ন রাজ্যগুলো যেন বৃহৎ কিন্তু কম ঝুঁকিপূর্ণ রাজ্যের তুলনায় আনুপাতিক সহায়তা পায়।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের কাঠামো

১৫তম অর্থ কমিশনের উদাহরণ অনুসরণ করে, ১৬তম অর্থ কমিশনও **জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল (NDRMF)** এবং **রাজ্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল (SDRMF)**-কে দুটি ভাগে ভাগ করেছে:

১. **সাড়া দান তহবিল (Response Fund - ৮০%):**
 - **সাড়া দান ও ত্রাণ (৭০%):** দুর্যোগ পরবর্তী তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য।
 - **পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন (৩০%):** দুর্যোগের পরে পুনরায় গড়ে তোলার জন্য।
২. **প্রশমন তহবিল (Mitigation Fund - ২০%):** এটি কঠোরভাবে দুর্যোগ-পূর্ববর্তী অবকাঠামোগত ব্যবস্থার (যেমন- সমুদ্রের বাঁধ, আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা) জন্য সংরক্ষিত।

প্রধান দুর্যোগের ধরন এবং প্রশমন কৌশল

ক. জলজ দুর্যোগ: বন্যা এবং শহুরে বন্যা

- **দুর্বলতা:** ভারতের ১২% ভূখণ্ড বন্যাপ্রবণ।
- **২০২৬ প্রেক্ষাপট:** কলকাতায় সাম্প্রতিক মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং উত্তরাখণ্ডে আকস্মিক বন্যা (আগস্ট ২০২৫) "যৌগিক দুর্যোগের" ক্রমবর্ধমান প্রকোপকে তুলে ধরে।
- **প্রশমন:**

- স্পঞ্জ সিটি কনসেপ্ট (Sponge City): বৃষ্টির জল শোষণের জন্য প্রবেশযোগ্য মাটির উপরিভাগ বাড়ানো।
- ভুবান পোর্টাল (Bhuvan Portal): রিয়েল-টাইম বন্যার মানচিত্র তৈরির জন্য ইসরো (ISRO)-র স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার।

খ. ভূ-তাত্ত্বিক দুর্যোগ: ভূমিকম্প এবং ভূমিধস

- দুর্বলতা: ৫৯% এলাকা ভূমিকম্পপ্রবণ (জোন ৫ - হিমালয় অঞ্চল)।
- প্রশমন:
 - সিসমিক মাইক্রো-জোন্যাশন: শহুরে এলাকার (যেমন দিল্লি, গুয়াহাটি) বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি।
 - কোটি বানাল স্থাপত্য (Koti Banal): হিমালয়ে ঐতিহ্যবাহী ভূমিকম্প-সহনশীল নির্মাণ কৌশলের পুনরুজ্জীবন।

গ. জলবায়ুগত দুর্যোগ: তাপপ্রবাহ এবং বজ্রপাত

- চ্যালেঞ্জ: বজ্রপাত এখন ভারতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর প্রধান কারণ (৩৬% মৃত্যু)।
- প্রশমন:
 - সচেত পোর্টাল (Sachet Portal): নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় এসএমএস সতর্কবার্তা পাঠানোর জন্য একটি সাধারণ প্রোটোকল।
 - হিট অ্যাকশন প্ল্যান (HAPs): শহরের 'হিট আইল্যান্ড' মোকাবিলায় "কুল রুফ" নীতি এবং "গ্রিন করিডোর" বাস্তবায়ন।

বৈশ্বিক ফ্রেমওয়ার্ক: সেনদাই থেকে CDRI

১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক (২০১৫-২০৩০) বৈশ্বিক দুর্যোগ নীতির প্রধান ভিত্তি হলো সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক। এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করে।
 - ৪টি প্রধান অগ্রাধিকার:
 - দুর্যোগের ঝুঁকি সঠিকভাবে বোঝা।
 - দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
 - দুর্যোগ সহনশীলতা বাড়াতে বিনিয়োগ করা (কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত)।
 - কার্যকর সাড়াদানের জন্য প্রস্তুতি বাড়ানো এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে "Build Back Better" (আগের চেয়ে ভালো করে গড়ে তোলা) নীতি অনুসরণ করা।
 - ৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা: ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগে মৃত্যুহার, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা, অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা।
২. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সমন্বয় ২০৩০ সালের উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে দুর্যোগ সহনশীলতা গভীরভাবে যুক্ত:
 - SDG ১ এবং ১১: দরিদ্র মানুষকে জলবায়ুজনিত চরম বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং শহরগুলোকে সহনশীল করে গড়ে তোলা।
 - SDG ১৩: জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া।
৩. প্যারিস চুক্তি (COP21) এটি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত "ক্ষতি ও লোকসান" (Loss and Damage)-কে স্বীকৃতি দেয়। ভারতের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAPCC) বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং অভিযোজন লক্ষ্যের সাথে দুর্যোগ প্রশমনকে একীভূত করে।
৪. CDRI (দুর্যোগ সহনশীল পরিকাঠামোর জন্য জোট) ২০১৯ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু পদক্ষেপ সম্মেলনে ভারতের নেতৃত্বে এটি চালু হয়। এটি সরকার এবং জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।
 - মূল লক্ষ্য: বিদ্যুৎ, টেলিকম, পরিবহন এবং স্বাস্থ্যের মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগুলো যেন জলবায়ুর চরম ধাক্কা সহ্য করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

- **প্রধান উদ্যোগ:** IRIS (Infrastructure for Resilient Island States), যা মূলত ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর (SIDS) বিশেষ ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করে।

ভারতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জসমূহ

১. প্রাতিষ্ঠানিক ও সমন্বয়হীনতা

- **"শেষ মাইলের" ঘাটতি (Last Mile Deficit):** যদিও NDMA এবং SDMA-গুলোতে যথেষ্ট ফান্ড থাকে, কিন্তু জেলা পর্যায়ের DDMA-গুলোতে অনেক সময় দক্ষ কর্মী এবং জটিল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কারিগরি জ্ঞানের অভাব দেখা যায়।
- **তথ্য আদান-প্রদানে বাধা (Data Silos):** কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর (IMD, CWC, ISRO) মধ্যে রিয়েল-টাইম তথ্য শেয়ারিং-এর অভাবে স্থানীয় উদ্ধারকারীদের কাছে সঠিক সময়ে খবর পৌঁছাতে দেরি হয়।

২. আর্থিক চ্যালেঞ্জ (১৬তম অর্থ কমিশন পরবর্তী)

- **তহবিলের অসঙ্গতি:** ১৬তম অর্থ কমিশন ঝুঁকির পরিমাপ হিসেবে "মোট জনসংখ্যা"-কে গুরুত্ব দিয়েছে। এতে ওড়িশার মতো রাজ্যগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে কিন্তু ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়।
- **প্রশমন তহবিলের অপব্যবহার:** রাজ্যগুলো প্রায়ই দুর্যোগ মোকাবিলা বা ত্রাণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয় এবং ২০% প্রশমন তহবিলের (Mitigation Fund) সঠিক ব্যবহার করে না। তারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিনিয়োগের পরিবর্তে কেবল জরুরি খরচ হিসেবে দেখে।

৩. নতুন জলবায়ু বিপদসমূহ

- **"নীরব ষাতক":** বর্তমানে ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে তাপপ্রবাহ এবং বজ্রপাতে বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। তা সত্ত্বেও জাতীয়ভাবে এগুলোর শ্রেণিবিন্যাস এবং ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে।
- **শহরে বন্যা:** অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং প্রাকৃতিক জলধারা বা জলাভূমি ধ্বংস হওয়ার ফলে বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়ের মতো শহরগুলো উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

৪. পরিকাঠামো ও কারিগরি ঘাটতি

- **মানদণ্ডের অভাব:** ভবন নির্মাণের সঠিক নিয়মাবলী এবং BIS সিসমিক কোড (ভূমিকম্প সহনশীল নিয়ম) কঠোরভাবে মেনে না চলায় শহরে পরিকাঠামো ভূমিকম্পের মুখে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
- **রক্ষণাবেক্ষণ:** পুরনো বাঁধ এবং নদীবাঁধগুলো (যেমন- মুন্সীগঞ্জের বাঁধ নিয়ে উদ্বেগ) যে কোনো সময় ভেঙে গিয়ে বিশাল বন্যার ঝুঁকি তৈরি করছে।

৫. সামাজিক-অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা

- **দরিদ্রদের ঝুঁকি:** দুর্যোগের প্রভাব বস্তি বা নিচু এলাকায় বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি পড়ে। তাদের পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর মতো বিমা বা পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে না।
- **দেশীয় জ্ঞানের অবক্ষয়:** আধুনিক কংক্রিট-নির্ভর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চক্রের আমাদের ঐতিহ্যবাহী এবং পরিবেশ-বান্ধব দুর্যোগ সহনশীল পদ্ধতিগুলো (যেমন- হিমালয়ের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য) হারিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথ

১. **উন্নয়নে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR)-কে মূলধারায় আনা** প্রতিটি পরিকাঠামো প্রকল্পে (মহাসড়ক, স্মার্ট সিটি) বাধ্যতামূলক দুর্যোগ ঝুঁকি অডিট করতে হবে। "যে কোনো মূল্যে উন্নয়ন" থেকে সরে এসে "সহনশীল পরিকাঠামো" (CDRI মানদণ্ড) নিশ্চিত করতে হবে যাতে চরম দুর্যোগেও স্কুল, হাসপাতাল এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল থাকে।
২. **স্থানীয় প্রশাসন ও জননেতৃত্বকে শক্তিশালী করা** জেলা পর্যায়ের DDMA-গুলোকে কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। "আপদা মিত্র"-র মতো জনমুখী উদ্যোগগুলো আরও বাড়াতে হবে যাতে পেশাদার সাহায্য পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় মানুষ "গোয়েদার আওয়ার" বা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

৩. "প্রভাব-ভিত্তিক" আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা (EWS) শুধু "আবহাওয়া কেমন থাকবে" তা না জানিয়ে আবহাওয়া "কী ক্ষতি করতে পারে" সেই তথ্য প্রদান করতে হবে (যেমন- সচেতন পোর্টাল)। AI, মেশিন লার্নিং এবং ইসরো (ISRO)-র ডেটা ব্যবহার করে একদম স্থানীয় পর্যায়ে নির্ভুল সতর্কবার্তা দিতে হবে যাতে মানুষ জানে তাদের ঠিক কী পদক্ষেপ নিতে হবে।
৪. প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (NbS) এবং ব্লু-গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার শহরগুলোতে জলাভূমি এবং ম্যানগ্রোভ রক্ষার মাধ্যমে "স্পঞ্জ সিটি" ধারণা গ্রহণ করতে হবে। কংক্রিটের দেয়ালের চেয়ে প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (যেমন- বায়ো-শিল্ড বা প্রাকৃতিক রক্ষা কবচ) বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় অনেক বেশি সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী।
৫. ঝুঁকি অর্থায়নের ফাঁক পূরণ করা সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি বিমা ব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে সরকারের ওপর আর্থিক চাপ কমে। ১৬তম অর্থ কমিশনের প্রশমন তহবিল (SDMF) কঠোরভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধের কাজে ব্যবহার করতে হবে যাতে "দুর্যোগ-ত্রাণ-পুনরাবৃত্তি"-র এই চক্র ভেঙে ফেলা যায়।

উপসংহার

১৬তম অর্থ কমিশনের সহায়তায় ভারতের একটি ঝুঁকি-সচেতন এবং প্রযুক্তি-নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলে রূপান্তর টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় স্তরের প্রতিকার ক্ষমতা ও জনসাধারণের সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই এই ব্যবস্থার প্রকৃত সাফল্য আসবে।

Q. Discuss the recent measures initiated in disaster management by the Government of India departing from the earlier reactive approach. (150 Words)

Scan to attempt more questions...



IAS 2-YEAR GS Prelims Cum Mains

Classroom/LIVE Online Foundation Programme For UPSC CSE-2028

- Complete GS coverage for Prelims & Mains from Basics to Advance
- 1,400+ hours of classes in Kolkata by top Delhi faculty
- Expert in-house mentors trained in Delhi
- Weekly tests with faculty-led discussions
- Exam-oriented study material with PYQ focus

Delhi UPSC Classroom
Now in **Kolkata**



সাধারণ অধ্যয়ন ৪

4.1. নীতিশাস্ত্র

4.1.1. সম্মতির উদ্দেশ্য: ক্ষমতা, আইনি অসম্পষ্টতা এবং নির্যাতনের নৈতিক মাত্রা

ভূমিকা

- সম্মতি (Consent), যাকে প্রায়শই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হয়, তা ক্ষমতার অসাম্য (Power asymmetry) এবং অসহায়ত্বের (Vulnerability) উপস্থিতিতে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। যখন একজন ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন (Autonomy) প্রভাব, নির্ভরতা এবং সামাজিক কন্ডিশনিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন "পছন্দ" বা "চয়েস" (Choice)-এর ধারণাটি নিজেই অস্পষ্ট হয়ে যায়।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের বর্ণনা এবং দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে যে, নির্যাতন (Abuse) কেবল একটি ব্যক্তিগত কাজ নয়, বরং এটি একটি পদ্ধতিগত অবস্থা (Systemic condition)—যা ক্ষমতার কাঠামো, আইনি শূন্যতা (Legal gaps) এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে টিকে থাকে। সুতরাং, নৈতিক প্রশ্নটি কেবল 'সম্মতি দেওয়া হয়েছিল কি না' তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রশ্নটি হলো সেই সম্মতি আদৌ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন (Truly free) ছিল কি না।



বৈধ সম্মতির স্তম্ভসমূহ

১. সম্মতি বনাম স্বাধীন ইচ্ছা (স্বায়ত্তশাসনের নীতিশাস্ত্র)

A. নৈতিক ভিত্তি (কান্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি):

- সম্মতি কেবল তখনই নৈতিকভাবে বৈধ যখন তা প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের (Genuine autonomy) ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
- ব্যক্তিদের সর্বদা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (Ends in themselves) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কেবল নিজের তুষ্টির উপায় (Means) হিসেবে নয়।

B. প্রকৃত সম্মতির শর্তাবলি:

- তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Informed decision-making): যা ফলাফল এবং ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে।
- যৌক্তিক ক্ষমতা (Rational capacity): যা স্বাধীন এবং পক্ষপাতহীন চিন্তাভাবনা নিশ্চিত করে।
- আবেগীয় পরিপক্বতা (Emotional maturity): যা সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা দেয়।
- জবরদস্তির অনুপস্থিতি (Absence of coercion): যা চাপ, ভয় বা প্রভাব থেকে মুক্তি নিশ্চিত করে।

C. ক্ষমতার ভারসাম্যহীন সম্পর্কে সম্মতির লঙ্ঘন:

- বয়সের ব্যবধান: এটি জ্ঞানীয় এবং আবেগীয় পরিপক্বতাকে সীমিত করে।
- ক্ষমতার অসাম্য (Power asymmetry): কর্তৃত্ব, প্রভাব বা নির্ভরতা পছন্দের অধিকারকে সংকুচিত করে।
- সম্মতিকে প্রভাবিতকারী মনস্তাত্ত্বিক কারণ:
 - ভয়: ক্ষতি বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আতঙ্ক।
 - শ্রদ্ধা: কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিদের আদর্শ হিসেবে কল্পনা করা।
 - বৈধতার আকাঙ্ক্ষা: অনুমোদনের তীব্র প্রয়োজন।

- আবেগীয়/অর্থনৈতিক নির্ভরতা: প্রত্যাখ্যান করার অক্ষমতা।

২. সম্মতি-জবরদস্তি ধারাবাহিকতা (Consent-Coercion Continuum)

A. দৈত ধারণার উদ্দেশ্য:

- সম্পর্কগুলোকে কঠোরভাবে 'সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে' বা 'সম্পূর্ণ জবরদস্তিমূলক'—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় না।
- এর পরিবর্তে, এগুলি একটি ধারাবাহিকতা বা কন্টিনুয়াম (Continuum)-এর ওপর অবস্থান করে, যেখানে প্রভাব, চাপ এবং ক্ষমতার বিভিন্ন মাত্রা ব্যক্তিগত পছন্দকে প্রভাবিত করে।
- এই ক্ষেত্রে, যা সম্মতি বলে মনে হয় তা আসলে আংশিক প্রভাবিত বা সীমাবদ্ধ হতে পারে।

B. সূক্ষ্ম জবরদস্তির কৌশল:

- শোষণের স্বাভাবিকীকরণ (Normalization of exploitation): ক্ষমতালী ব্যক্তি ধীরে ধীরে বিশ্বাস গড়ে তোলেন এবং সময়ের সাথে সাথে অনুপযুক্ত আচরণকে এমনভাবে প্রবর্তন করেন যা স্বাভাবিক বলে মনে হয়।
- আবেগীয় নির্ভরতা: ভুক্তভোগী মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ফলে বিচ্ছেদ বা প্রত্যাখ্যানের ভয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।
- মনস্তাত্ত্বিক কন্ডিশনিং: ক্রমাগত প্রভাবের ফলে ব্যক্তির উপলব্ধি পরিবর্তিত হয়, যা যত্ন এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যবর্তী পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে দেয়।

স্বাধীন ইচ্ছা এবং সম্মতির দর্শন

১. নির্ধারণবাদ (Determinism): এই মতানুসারে মানুষের কাজ জীববিদ্যা, লালন-পালন এবং সামাজিক পরিবেশ দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। ব্যক্তি মনে করতে পারে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণ দ্বারা প্রভাবিত।
২. লিবার্টারিয়ানিজম (Libertarianism): এটি বিশ্বাস করে যে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা এবং এজেন্সি (Agency) আছে। এটি বেশিরভাগ আইনি ব্যবস্থার (Legal systems) ভিত্তি, যা ধরে নেয় যে সম্মতি দিলে ব্যক্তি তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ।
৩. কমপ্যাটিবিলিজম (Compatibilism): এটি একটি মধ্যপথ, যা বলে যে স্বাধীন ইচ্ছা এবং বাহ্যিক প্রভাব সহাবস্থান করতে পারে। যতক্ষণ কোনো সরাসরি জবরদস্তি নেই, ততক্ষণ সিদ্ধান্তকে "স্বাধীন" বলা যেতে পারে।

সম্মতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. কাঠামোগত ক্ষমতার বৈষম্য (সীমিত পছন্দ): বয়স বা অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া শ্রেণিবিন্যাস স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে সীমিত করে। এখানে সম্মতি প্রকৃত স্বৈচ্ছামূলক না হয়ে পরিস্থিতিগত (Situational) হয়ে পড়ে।
২. আইনি অস্পষ্টতা (শোষণযোগ্য ধূসর এলাকা): সম্মতির বয়সের বিভিন্নতা এবং অভিন্ন আইনি মানদণ্ডের অভাব আইনি ফাঁকফোকর (Loopholes) তৈরি করে, যা অপরাধীরা শোষণের কাজে ব্যবহার করে।
৩. সামাজিক কন্ডিশনিং (শোষণের স্বাভাবিকীকরণ): সাংস্কৃতিক আখ্যানগুলো অনেক সময় অসম সম্পর্ককে রোমান্টিক করে তোলে, যা ব্যক্তির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
৪. মনস্তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা (পছন্দের বিকৃত উপলব্ধি): আবেগীয় নির্ভরতা বা গ্রুপিং (Grooming) সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। ভুক্তভোগীরা অনেক সময় নিয়ন্ত্রণকে নিজেদের ইচ্ছা বলে ভুল করে।
৫. প্রাতিষ্ঠানিক এবং নৈতিক ব্যর্থতা (দুর্বল সুরক্ষা কবচ): জবাবদিহিতার অভাব এবং প্রতিষ্ঠানের সহমর্মিতাহীন আচরণ দুর্বল ব্যক্তিদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, যা প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা এবং তথ্যসমৃদ্ধ সম্মতির (Informed consent) শর্তাবলিকে ধ্বংস করে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: স্বাধীন ইচ্ছা এবং নৈতিক সম্মতির শক্তিশালীকরণ

১. স্বচ্ছতা ও সুরক্ষার জন্য আইনি সংস্কার:

- বিভিন্ন বিচারব্যবস্থার মধ্যে সম্মতির বয়সের (Age of consent) আইনি সামঞ্জস্য বিধান করা।
- শোষণে সহায়তা করে এমন আইনি ফাঁকফোকরগুলি (Legal loopholes) বন্ধ করা।
- সংবেদনশীলতা এবং সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে ভুক্তভোগী-বান্ধব বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা:

- উচ্চপদস্থ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য কঠোর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কর্মক্ষেত্র, সরকারি অফিস) সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি (Codes of conduct) প্রণয়ন।
- আইন ও বিধি কার্যকর হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন তদারকি সংস্থা গঠন।

৩. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে নৈতিক শাসন (Ethical Governance):

- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সততা (Integrity) এবং নীতিপরায়ণতা (Probity) শক্তিশালী করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ওপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও দায়ভার অর্পণ করা।

৪. দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক রীতিনীতির রূপান্তর:

- গ্রুমিং (Grooming), নির্যাতন এবং ক্ষমতার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা।
- বৈষম্যমূলক সম্পর্কে স্বাভাবিক করে তোলে এমন সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানো।
- শিক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা (Gender sensitivity) এবং নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৫. মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধের প্রসার:

- সততা (Integrity): ক্ষমতার নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার।
- সহমর্মিতা (Empathy): ভুক্তভোগীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণাকে অনুধাবন করা।
- করুণা (Compassion): মানসিকভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা প্রদান করা।
- ন্যায়বিচার (Justice): সবার জন্য মর্যাদা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা।
- দায়িত্বশীলতা (Responsibility): প্রভাবশালীদের তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করা।

উপসংহার

সম্মতি সংক্রান্ত আলোচনাটি এটিই স্পষ্ট করে যে, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার প্রেক্ষাপটে সম্মতিকে কেবল একটি একক নৈতিক বা আইনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। সম্মতির মূল্যায়ন অবশ্যই স্বায়ত্তশাসন (Autonomy), মর্যাদা (Dignity) এবং ন্যায়বিচারের (Justice) বৃহত্তর নৈতিক কাঠামোর মধ্যে করতে হবে।

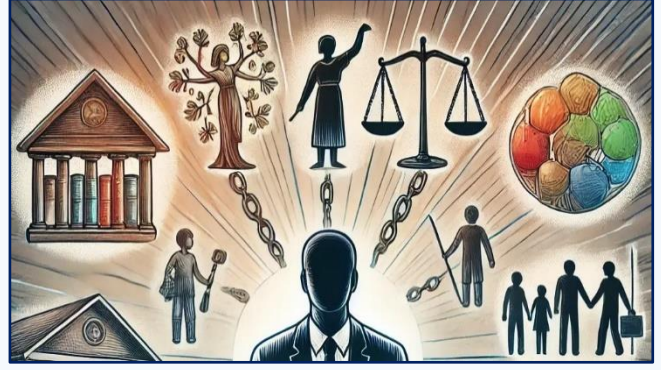
একটি সমাজ যখন নৈতিক শাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তখন তাকে কেবল এই প্রশ্নটি করলেই চলে না যে “সেখানে কি সম্মতি ছিল?” বরং তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে “সেই সম্মতির পেছনে কি প্রকৃত স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদা ছিল?” চূড়ান্তভাবে, দুর্বলকে সুরক্ষা দেওয়া এবং প্রভাবশালীদের নৈতিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাই হলো ন্যায়বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি।

Q. Consent is meaningful only when it is free from power, coercion, and structural inequalities. In the light of this statement, examine the ethical limitations of consent in power-imbalanced relationships.
150 Word

4.1.2. আধুনিক রাজনীতিতে নৈতিক বৈধতার সংকট

ধ্রুপদী ভিত্তি: রাজনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে নৈতিকতা

- **অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি:** রাজনীতি কেবল টিকে থাকার বা বেঁচে থাকার (Bare life) মাধ্যম নয়; বরং এটি একটি "উন্নত জীবন" (Eudaimonia) নিশ্চিত করার মাধ্যম।
- **রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (Telos of the Polis):** রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের সম্ভাবনা ও কল্যাণের বিকাশ ঘটানো। যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা এই নৈতিক লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এটি তার বৈধতা হারায় এবং কেবল একটি শোষণ বা আধিপত্যের ব্যবস্থায় পরিণত হয়।
- **ভারতীয় প্রেক্ষাপট:** ভারতে আমরা একে শুধু 'নীতিশাস্ত্র' বলিনি; আমরা একে বলেছি "ধর্ম" (সঠিক পথ বা ন্যায়পরায়ণতা)।
 - **চাণক্য (কৌটিল্য):** তিনি বলেছিলেন, "প্রজার সুখেই রাজার সুখ।" এর অর্থ হলো, রাজার ক্ষমতা তার ব্যক্তিগত কোনো উপহার নয়; এটি অন্যের প্রতি তার একটি কর্তব্য।
 - **অশোক:** তাঁর শিলালিপিগুলো শুধু ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য ছিল না; সেগুলো ছিল "ধর্ম" পালনের নির্দেশিকা, যাতে জনগণ এবং কর্মকর্তারা দয়া ও সততার সাথে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হন।



নৈতিক কর্তৃত্বের অবক্ষয়

ক. নৈতিকতা সরিয়ে ফেলার কৌশল ("Ethical Stripping")

নৈতিকতাকে একটি গাড়ির "ব্রেক" হিসেবে কল্পনা করুন। "এথিক্যাল স্ট্রিপিং" হলো সেই ব্রেক সরিয়ে ফেলা, যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাউকে তোয়াক্কা না করে নিজের ইচ্ছামতো দ্রুত চলতে পারে।

- **বিশেষজ্ঞদের উপেক্ষা করা:** যখন কেউ কোনো নৈতিক ভুলের দিকে আঙুল তোলেন, তখন তাঁকে "অবাস্তববাদী" বা "সরলমনা" বলে উপহাস করা হয়। এটি অনেকটা এমন যে— "আপনি বাস্তব জগত বোঝেন না," যাতে সঠিক-ভুলের কঠিন আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া যায়।
- **গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে ঠাট্টায় পরিণত করা (Meme-ification):** কোনো কেলেঙ্কারি নিয়ে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বদলে নেতারা কৌতুক বা ভাইরাল ভিডিওর মাধ্যমে মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেন। আমরা যদি মিম দেখে হাসাহাসি করি, তবে আমরা আর জবাবদিহিতা চাই না।
- **ধর্মের আড়ালে লুকানো:** নেতারা অনেক সময় নিজেদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখতে পবিত্র শব্দ বা ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করেন। তাঁরা এমন ভাব করেন যেন তাঁরা কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতার দ্বারা মনোনীত, ফলে কেউ সমালোচনা করলে তাকে ধর্মের ওপর আঘাত হিসেবে প্রচার করা হয়।

খ. নৈতিকতার পরিবর্তে কী আসে? ("তাৎক্ষণিক সমাধান" পদ্ধতি)

যখন আমরা প্রকৃত নৈতিকতাকে ত্যাগ করি, তখন সেই স্থানটি শূন্য থাকে না। সেখানে "সুবিধাবাদ" (Expediency) বা স্বার্থপরতার নতুন নিয়ম জায়গা করে নেয়।

- **'আমরা বনাম ওরা' (ভালো বনাম মন্দেদর ফাঁদ):** রাজনীতি তখন বিভিন্ন চিন্তাধারার আলোচনার জায়গা না থেকে একটি যুদ্ধে পরিণত হয়। নেতারা বলেন, "আমি হয়তো খারাপ হতে পারি, কিন্তু অন্য পক্ষ হলো 'শয়তান'। তাই আমাকেই সমর্থন করতে হবে।" এটি "শত্রুর সাথে লড়াই" করার নামে যে কোনো খারাপ কাজকে বৈধতা দেয়।

- **জনগণের ক্ষমতার ভূয়া নাটক:** অনেক নেতা দাবি করেন যে তাঁরা সাধারণ মানুষের হয়ে "অভিজাতদের" বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কিন্তু মুখে এই কথা বললেও তাঁরা গোপনে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আরও শক্তিশালী হতে সাহায্য করেন। এটি একটি "মুখে এক, কাজে অন্য" কৌশল।

উত্তরণের পথ

১. **সাংবিধানিক নৈতিকতা পুনরুজ্জীবিত করা:** আইনের অক্ষর পালন করাই যথেষ্ট নয়; আমাদের আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ন্যায়বিচারকে সম্মান করতে হবে। এর অর্থ হলো নেতাদের সংবিধানের মূল্যবোধ মেনে চলা উচিত, এমনকি যখন সেটি তাঁদের জন্য সুবিধাজনক নয়।
২. **জন রলসের "অজ্ঞতার পর্দা" (Veil of Ignorance):** এটি এমন এক নীতি যেখানে নীতিনির্ধারকদের এমনভাবে নিয়ম তৈরি করা উচিত যেন তাঁরা নিজের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে জানেন না। এটি সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।
৩. **নৈতিক কল্পনাশক্তি পুনর্গঠন:** আমাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের "শত্রু" হিসেবে দেখা বন্ধ করে তাঁদের সমান মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখতে হবে। এটি সহানুভূতি তৈরি করে এবং সামাজিক সংঘাত ও যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
৪. **সুচিন্তিত গণতন্ত্রকে (Deliberative Democracy) উৎসাহিত করা:** সমাজের উচিত সোশ্যাল মিডিয়ার হেঁচো বা ভাইরাল স্কোভের চেয়ে ধীরস্থির ও গভীর আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া। জনসমক্ষে মিম-ভিত্তিক রাজনীতির বদলে সত্য ও তথ্যভিত্তিক বিতর্কের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।
৫. **চরিত্র গঠনের শিক্ষা:** শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু মুখস্থ করার বদলে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীলতা এবং সহানুভূতি শেখানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। নৈতিক সাহস সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করতে পারলেই তাঁরা নেতাদের কাছ থেকে নৈতিক আচরণ দাবি করতে পারবেন।

যুদ্ধ: নৈতিকতার চরম পরাজয়

১. **মানবিক মর্যাদা হরণ (Dehumanization):** যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে ছোট করা হয়। মানুষকে পরিবার বা স্বপ্ন থাকা কোনো ব্যক্তি হিসেবে না দেখে শুধু "টার্গেট" বা "পরিসংখ্যান" হিসেবে দেখা হয়। এই মানসিকতাই ব্যাপক ধ্বংসালীলাকে বৈধতা দেয়।
২. **প্রযুক্তিগত বিচ্ছিন্নতা:** আধুনিক যুদ্ধ (যেমন ড্রোন বা স্ক্রিনের মাধ্যমে) মানুষের মধ্যে একটি "মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব" তৈরি করে। যখন শত্রু কেবল স্ক্রিনের একটি 'ডেটা পয়েন্ট' বা বিন্দুতে পরিণত হয়, তখন মানুষকে হত্যা করা একটি যান্ত্রিক কাজে পরিণত হয়।
৩. **ভাষার মারপ্যাঁচ (Sanitization of Language):** যুদ্ধের ভয়াবহতা লুকাতে প্রায়ই সুন্দর শব্দ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ মানুষের মৃত্যুকে "কোল্যাটারাল ড্যামেজ" বা কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, যাতে রাষ্ট্র তার কাজের নৈতিক দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যেতে পারে।
৪. **সহানুভূতির অবক্ষয়:** প্রতিপক্ষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে না পারাই হলো যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। আগেকার যুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা বা শোকের সুযোগ ছিল; কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ শত্রুকে একটি বিমূর্ত বস্তুতে পরিণত করেছে।
৫. **ন্যায়বিচারের চেয়ে সুবিধাবাদ বড় হওয়া:** ইতিহাস দেখায় যে "শান্তি" বা "মুক্তির" নামে শুরু হওয়া যুদ্ধগুলো প্রায়ই ধ্বংস আর বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে। যখন নৈতিক স্বচ্ছতার বদলে রাজনৈতিক সমীকরণ বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন ফলাফল কখনোই স্থিতিশীল হয় না।

রাজনীতিতে নৈতিকতা পুনরায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা

১. **বৈধতা পুনরুদ্ধার:** নৈতিকতা ক্ষমতাকে "সুসংগঠিত আধিপত্য" থেকে **বৈধ কর্তৃত্ব** রূপান্তর করে। রাষ্ট্র যখন জনগণের "উন্নত জীবন" নিশ্চিত করতে কাজ করে, তখন নাগরিকরা ভয়ের বদলে **ন্যায়বিচারের** বোধ থেকে রাষ্ট্রকে মেনে চলে।
২. **"সুবিধাবাদ" নিয়ন্ত্রণ:** এটি "যে কোনো মূল্যে জিততে হবে" এমন কৌশল এবং "আমরা বনাম ওরা" জাতীয় নেতিবাচক প্রচারণার ওপর **চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স** হিসেবে কাজ করে। এটি ভুয়া জনমোহিনী বক্তৃতার আড়ালে থাকা **ক্ষমতা এবং সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়া** প্রতিরোধ করে।
৩. **সংঘাতকে মানবিক করা:** বিচ্ছিন্ন এবং প্রযুক্তিগত যুদ্ধের এই যুগে নৈতিকতা **"নৈতিক সান্নিধ্য"** (Moral Proximity) ফিরিয়ে আনে। এটি নিশ্চিত করে যে "কৌশলগত প্রয়োজন" যেন কখনওই মানুষের **মর্যাদা ক্ষুণ্ণ** বা মানবজীবন ধ্বংস করার অজুহাত না হয়ে দাঁড়ায়।
৪. **তামাশার বদলে বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া:** রাজনীতিতে নৈতিকতা ফিরিয়ে আনলে জনজীবন ভাইরাল স্কোভ এবং "মিম" থেকে সরে এসে **সত্য ও গভীর আলোচনার** দিকে ধাবিত হয়। এটি জনপরিসরকে ডিজিটাল বিভ্রান্তির বদলে **সুচিহ্নিত নীতি নির্ধারণের** স্থানে পরিণত করে।
৫. **মানুষের বিকাশে সহায়তা:** অ্যারিস্টটলের দর্শন (Aristotelian Telos) অনুযায়ী, নৈতিকতা নিশ্চিত করে যে রাষ্ট্র কেবল মানুষের "টিকে থাকার" জন্য নয়, বরং তার চেয়ে বড় কোনো উদ্দেশ্যে টিকে আছে। এটি এমন একটি সমাজের ভিত্তি তৈরি করে যেখানে মানুষের **সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ** সম্ভব।

উপসংহার

আধুনিক রাজনীতিকে অবশ্যই "যে কোনো মূল্যে জয়" পাওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে তার **ধ্রুপদী নৈতিক মূলে** ফিরে যেতে হবে। টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রকে কেবল আধিপত্য বিস্তারের চেয়ে **মানুষের কল্যাণকে** অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক্ষমতা যেন কেবল নিজের স্বার্থে নয়, বরং **ন্যায়বিচারের হাতিয়ার** হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

Q. Politics without ethics degenerates into mere exercise of power and domination. In the light of this statement, examine the growing disconnect between morality and political practice in contemporary democracies. Discuss with special reference to India. 15 Marks

Scan to attempt more questions...



Through the Eyes of Aspirants



P.V. Surendra

Monthly Current affairs magazine of RICE IAS is really helping me alot. It is comprehensively covering current events with segregation of topics in subject wise.



Aindrila saha

The monthly magazines for current affairs are exam-oriented and written in a very concise manner suitable for performing well in the examinations.



Sulagna Roy

Provides gainful insights about the current relevant news. Really beneficial.



Kashish Kapoor

By reading Monthly Current Affairs it has become easy to conclude the important news at the end of the month.



Shreya Mondal

By reading current affairs, it has become easy to conclude the important news at the end of monthly magazine.



Kishore Muddada

The topics are comprehensively covered in each magazine content was crisp, clear & to the point that are very much important for the preparation & the current is also covered with the static part. Keep up the good work.

OUR COURSES

IAS 2-Year General Studies

Prelims Cum Mains Foundation Course

Classroom & LIVE Online Programme

- Complete GS coverage for Prelims & Mains from Basics to Advance
- 1,400+ hours of classes in Kolkata by top Delhi faculty
- Expert in-house mentors trained in Delhi
- Weekly tests with faculty-led discussions
- Exam-oriented study material with PYQ focus

**For UPSC
CSE-2028**

IAS 10-Month General Studies

Prelims Cum Mains

Classroom & LIVE Online Programme

- Complete GS coverage for Prelims & Mains
- 700+ hours of classes in Kolkata by top Delhi faculty
- Expert in-house mentors trained in Delhi
- Weekly tests with faculty-led discussions
- Exam-oriented study material with PYQ focus

**For UPSC
CSE-2027**



GET CLOSER TO YOUR **IAS & IPS** DREAMS

"Bengal once led India in the Civil Services, producing pioneers like Satyendra Nath Tagore and Subhas Chandra Bose. Today, we must revive that legacy. With the right guidance and training, Bengal's youth can again shape governance and nation-building. When Bengal's students rise, the whole nation prospers".



Prof. (Dr.) Samit Ray

CHAIRMAN OF RICE GROUP
& CHANCELLOR OF ADAMAS UNIVERSITY



"With 12 years at Vajiram & Ravi, I know what it takes to crack UPSC CSE (IAS/IPS/IFS/other All India Services). We started RICE IAS to bring Delhi-level coaching and expert faculty to Bengal, reviving our legacy of producing IAS and IPS officers. Here, you'll find not just guidance but a mentor who stays with you until success"

S.A. MAJID

Co-Founder & Director **RICE IAS**
Vice President - ADAMAS UNIVERSITY

Sealdah, Kolkata

Old Rajinder Nagar, New Delhi

At Adamas University

☎ 8100819447

☎ 9933118849

☎ 8100971442